আকাশলীনা

কামরুন জিনিয়া সম্পাদিত

অনাবাসী কবি ও লেখকদের
কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সংকলন

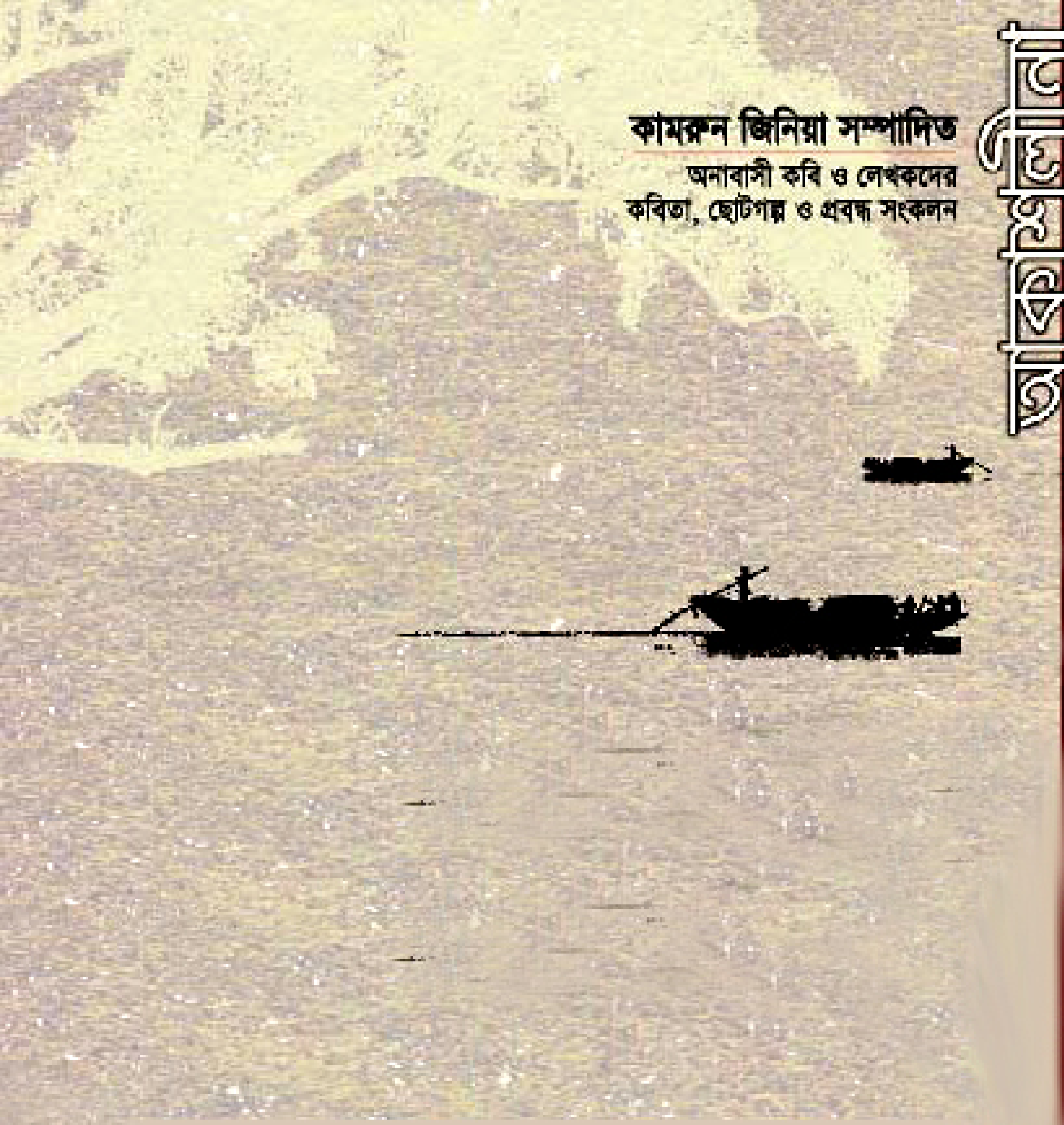

আকাশলীনা

অনাবাসী কবি ও লেখকদের
কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সংকলন

কামরুন জিনিয়া সম্পাদিত

স্বত্ব

রিয়াজ ফেরদৌস শিবলী

প্রচ্ছদ

....

প্রকাশক

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
স্বরব্যঞ্জন : ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট (তৃতীয় তলা)
শাহবাগ ঢাকা বাংলাদেশ। ফোন : ৯৬৬৪৪৬০
ই-মেইল : smdulal@gmail.com

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি ২০০৮ ॥ ফাল্গুন ১৪১৪

উত্তর আমেরিকা পরিবেশক

মুক্তধারা : জ্যাকসন হাইটস নিউইয়র্ক ইউএসএ
ফোন : ৭১৮-৫৬৫-৭২৫৮

মূল্য : ৩০০ টাকা ॥ মার্কিন ১২ ডলার মাত্র

আইএসবিএন : ৯৮৪-৮১১-০৬৪-X

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

Quamrun Zinia
305 East Gatehouse Drive, # H, Metairie
LA 70001, Louisiana, USA
Phone/Fax : 504-831-7377
E-mail : qzinia@yahoo.com

উ ৎ স র্গ

অকালপ্রয়াত কবি সুরাইয়া খানম-কে

(সুরাইয়া খানমের কবিতা মরচে পড়া গানের গুচ্ছ নয়। এই ভণ্ড, শ্বাসরুদ্ধকারী সমাজের জরাজীর্ণ দুর্গে সরাসরি আঘাত হেনেছেন তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ, বিন্যস্ত, শব্দাবলী দিয়ে। মানব-সত্তার বাণিজ্যিক লেন-দেন তাঁকে পীড়িত, উদভ্রান্ত করে, নির্মানুষ নিসর্গ তাঁর কাছে অবান্তর, অর্থহীন। নিজের কাছে সৎ থাকার জন্যে, সত্যকে নিরাবরণ করার জন্যে কবিতা লেখেন সুরাইয়া খানম। জন-মানুষের সঙ্গে তার ক্রুদ্ধ, অতৃপ্ত, অনমনীয় আত্মার অকৃত্রিম সংলাপ তাঁর কবিতা গুচ্ছ। সমকালীন বাংলা কবিতায় ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল সংযোজন তাঁর নাম, তাঁর কবিতা।)

সূত্র : সুরাইয়া খানম-এর একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'নাচের শব্দ'-এর ব্যাক কভার থেকে সংকলিত

পৃষ্ঠপোষকতা ও কৃতজ্ঞতা :

'আকাশলীনা' বই আকারে প্রকাশের জন্যে যাঁরা তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তাঁদেরকে আমি সকলের পক্ষ থেকে নিরন্তর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি

সম্মানিত পৃষ্ঠপোষকরা হচ্ছেন :

সাঈদ-উর-রব (নিউইয়র্ক)
শাহাদাত হোসেন পরাগ (টেক্সাস)
জাহানারা খান বীণা (ফ্লোরিডা)
রিয়াজ ফেরদৌস শিবলী (নিউ অরলিন্স)

সম্পাদকীয়

'আকাশলীনা' অনাবাসী বা-ালী কবি ও লেখকদের একটি বাৎসরিক কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধের স'কলন। প্রথম স'খ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিলো ২০০১ সালে, বা'লা ১৪০৮, পহেলা বৈশাখে। ২০০৫ সাল পর্যন্‌' 'আকাশলীনা'-র পাঁচটি স'খ্যাই উত্তর আমেরিকাতে প্রকাশিত হয়। দু'বছর আগে ২০০৬ সালে 'আকাশলীনা'-র ষষ্ঠ স'খ্যাটি প্রথমবারের মতো বা'লাদেশ থেকে বই আকারে 'একুশে বইমেলা'-তে প্রকাশিত হয়। স্বরব্যাঞ্জন-এর কর্ণধার কবি ও লেখক শ্রদ্ধেয় সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালকে আমার নিরন্‌'র শুভেছা ও কৃতজ্ঞতা বইটি প্রকাশে তাঁর সার্বিক সহায়তার জন্যে। এ বছরও ২০০৮ সালে 'আকাশলীনা'-র সপ্তম স'খ্যাটি একুশে-র বইমেলায় স্বরব্যঞ্জন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হছে। এ স'খ্যায় স্থান পেয়েছে প্রায় অর্ধ শতাধিক অনাবাসী কবি, ছোট গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও লেখকের কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ।

এ বছরের স'খ্যাটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবি সুরাইয়া খানম-কে। একাধারে গবেষক, ঔপন্যাসিক, কলামিস্ট এব' সর্বোপরি আপাদমস্‌'ক এই কবিকে আমরা হারিয়েছি ২০০৬ সালের মে মাসে। সুরাইয়া খানম চলে গেছেন বড়ো নিঃশব্দে। বসবাস করতেন উত্তর আমেরিকার অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের ছোট্ট শহর টুসান-এ। তাঁর সম্পর্কে কিছু না লিখলেই নয়। যদিও সুরাইয়া খানম-কে নিয়ে আমার ভাবনাগুলো ছোট ছোট এব' থোকা থোকা—যে গুলো দিয়ে একটি একক মালা গড়ে তোলা আমার জন্য দুঃসাধ্যই। তাঁর মতো একজন এতো বড়ো মাপের মানুষকে বিশেষ করে ওনার চরিত্রের, ব্যক্তিত্বের বহুমাত্রিকতার সবগুলো দিককে ধরা বা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাঁকে নিয়ে ভাবতে বসলে প্রথমে তিনি ছায়ার মতো ভেসে ওঠেন। তারপর একটু একটু করে আলো ঢোকে সে ছায়ায়। যতো আলো প্রবেশ করে, ততোই উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন সুরাইয়া খানম আমার চোখে, ততোই উপলব্ধি করতে পারি কতোটা বিস্‌'ৃত ছিলো তাঁর ভুবন! কতোটা সমৃদ্ধ ছিলো তাঁর পৃথিবী! সুরাইয়া আপা প্রথম আমার কাছে ছিলেন রবি ঠাকুরের উপন্যাস 'শেষের কবিতা'-র 'লাবণ্য' হিসেবে। অথবা বা'লাদেশের কীট্‌স বলে খ্যাত অকাল প্রয়াত কবি আবুল হাসান-এর 'ভালোবাসা' হিসেবে, যিনি তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'পৃথক পালঙ্ক' উৎসর্গ করেছিলেন 'সুরাইয়া খানম' নামের এক অসাধারণ নারীকে।

অসাধারণ, দূর্লভ এই সুরাইয়া খানমের জন্ম ১৩ই মে, ১৯৪৪ সালে। যশোহরে। স্কুলজীবন থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। 'সমকাল'-এ প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর প্রথম কবিতা। নাচ ও গানেও তখন সমান পারদর্শী ছিলেন। এস.এস.সি (তখনকার ম্যাট্রিক) পাশ করার পর তিনি করাচীতে পড়াশুনা করেন এব' পরবর্তীতে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব কনিষ্ঠা অধ্যাপিকা হিসেবে কিছুকাল দায়িত্ব পালন করেন। এরপর কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ই'রেজী সাহিত্যে অনার্স গ্রাজুয়েশন করেন। তিনি ছিলেন ক্যামব্রিজের ট্রাইপস্‌' বা ট্রিপল অনার্স। উল্লেখ্য যে, সুরাইয়া খানম ছিলেন সাবকন্টিনেন্টের একজন প্রথম কমন্‌ওয়েলথ স্কলার ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ সময় তিনি বিবিসি-তেও কিছুকাল কাজ করেছেন। পরবর্তীতে বা'লাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে সুরাইয়া খানম স্বাধীনতার পক্ষে ই'ল্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এব' উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। সে সময়ে লন্ডনে যে স্বল্পস'খ্যক বা-ালী নারী দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন, সুরাইয়া খানম ছিলেন সে তালিকার শীর্ষে। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সে অনন্য অবদানের জন্যেই, ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বা'লাদেশের

আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয়ের পর, লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ার-এ আয়োজিত বা‘লীদের বিজয় অনুষ্ঠানে স্বাধীন বা‘লাদেশের নতুন লাল-সবুজ জাতীয় পতাকাটি উত্তোলনের ভার পড়েছিল সুরাইয়া খানমের-ই ওপর। এ দূর্লভ স্মরণীয় মুহূর্তটিকে সামনে রেখে সুরাইয়া খানমের একটি অনবদ্য কবিতাও আছে, ‘পতাকা’ শিরোনামে।

বা‘লাদেশে ফিরে গিয়ে ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্‘ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ই‘রেজী সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেন। একই সময়ে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হলের ‘হাউস টিউটর’ হিসেবেও। ই‘রেজী সাহিত্যের ছাত্রী হয়েও চমৎকার বা‘লা কবিতা লিখতেন, যা শুরু হয়েছিলো ছোটবেলা থেকেই। তাঁর বেশকিছু ই‘রেজী কবিতা আছে, আছে অনুবাদ কবিতাও। আছে অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, উপন্যাস, কিছু গবেষণা এব‘ বেশ কিছু কবিতা। ১৯৭৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর প্রথম ও একমাত্র কাব্যগ্রন্থ ‘নাচের শব্দ’। থিয়েটার-এর প্রতিও সেসময় তাঁর আগ্রহ পরলক্ষিত হয়। সে সময়টিতেই বা‘লাদেশ টেলিভিশনের স্বনামধন্য নাট্যকার, পরিচালক, প্রযোজক আতিকুল হক চৌধুরী প্রযোজিত নাটক, রবি ঠাকুরের উপন্যাস ‘শেষের কবিতা’-র কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘লাবণ্য’-র ভূমিকায় অভিনয় করে সারা দেশে আলোড়ন তোলেন।

এরপর ’৮০-এর দশকের শুরুতে উচতর শিক্ষার জন্য একজন ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ূনখিরেসতিয় ঠৈ অরটিনৌ-তে আসেন এব‘ এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ই‘রেজী সাহিত্যে এম.এ ও পরবর্তীতে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর ধসিসরেতাতনি (গবেষণা)-এর বিষয়বস্তু ছিলো “ঘনেদরে ান্দ তডে ছলৈনৌলি শডরৈত শতরৈয়: ডুদয়ারদ খপিলনিগ ান্দ ড়াবনিদরানাতড থাগরৈে (নৈগলানদ, ান্দাি)”. পি.এইচ.ডি শেষ করে যোগ দেন ই‘রেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে অ্যারিজোনার-এর একটি ইউনিভার্সিটিতে এব‘ মৃত্যুর আগ পর্যন্‘ স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন অ্যারিজোনার-এর টুসান শহরে। একজন শিক্ষকের বিশেষতঃ উচতর শিক্ষায় যে প্রজ্ঞা ও পুঁথিগত ঋদ্ধি থাকা প্রয়োজন, তা সুরাইয়া আপার ছিলো। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে অনুষ্ঠিত সাহিত্য ও সা‘স্কৃতিক সম্মেলন, বইমেলা, কবিতা উৎসব, সেমিনার সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন এব‘ অনুষ্ঠানে সক্রিয় অ‘শগ্রহন করতেন।

প্রচুর লিখলেও বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সুরাইয়া খানম বরাবরই অমনোযোগী ছিলেন। এই অনাগ্রহের কারণ হতে পারে তাঁর সীমাহীন ব্যস্‘তা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো ও গবেষণার কাজে তাঁকে প্রচুর সময় দিতে হতো। আমার জানা মতে সুরাইয়া খানম-এর অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলো (আরও বেশী হতে পারে) হচ্ছেঃ

কাব্যগ্রন্থ — ‘অভিমানের বাঁশী’, ‘বীজতলার গান’, ‘কালো মানুষের ক্বাসিদা’।

উপন্যাস — ‘মহিলা’, ‘নীল আসমানের পরী’।

গবেষণা গ্রন্থ — ‘সাম্রাজ্যবাদ ও উনিশ শতকের উপন্যাস’।

তাছাড়া নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বা‘লা স‘বাদপত্রের মধ্যে সাপ্তাহিক ‘প্রবাসী’ ও ‘ঠিকানা’-তে তাঁর অনেক কবিতা, প্রবন্ধ ও কলাম নিয়মিত প্রকাশিত হতো, যা একসঙ্গে বই আকারে প্রকাশের কোনো উদ্যোগ এখনো নেয়া হয়নি।

তাঁর মেধা, কবিতা, জীবন-দর্শন, গবেষণা, প্রতিভা, সৌন্দর্য, খ্যাতি-অখ্যাতি সবকিছু মিলিয়ে সুরাইয়া খানম ছিলেন সমকালীন বা‘লাদেশে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একজন অত্যন্‘

গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত ব্যক্তি। যিনি ছিলেন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রবর্তী। ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সনাতন পদ্ধতি, প্রথাগত মূল্যবোধ, নিয়ম ও কাঠামোর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচার। যে সমস্‘ অভিধায় অভিষিক্ত হয়ে একজন মানুষ মহৎ বা মহতী হয়ে ওঠেন, কি‘বদন্‘ী হয়ে ওঠেন, তাঁর প্রায় সবগুলোই সুরাইয়া খানম-এর মধ্যে ছিলো। তাঁর কলাম, কবিতা বা প্রবন্ধগুলো পড়লে যে কেউ বলবেন লেখক হিসেবে সুরাইয়া খানম আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সা‘স্কৃতিক জীবনের বহু দিক স্পর্শ করেছেন চিন্‘ার সততা, জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও প্রাখর্য নিয়ে। প্রচন্ড অনুভূতিপ্রবণ সুরাইয়া খানম তাঁর আবেগকে স‘যত করতে জানতেন মেধা ও নিষ্ঠার একাগ্রতায়। যার ফলে তাঁর কবিতা হয়ে উঠতো হৃদয়গ্রাহী ও অতলস্পর্শী। গভীর জীবনবোধে বিধৃত। এখানেই সুরাইয়া খানমের কৃতিত্ব ও সার্থকতা। আর এখানেই তিনি তাঁর সময়ের অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র ও অনন্য। তাঁর একটি কবিতা আছে ‘ল‘ ডিস্ট্যান্স রানার’ শিরোনামে, আমার খুব ভালো লাগে, কবিতাটিতে সুরাইয়া খানমকে কিছুটা যেনো বোঝা যায়, ধরা যায়। কবিতাটি জানিনা কোথাও প্রকাশিত হয়েছিলো কিনা, তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন ‘আকাশলীনা’-র জন্যে ক‘বছর আগে। কবিতাটি এইঃ

ল‘ ডিস্ট্যান্স রানার আমি
সদা সর্বদা ফ্রন্টিয়ার পেরিয়ে যাই
যত বেড়াজাল আচার বিচার নিষেধ শাসন
দমন ও ত্রাস — পেরিয়ে যাই। অতিক্রম করে যাই ঘৃণা।
হৃদয়ে ও মেধায় জ্বালাই দীপশিখা
হাতে নিয়ে সে মশাল তীর বেগে ছুটে যাই।
ঐতিহাসিক কলোনিয়াল ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করে যাই।

আমারও ক্লান্‘ আছে, নিদ্রা আছে।
আমারও সপ্রেম আশা আছে।
আমি যাবো সুদর্শনা অপরূপা মাতৃভূমিতে।
ল‘ ডিস্ট্যান্স রানার আমি, আমি সেই দেশে যাবো।
এখানে সেখানে নাই, অনুভবে আছে।
আছে মাতৃভূমি আছে, একুশের কুয়াশা ভেজা
চোখের পাতায়।
আমার মেধায় কোন শহীদ মিনার নাই
তারা কেউ হয়নি শহীদ —- তারা মৃত নয়।
তারাও চলেছে সঙ্গে অপরূপা মাতৃভূমি আশে।
আমার সময় নেই, আমি তীক্ষ্ণ ছুটতেই জানি।

সুরাইয়া খানম এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেছেন তিনি। তাঁর কর্মময় জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে চলাই হবে তাঁকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো। জীবনবাদী শিল্প যাপনের ভেতর দিয়ে একজন কবি খুঁজে বেড়ান জীবনের পরম সত্যকে। এক সময় প্রগাঢ় ও বিমূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর সে আবিষ্কার। তখন তিনি নির্ণয় করতে চান এক অনাদি অনন্‘ সম্পর্কের

স্বরূপ সত্যকে। এ সত্যকে সুরাইয়া খানম অনুভব করেছিলেন তাঁর নিজস্ব আবেগে, নিজস্ব অস্তিত্বে, নিজস্ব উপলব্ধিতে। তাই তাঁর মৃত্যু, চলে যাওয়া আমাদের কাছে হয়ে ওঠে এক নিরূপম যাত্রা অনন্তের দিকে—পরম সত্যের দিকে। তাঁর পরমোজ্জ্বল মানস, সৃজনশীলতা, মননশীলতা, জ্ঞানের ও সুরুচির চর্চার কারণে, এক চমৎকার অনাড়ম্বর অথচ আশ্চর্য ঐশ্বর্যশালী উদ্ভাসে সুরাইয়া খানম আরও বেশী বেঁচে থাকার আস্বাদনে উদ্ভাসিত হয়ে থাকবেন।
সুরাইয়া আপা, যা কিছু মলিনতা তা আর তোমাকে স্পর্শ করবে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অজস্র টানাপোড়েনের ভেতরেও, বেদনার মধ্যেও দৃঢ়তার সঙ্গে তুমি তোমার আশাবাদী দীপ্র মশালটিকে উর্ধ্বে তুলে ধরে রেখেছিলে। তুমি ছিলে হীরক খন্ডের মতোই উজ্জ্বল আর দ্যুতিময়! জীবন চলে যায়, চলে যাচ্ছে, চলে যাবেও আপন নিয়মে। তবুও এই যাওয়ার মধ্যেও কেউ কেউ সত্যিই হেঁটে যায় সময়ের গন্ডি উৎরিয়ে। তুমি ছিলে তাঁদেরই একজন। একজন ল' ডিস্ট্যান্স রানার!

ধন্যবাদ সকল প্রবাসী কবি ও লেখকদের, কাছের ও দূরের, যাঁরা শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রবাসের এ যান্ত্রিক জীবনে লেখা পাঠিয়েছেন মনে করে, ভালোবেসে, বড়ো যত্ন করে – সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সংকলনটিতে লেখক ও কবিদের নামের বাংলা আদ্যক্ষর অনুযায়ী লেখাগুলো সাজানো হয়েছে, অন্য কোনো মানদন্ডে নয়। আমার বিশ্বাস, লেখাগুলো আপনাদের ভালো লাগবে। সব না হলেও অন্ততঃ একটি লেখাও যদি কারো ভালো লাগে, আমি আমার এ পরিশ্রম ও ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সফলতা মনে করবো।

সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা।

কামরুন জিনিয়া
নিউ অরলিন্স, লুইজিয়ানা।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৮
৮ই ফাল্গুন, ১৪১৪, ইউ.এস.এ.

সূচিপত্র

এক. কবিতা
অমল মিত্র
আবু ওবায়দা আনাসারী খান
ইকবাল হাসান
গুলশান আরা কাজী
জাহানারা খান বীনা
জায়েদ ফরিদ
জিয়াউদ্দিন আহমেদ
জিয়ারত হোসেন
দলিলুর রহমান
দাউদ হায়দার
দিলারা হাশেম
দেলোয়ার হোসেন মঞ্জু
নাজনীন সীমন
নাসরীন খান রুমা
নাহার মনিকা
ফকির ইলিয়াস
ফারহানা ইলিয়াস তুলি
ফেরদৌস নাহার
বদিউজ্জামান নাসিম
মুজিব ইরম
রবিউল হাসান
রোকসানা লেইস
শবনম আমীর
শামসুল হুদা
শামীম আজাদ
শারমিন আহমেদ
শাহানা চৌধুরী পপি
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
সুরাইয়া খানম
সোহেলী সুলতানা
হারুন চৌধুরী
হাসানআল আবদুল্লাহ
হোমায়রা আহমেদ

দুই. ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও অন্যান্য

আনোয়ার শাহাদাত
আবদুন নূর
কামরুন জিনিয়া
জসিম মল্লিক
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত
পূরবী বসু
মাসুদা ভাট্টি
মীজান রহমান
মীনা আজিজ
মুহম্মদ জুবায়ের
রানু ফেরদৌস
লুৎফর রহমান রিটন
শামীম তুষার
সাদ কামালী
সাহেল চৌধুরী
হাসান ফেরদৌস

১. অমল মিত্র

সাবাস বাংলায় কথা বলি

বিচিত্র চিত্র কিছু করিব বর্ণন
শোন মোর গুণীজন শোন দিয়া মন
দেখো কতো সুখে আছি স্বাধীন এ দেশ
বাংলায় বলছি কথা...
তা বেশ তা বেশ!

আহা কী আনন্দ গান বাংলায় গাই
বাংলার দরদী বন্ধু দেখো বাংলা ভাই
আজব আমার দেশে আজব কী কম
ভাষার সৈনিক আজ গোলাম আজম

বরকত সালাম আর রফিক জব্বার
তোমরা কোথায় আজ শুনেছ খবর?
বাংলাদেশটা নাকি বাংলাস্থান হবে
জেহাদের দীক্ষা নাও ধর্মপ্রাণ সবে

একাত্তরের যারা ছিল রাজাকার
তাহারাই ত্রাণকর্তা জাতির আমার
আমাদের ঘরে আজ নিজামী জামাই
তাহারি মানসপুত্র আছে বাংলা ভাই
ধন্য শায়খ আর আউয়াল সানি
বাংলার বীর পুত্র তোমাদের মানি
রফিক হাসছো তুমি দেখে এই দেশ?
বাংলায় তো কথা বলি–
তা বেশ তা বেশ!

আরও খবর আছে শোন শহীদেরা
একুশের ভোরে আজ উগ্র জঙ্গীরা
ভেঙে দিলো এ প্রথম শহীদ মিনার
এ সাহস কোথা পেলো এই রাজাকার?

আর কতকাল পরে বলবো আবার
আর একটি মুক্তিযুদ্ধ চাই বাংলার
ধন্য ভাষার যুদ্ধ ধন্য স্বাধীনতা
সালাম কোথায় তুমি জব্বার কোথা?
দেখো তোমাদের স্বপ্ন–সাধের এ দেশ
বাংলায় তো কথা বলি–
তা বেশ তা বেশ!

একজন মুক্তিযোদ্ধা ও এক রাজাকার

আমাদের এক মুক্তিযোদ্ধার গল্প শোন
হোমরা চোমরা মন্ত্রী টন্ত্রী নয়কো কোন
সাধারণ এক মুক্তিযোদ্ধার গল্প শোন–

নাম–না–জানা মুক্তিসেনা আছেন কতো
শ্রীমঙ্গলের কৃষণ কুমার ভাগ্যাহত
এমনই এক মুক্তিযোদ্ধা
জীবনযুদ্ধে যুদ্ধরত।

বয়সটা তার ষাটের কোঠায় হয়তো হবে
একাত্তরে উনিশ-কুড়ি বয়স হবে
ডাক এলো তার পাকসেনাদের রুখতে হবে।

পাকবাহিনী তখন সারা দেশটা জুড়ে
মারছে যুবা বৃদ্ধ শিশু অকাতরে
হাজার বোনের ইজ্জতকে নিলো কেড়ে।

কৃষণ কুমার দেশমুক্তির শপথ নিলেন
স্বজন ছেড়ে গ্রেনেড বুলেট তুলে নিলেন
যুদ্ধ শেষে একখানি তার পা হারালেন।

দেশটা স্বাধীন, এখন কে তার খবর রাখে?

গ্রামের নেতা হায় রাজাকার
বাস্তুহারা করলো তাকে
লোকটা বলে–সব গেছে মোর দৈবপাকে।

গিন্নি এবং বৃদ্ধা মাতা ঘরে তাহার
এদের মুখে দু'মুঠো ভাত করতে যোগাড়
ইটখোলাতে মজুর তিনি যোদ্ধা আমার।

আজও তিনি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখেন
মুক্তিযোদ্ধা সনদ পানে
যত্নভরে তাকিয়ে ভাবেন
কোন শুভদিন আসবে কবে
অনুদানের অর্থ পাবেন!

এইতো আমার বীরযোদ্ধা এইতো এদেশ
এমনি করেই যাচ্ছে সময় যাচ্ছে তো বেশ
আর কতকাল মৌন রবে বন্দী স্বদেশ?

যুদ্ধ শুরু যুদ্ধ শুরু আজকে আবার
সময় হলো লুকিয়ে থাকা শত্রু চেনার
স্বাধীনতার শত্রু যারা তাদের বলি–
তুই রাজাকার।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারী তুই রাজাকার
ভণ্ডবেশী ধর্মনায়ক তুই রাজাকার
দেশটাকে যে জিম্মি করে ধর্ম নামে
তুই রাজাকার।

জঙ্গীবাদী-মৌলবাদী তুই সরে যা–
দেশটা আমার
তুই রাজাকার।
তুই রাজাকার ॥

ঈদ আসে নাই

ঈদ আসে নাই
আমি ঈদ চাই
এ কেমন কথা এলোমেলো
আজ তো ঈদ–
লোকটা কি প্রলাপ বকে গেলো?

বিপণি বিতানে ভিড় ভারি
কেনাকাটা হলো রকমারি
পরিপাটি পাঞ্জাবি সাজ
মসজিদে ঈদের নামাজ
আতরের গন্ধ মৌ মৌ
সেমাই সিরনি পোলাউ
সন্ধ্যায় আলোর ঝিকিমিকি
এসব কি মেকী?
লোকটা পাগল বৈকি?
বলে নাকি–
আজ ঈদ চাই।

যাচ্ছেতাই– যাচ্ছেতাই
আরে। কি বলে গেলো–
আমাকে পাগল বলো
ক্ষতি নাই
আমি ঈদ চাই।

এসব কী কথা?
যা–তা যা–তা
এক আকাশের নিচে
যারা আছে
মুড়ি দিয়ে কাঁথা
শীতে জড়সড়
তাহাদের বুকে তুলে ধরো।

আরো বকে গেলো
এলোমেলো
বিস্তর কথা
যা-তা যা-তা-

তিন কন্যার দায়গ্রস্ত পিতা
মনা মাঝি ধুঁকে ধুঁকে মরে
ঈদ তো আসে নি তার ঘরে।
প্রিয়বালা কেন আজো পেটের জ্বালায়
প্রতি রাতে সাজঘরে
নূপুর পায়ে নেচে যায়
কেন সে যে দেহ বেচে বেঁচে আছে মরে
কান্দুপট্টির মতো খুপরির ঘরে
ঈদ তো আসে নি তার ঘরে।

বলে কিনা এদের সবাইকে
তুলে নাও বুকে
রীতিমতো যার ধর্ম কর্ম নাই
নামাজ বা রোজা সবটা বালাই
দুর্গা বা সরস্বতী পূজায়
বা বুদ্ধপূর্ণিমায়
যে মত্ত দস্তুর
দুর দুর
ওতো ধর্ম মানে না
ঈদ ওর মানা–

না.. না...
এক আকাশের নিচে
সবাই তো আছে
কবে...
সবাইকে নিয়ে ঈদ হবে?

২. আনসারী খান

শহীদ মিনারের গল্প

আমি শহীদ মিনার।
আশার প্রহর গুনে, নতজানু-নতশির দাঁড়িয়ে আছি অনেক বছর।
যেদিন, পলাশ, শিমুল আর কৃষ্ণচূড়ার খেলা
রঙের নেশায় মাতিয়ে বসালো প্রাণ-সৃষ্টির মেলা।
দোয়েল-শ্যামার শীষে, কোকিলের কুহুতানে মিশে
হৃদয় আকুলি ওঠে ফাগুনের স্নিগ্ধ পরশে।
বলতে চেয়ে এই অনুভূতি কথা যেই না ডেকেছে মাকে
ওই দামাল ছেলের দল
দ্বিধাহীন চালালো গুলি জানোয়ারের দল– এনে রক্ত নদীর ঢল।
জলদগম্ভীর স্বরে, স্বর্গীয় জ্যোতির প্রভায় তবুও তারা ডেকেছিল মাকে
বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক এবং আরো অনেকে।
সেদিন থেকেই দাঁড়িয়ে আছি-কাঁধে নিয়ে জাতির দণ্ডভার,
শপথ নিয়েছি তোমাদেরই সাথে– মায়ের বাণীর পবিত্রতা রক্ষার।
সেই থেকে দেখেই চলেছি–বিচিত্র ফুলের সাথে
হাজারো মানুষের ভিড়– খালি পায়ে–মালা হাতে।

ধীরে ধীরে দৃশ্য পাল্টায়– প্রেতিনীর বিষক্তি নিঃশ্বাসে
দেশে অঙ্গন-কোন ক্রমশই ভরে ওঠে বীরোওমের লাশে।
আকাশ 'আসমান' হয়– পার্থক্য হয়ে যায় 'ফারাক',
আহত বর্ণমালার দল নীরব কান্না নিয়ে হয়ে ওঠে ক্ষুব্ধ, হতবাক।
চেনামুখ কমে যায়–উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পরম সত্য,
আমরাই সোপানে দেখি 'নাজিমুদ্দিন' আর 'মীর জাফরের' উল্লাস-নৃত্য।
অগণিত হারে বংশবিস্তারে তাহাদের সফলতা
তোমরা সবাই জানো– সেসব অতীত দিনের কথা
তাহাদের সন্তানেরা আনে ফুল 'ফেনসিডিলে' ঢাকি–
প্রার্থনা শেষ করে চলে যায় দামী-দামী ফুলমালা রাখি।

বরকতের স্তম্ভটা আমায় শুধায়– জানতে ইচ্ছে করে
এইসব প্রার্থনা কাহাদের তরে?
যারা করেছিল গুলি তাদের জন্যে তো নয়?

বলি আমি, জানতে চেওনা এর উত্তর– হে অকুতোভয়।
ইচ্ছে করে, তোমার স্তম্ভ থেকে নিয়ে এক টুকরো ইট,
গুঁড়িয়ে ফেলি পাঁজর ওদের– পিষে ফেলি এইসব নরকের কীট।
মায়ের মুখের ভাষায় যারা সুকৌশলে বিকৃতি আনে
পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে পশ্চাৎদেশে--তাদের পাঠিয়ে দিই পাকিস্তানে।
তোমরা জীবন্ত, আমি এক নির্জীব শহীদ মিনার–
প্রতিকার করো, নয় বন্ধ কর বাঁদরের মত এই চীৎকার।
আমি পদত্যাগ করছি, আমি অবসর চাই–
কতদিন দাঁড়িয়ে থাকা যায়–উদ্বাস্তু শিবিরে ঘর-গড়া বাসনায়?

ফুলের হুল্লোড় শেষ হয়–ধীরে ধীরে নামে অন্ধকার।
ছিন্নবস্ত্র, অভুক্ত, লাঞ্ছিতা রমণীর বেশে কাছে আসে মা আমার,
করজোড়ে বঙ্গজননী মোর মিনতি জানায়
তোদের রক্তঋণ শুধতে পারিনি–বাছারা আমার–ক্ষমা কর আমায়।
সোনার সিংহাসন ছাড়ি মায়ের সকল অহংকার শূন্যদিগন্তে মিলায়
প্রতিবছরই ভাবি আমি–শুধু ওর জন্যই তো অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকা যায়।
আমি শহীদ মিনার–কেঁদে কেঁদে আজো দাঁড়িয়ে আছি আমি–
তোমরা যদি বল, তবে এখানেই থামি।

মুক্তি

থামতে থামতে চলেই এলাম শেষ গলিটির ধারে।
ভালবাসার জঙ্গল থেকে যে ফুল পেলাম ভেবে
বাড়িয়ে দিলেম হাত–
চমকে দেখি তার পাপড়িগুলোয় আমার বুকের খুন,
ধমনীর শেষপ্রান্তে উইপোকা নাচে।
বোধের মাতাল নেশা ভেঙ্গে ফেলি সোনালী আলোয়।
আচ্ছা, উদ্বাস্তু শিবিরে তুমি ঘর গড়তে পার?
তবুও স্থিতির পাখিরা কেন স্মৃতি-রন্ধ্রে ঘোরে!
তোমাদের মুক্ত আঙিনার আমি এক ওরাং ওটাং,
হলদে দাঁতে গোলাপগুচ্ছ খেয়েছি।
তবুও শিকল পরতে কেন ঘোর আপত্তি জানাই।

আজ থামতে থামতে চলেই এলাম শেষ গলিটির ধারে।
শ্রদ্ধান্তে বাড়িয়ে দিলাম নরোম দু'হাত–
পরিয়ে দাও– বোধের রক্তে গড়া মুক্তির বাঁধন–
তোমরা সকলে– শেষ গলিটির ধারে।

থামতে থামতে মেনেই নিলাম– গতি শুদ্ধ নয়।

আকাশ

আকাশে উড়বার সখ হ'ল।
উড়লাম পাখাহীন– অসম্ভব কাজ।
মহাশূন্যের গভীরতায় প্রখর দৃষ্টিতে
দেখলাম একে একে নগ্ন শালীনতা,
মানুষের মোহের প্রভাব-
অশ্লীল সভ্যতার জয়–
আহামরি কিছু নয়।

সুপ্তি ও জাগরণে প্রভেদ কোথায়?
ভূমি–ব্যোম ভেদ সব ঝাপসা হয়ে যায়।
যুদ্ধক্ষেত্র ও ধর্মশালা মূলতঃ একই
আপেক্ষিকতায় শুধু আলাদা মনে হয়।
নবীন-প্রবীণ সব বায়ুভূত, তাই
নগ্নতার চাঁদরে মন ঢেকেছি সবাই।
কি এক অদ্ভুত নিয়ম–
দৃষ্টি ঝাপসা হলেই শুধু সত্য দেখা যায়,
অন্যথায় নয়।

আকাশে উড়ার সখ হ'ল– উড়লাম।
দৃষ্ট-দৃশ্যে ঝোলা ভরলাম।
বাড়ি ফেরা বাকি, প্রকাশ্য ভ্রমণ শেষে।
মনের গলিতে পাতা ইজিচেয়ারে বসে–
প্রকৃতি-প্রেম-বোধ-দেশ-মাটি-মা-
কপট ভগবান।

সবকিছু জ্বলন্ত সজাগ।
নীৎসে নাকি রোমান্টিক।
'অবারম্যান' তাই বুঝি ঠিক?
আইনস্টাইন – বাস্তবতার আধার!
ভগবানের গলি ধরে কাটে স্বর্গে সাঁতার।

সবকিছু অগোছালো আছে।
সাজাতে হবে একে একে পরিষ্কার সংসারের মত।
নীরবতার যে কি ভয়ঙ্কর আওয়াজ–
জানতে হবে – জানানোও কাজ।
যদি প্রশ্ন কর – মানুষের ঠিকানা কোথায়?
বিনীত নিবেদন করি – আমার তা জানা নাই।
সময় হবে না আর অন্বেষণের।
জ্বলন্ত শিখা নিভে যায় চিরদিনের তরে।
প্রশ্ন জাগে– বাইরে কেন গেলি মোটামাথা?
অন্তহীন নিশ্চল আলোকে তোর ঘুমিয়ে থাকার কথা
কেন ভুলে গেলি?
মানুষকে কেন বারে বারে যুদ্ধে যেতে হয়?
একবারই কি যথেষ্ট নয়?

উড়িবার সখ হ'ল।
আকাশে উড়লাম পাখাহীন – অসম্ভব কাজ।
স্বপ্ন দেখলাম– প্রজাপতি হয়ে উড়ছি।
ঘুম ভাঙল – পরিষ্কার চোখে তাকালাম।
মনেও হ'ল না একবার
আমি তো প্রজাপতিও হতে পারি–
ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি মানুষ হবার!
তবে এই প্রবাদই যে সত্য হবে
এমনও কোন কথা নেই!

কি কথা থাকে আর কি হয়–
তার মাঝে তফাৎ বিস্তর।

৩. ইকবাল হাসান

অভিজ্ঞতার গল্প

অভিজ্ঞতা থাকা ভালো। যার নেই তাকে দেখি ভিক্ষা করে
প্রাগের রাস্তায়। কুকুরেরা শ্লেজগাড়ি টানে উত্তর মেরুতে।
চামড়ার পোষাকের নীচে এস্কিমোদের রয়েছে কিছু উষ্ণ
অভিজ্ঞতা। প্রকৃতি সন্তান ছাড়া তারা বোঝে ভালুক শিকার...
শীতকালে নারী ও ভোদকা পেলে আমরাও উষ্ণ হয়ে উঠি।
অবশ্য দক্ষিনে গেলে ভিন্নচিত্র, রোমের রাস্তায় – সন্ধ্যাবেলা
গনিকারা সারিবদ্ধ আধো অন্ধকারে, খদ্দের না পেলে খুনসুটি
আর এমন মরার বৃষ্টি, ক্ষতি নেই, ব্যবসা মন্দ গেলে
কপালের দোষ, বয়ফ্রেন্ড এসে তুলে নিয়ে যাবে...। তারপর
সারারাত মদে ও নেশায়..., যৌনকর্ম ডালভাত, ওসব কবেই
শেষ, প্রাত্যহিক কাজ, তাও কিছু অর্থ হয়, অভিজ্ঞতা থাকা ভালো
ড্যুপ্লোর আশেপাশে অন্ততঃ একটি রাত গনিকার সঙ্গে কাটানোর।

মস্কোতে একরাত

দুঃখের অতীত নেই–
সে শুধু বর্তমানের হাত ধরে চলে। যেদিকে তাকাই
দেখি, শ্বেত-ভালুকের পাশে
ঝুলে আছে বিষাদের ছায়া
কুহক জড়ানো রাত – ভোদকার বিজ্ঞাপনে
দ্বিখন্ডিত লেনিনের ছবি হয়ে ভাসে
আর দূরে মস্কোর আকাশে
সহসা উড়তে দেখি একঝাঁক পশ্চিমা শকুন
মধ্যরাতে ভলগার দু'পাড়ে নামে প্রেতের উৎসব
ক্রেমলিনের শিরোদেশে কাস্তের শরীর থেকে
হাতুরি উধাও; হায়
দৃষ্টি তবু খুঁজে ফেরে নীলিমা সবুজ...

যতই নিকটে যাই বন তত দূরে সরে যায়।

যতোই সূর্যাস্ত হয়

কাগজ কলম আর সিল্কের রুমালের মতো
স্ত্রীকে পাশে রেখে কবিরাই ঘুমুতে যায় অতি
প্রিয় নায়িকার সাথে, যারা ভালোবাসে নিসর্গের
কামরাঙা, নর্তকির তলপেট, অপার জ্যোৎস্না,
বৃষ্টি ও মাছ, চুলের অরণ্য আর শিশ্নের উত্থান...

কবিতা না লিখেও তারাই প্রকৃত কবি– নিবিড়
সূর্যাস্তের দিকে যারা যায়, চোলাই মদের পাশে
ভাবে রাখাইন মেয়েদের কথা, তাদের নির্ঘুম
রাখে সমুদ্রের ঢেউ, দুর্বিনীত স্তনের ইশারা...

না পাওয়ার বেদনা থেকে মৃত্যু ঢের ভালো। তবে
যতোই সূর্যাস্ত হয় – কবিতা দূর্বল হয়ে আসে
আকাশেই উড়াল দ্যায় প্রকৃত কবির কলম।

বহুদিন পর

তোমার সঙ্গে কথা না হলেই বরং ভালো হ'ত।

ঘুমিয়ে যেতাম আমি বিষাদের বালিশ বুকে নিয়ে...
আর এখন দ্যাখো, আমি দ্রব্যগুণে একটি বিশাল
তরবারির মতো ঝুলে আছি রাত্রির আকাশে
উল্কাপাত হচ্ছে আমার চারপাশে...
আমি তোমার কথার মধ্যে য্যানো একটি মাছের কংকাল।

বহুদিন পর এই অবেলায়
তোমার সঙ্গে কথা না হলেই বরং ভালো হ'ত।

ফেরার আগে

আমাকে দেখবে তুমি আরো কিছুদিন
রোদ বৃষ্টি মেঘের আড়ালে
কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আর রাতের ছায়ায়
পিতা ও প্রপিতামহের দীর্ঘশ্বাস থেকে উঠে আসা
বিষন্নতার ভেতর

আমাকে দেখবে তুমি ছায়াহীন দূরের আকাশে
য্যানো নিসর্গের বারান্দায় বিপন্ন বিদ্যুৎ ঝিলিক
সুক্ষ্ম রেখার মতো আমাকে দেখবে তুমি
অন্ধকারে হঠাৎ আলোয়
দূরের দিগন্তে ফোটা ভোরের কুসুম

আমাকে দেখবে তুমি আরো কিছুদিন
পাওয়া ও না-পাওয়ায়
দম দেয়া পুতুলের মতো নাচ্ছি গাইছি
মিশে যাচ্ছি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে
পোঁড়া কাগজের ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছি
হাওয়ায় হাওয়ায়...

অদৃশ্য প্রণয় কথা

আমার দুয়ার থেকে ফিরে গেল নিবিড় প্রণয়
কথাটা ঘুরিয়ে বললে প্রণয়ের সংজ্ঞা দিতে হয়
বলবেন, 'চালাকী শিখেছো খুব, আমরাও ঢের
জানি – কোনটা প্রণয় আর কোনটা প্রণয় নয়।
কতোবার আমরাও গেঁথে গেছি প্রণয়ের জালে
আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছে যারা দূরের ইশারা
তাদেরই পদচিহ্নে নিবেদন করেছি গোলাপ
শিখিয়েছি শ্রাবণের শেষে ঘন মেঘের প্রণয়...

দিন ঘুরে গেছে। আজ প্রণয়ের অর্থ হল লীলা

ও কামের উৎসব। নিলাভ আলোর নির্জনতা।
'...এই প্রণয় উপেক্ষা করে যে পারে সুদূরে যেতে
আমি তার পদধূলি চাই' – বলে আজ সে হঠাৎ
অদৃশ্য প্রণয় হয়ে আমারই পায়ে রাখে হাত...
শরীর জেনেছে শুধু এইসব তিক্ত অভিজ্ঞতা।

ঘরে ফেরে রাতের পাখিরা

[শামসুর রাহমান স্মরণীয়েষু]

নীলিমা বিধ্বস্ত হলে মন:কষ্টে ডুবে যায় চাঁদ।
জ্যোৎস্নার টলমলে রেখাগুলো শুয়ে থাকে নদীর চড়ায়
আদিগন্ত জুড়ে শুনি কুয়াশার নগ্ন পদধ্বনি
তুমি ছিলে মেঘ বৃষ্টি অলৌকিক, সর্বনাশা প্রবল খড়ায়।

আজ মৃতের কাফন পরে শূন্যতায় তুমি শোকসভা
প্রাণের পতাকা হয়ে আসাদের সার্ট দ্যাখো
হিরন্ময় মেঘের চূড়ায়
আমাদের ললাট জুড়ে নিরন্তর দু:খ তার নাম লিখে যায়
রূপালী স্নানের শেষে অত:পর ঘরে ফেরে রাতের পাখিরা।

পয়ারের মাত্রা

জানি আমি শেষমেষ এরকম হবে। ভুল ট্রেনে
উঠে যাবে তোমার মুখোশ। আর ক্রসিংয়ের লাল
ঠোঁটে চুমু খাবে বিকেলের রোদ। ধাতব গর্জন।
কতোটা শুদ্ধ হলে অভিনেত্রী বলা হয়ে থাকে –
সেই সত্য উদ্ধারে সহসা ছুটবে এক বিস্বস্ত প্রেমিক
হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নীচে যে শিশুরা খেলা করে –
তাদের মায়েরা কবে ভেসে গেছে সময়ের স্রোতে
দৃশ্যচিত্র বলে দেবে ভুল পথে গন্তব্য সুদূর।

তবু তুমি বারবার ধূম্রজালে নিজেকে জড়াতে

ভুল ট্রেন, ভুল ট্রেন ভালোবাসো শরতের শেষে
ঘুমুতে যাবার আগে খুলে গেলে তোমার মুখোশ
দৃষ্টিকটু হবে ? তোমার প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হলে–
হাঙরের চোখ থেকে মিটে যাবে সমুদ্রের ক্ষুধা।
কী এমন ক্ষতি হবে পয়ারের মাত্রা বেড়ে গেলে !

৪. গুলশান আরা কাজী

স্বপ্নের পাখিরা

স্বপ্নের পাখিরা উড়ে যায়
এক ফালি সাদা মেঘের সাম্পানে চড়ে
নীল আকাশের সাগরে।
ভেসে যায় দূর দেশে
সুরেলা কণ্ঠে গেয়ে ওঠে।

স্বপ্নের পাখিরা নেচে ওঠে,
থোকা থোকা মেঘের পাহাড়ের আনাচে কানাচে
খেলা করে,
জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের ছায়ার আলোতে
মেতে ওঠে
আম ফুলের মিষ্টি সুবাসে মাতাল হয়ে ওঠে
ভেসে আসা রঙিন ঘুড়ির সঙ্গে
খেলা করে
বাঁশির সুরের সাথে সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠে
বৃষ্টির ফোঁটা ফোঁটা বিন্দুতে পাখা ভিজিয়ে
নেচে ওঠে।

এরা ভোরের পাখি,
কালো রাত্রির ঘনঘোর আঁধার
বিদারক পাখি
এরা সত্যের পাখি, মুক্তির পাখি,
সম্প্রীতির পাখি।

উড়ে যায় লক্ষ্য করে
উন্মুক্ত সোনার তোরণ
অকস্মাৎ ছুটে আসে
উন্মাদ শিকারির গুলি
ফিনকি দেয়া রক্ত রঙিন করে
শুভ্র সাম্পান,
চমকে জেগে উঠি।

সেই মেয়েটি

প্রভাতের সূর্যোদয়ের সাথেই হতো তার আবির্ভাব।
সূর্যোদয়ের মতই সে ছিল চিরসুন্দর, চিরনির্ধারিত।
অতি সন্তর্পণে, নিঃশব্দে হতো তার নির্লিপ্ত গোপন আগমন।

এলোমেলো বিক্ষিপ্ত চুলের ঝাঁক
ওর কপালে আল্পনা এঁকে দিত।
অনেক অনাদর, অনেক অবহেলার প্রতিফলন ছিল
ওর কচি মুখের নিষ্পাপ চাহনিতে।
শতছিন্ন জীর্ন জামার কোচরে
ও তুলতো ভোরের শিউলী ফুল,
হলুদ ডাঁটার ফুলগুলো যেন অপেক্ষায় থাকতো
কখন ওরা স্থান পাবে ওর জামার কোচরে
কখন শীতল মাটির পরশ থেকে
ওর কোমল হাতের স্পর্শে ওরা প্রাণ পাবে
ওর বুকের কাছাকাছি, হৃদয়ের কাছাকাছি
ওর উন্মুক্ত পদস্পর্শে শিহরিত হতো উন্মুক্ত মৃত্তিকা,
দুরু দুরু কাঁপন জাগত তার বুকে।

আমি অপেক্ষায় থাকতাম রোজ কাকভোরে
গরম কফিতে চুমুক দিয়ে
ভোরের কাগজের পাতা উল্টোতে উল্টোতে,
আমার বাগানবাড়ির জানালায়,
কখন হবে ওর আগমন, সপ্তর্পণে।
কি অপরূপ দৃশ্য,
যেন মুক্ত প্রাণের শিশুর সঙ্গে
মুক্ত প্রকৃতির গোপন কানাকানি।
প্রাণের ভাষার কানাকানি
এক হৃদয় দিয়ে অন্য হৃদয়ের নিবিড় জানাজানি।
রোজ প্রভাতে ওর আসা যাওয়ার পর
শুরু হতো আমার দিন
খবর পড়ার শেষে তড়িঘড়ি করে অফিসে যাওয়া।
রোজকারের খবরে পড়ি

মধ্যপ্রাচ্যে চলছে ধ্বংসের লীলাখেলা
সন্ত্রাসীদের কবলে পৃথিবী বিপর্যস্ত
শঠতা ও ভণ্ডামির কবলে আমেরিকার স্টক মার্কেট বিধ্বস্ত।

হঠাৎ একদিন মেয়েটি এলো না
পরদিনও এলো না, তার পরদিনও নয়।
হলুদ ডাঁটার শিউলী ফুলগুলো
মাটিতে আছড়ে পড়ে নোংরা ক্ষতের মতো
তাকে কলকিত করে তুললো।

রোজকারের নিয়ম মতো
আমি ভোরের কাগজ পড়ি
আর, অপেক্ষায় থাকি তার আসবার।
কিন্তু মেয়েটি আর এলো না।
হঠাৎ খবরে পড়ি
আমার বাড়ির কাছে এক বস্তি
অগ্নিকাণ্ডের কবলে সম্পূর্ণ ধ্বংস।
সন্ত্রাসীদের বোমা বিস্ফোরণে
এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে
বস্তি জীবনের ক্লান্তি, বেদনা, অপবাদ ও লজ্জা
সব কিছুর অবসান ঘটায় এই বোমা
যেন ধিক্কৃত আত্মার কাছে
মুক্তির বাণী নিয়ে আসে এই বোমা।

পরদিনও সেই মেয়েটি এলো না
এলো না তার পরদিনও
কখনোই এলো না।

হলুদ ডাঁটার সাদা ফুলগুলোর জীর্ন প্রাণের হাহাকার
কিঞ্চিৎ দোলা দিল আমার পাষাণ হৃদয়ে
একটা ভয়াবহ প্রশ্ন তোলপাড় করে তুললো
আমার বক্ষপট
মেয়েটি কি আর নেই?

ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অভিনন্দন জানিয়ে

পরশ পাথর

বিশ্ব শান্তির পতাকাবাহী মহামানব
এলে শান্তির বাণী নিয়ে
সীমাহীন হিংসা ও ধ্বংসলীলার নাগপাশ কাটিয়ে
কাল রাত্রির দুর্বার সমুদ্র পার করে
দেখালে সোনালী দ্বীপের দিশা
দুঃস্থের মুখে ফোটালে হাসি
হাতে তুলে দিলে পরশ পাথর।
যার যাদু স্পর্শে আলোকিত হলো দিগন্ত
অনাহারের গ্লানি থেকে মুক্তি পেল মানুষ।

জ্যোৎস্না রাতে দোলন চাপার সুরভির মত
সুখস্বপ্নে বিভোর করে তুললে
অবহেলিত মানব জাতিকে
বিজয়ী সৈনিকের মতো অশ্বখুরের দুর্বার গতিতে
চারিদিকে আলোড়ন জাগিয়ে
তুমি এলে।
তুমি অর্জন করলে বিশ্বশান্তি পুরস্কার, ২০০৬
নবেল পুরস্কার।
জীর্ণ-শীর্ণ বাংলাদেশকে পৌঁছে দিলে
গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে
ছোট্ট কুটিরের ছোট্ট প্রদীপ
তুলে ধরলে পৃথিবীর সামনে
সহস্র সূর্যের মতো জ্বলে উঠলো
সেই ছোট্ট প্রদীপ
আলোকিত হলো দিগ্বিদিক ।
সাথে মিলে জনতার মিছিল
সাদা পতাকাবাহী জনতার শান্তির মিছিল
তুমি এলে বিশ্ববিজয়ী বীরপুরুষ হয়ে
নির্ঘুম নিরলস ভাবে চালাও তোমার জয়যাত্রা
গড়ে তোল শান্তিময় পৃথিবী।
তোমাকে শ্রদ্ধা জানাই, তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

৫. জাহানারা খান বীনা

ভ্রম

জলের উপর শুয়ে আছে চাঁদ
নক্ষত্রের রাত।
বিগলিত জ্যোছনায় কাঁপে বিরানভূমি
ভ্রম তুমি এলে
একটু একটু।

উপত্যকায় ফুটেছে লাইলাক ফুল
চোখের তারায় আফ্রোদিতি সৌন্দর্য
অনাবৃত ধবংসস্তুপে দাঁড়িয়ে আমি
আকাশ দেখি।
ভ্রম তুমি একটু একটু
বাড়াও দু'হাত
আমি তোমার দু'হাত ধরে ছুটে যাই
গ্রহ থেকে গ্রহে।

আমাদের রাতজাগা শরীরে
খেলা করে
সকালের শিশু রোদ
অনন্ত দুপুর ম্যালে নৈ:শব্দের হাওয়া
আমার চারিপাশে ক্রমাগত: বসন্ত
ফুল রঙ সুবাস
আমি কোনটি নেব?

নীরোর বাঁশিতে শুনি
সেই এক পোড়ানগরীর ইতিহাস...
ভ্রম আমি ক্রমশ: বন্দী হই
তোমার অনন্য ভাষায়।

অরফিয়াসের বাঁশি

বিষণ্ণতার চাদরে ঢেকে আছে চাঁদ।
নির্ঘুম রাত্রি।
দেওয়ালের অর্কিডে খেলা করে
জলরঙে মৃত্যুদৃশ্য
কতদূরে সূর্য সকাল?
পরিশ্রান্ত পথ খোঁজে
অবারিত বিশ্রাম।

সময়ের পথে পথে
নিভাঁজ কালো অন্ধকার
আলোর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন
একাকী রাত্রি
হিম, শীতল অরণ্য চায়
মূর্হূতের উত্তাপ।

হৃদয় সমুদ্রে রক্ত ঝরে
রক্ত ঝরাও তুমি
রক্ত ঝরাই আমি
আর
আমাদের বিচ্ছিন্নতায় কেঁদে মরে
কি দারুণ
অরফিয়াসের বাঁশি।

ফিরে আসি

নীল প্রজাপতি
ফিরে যায় অরণ্যে
সাদা মেঘ শূন্য থেকে শূন্যে
সমুদ্রের কাছে নির্বাসিত আমি
ফিরে আসি লোকারন্যে।

পরিত্যক্ত জীবন
রোদে জলে একাকার
ধুসর মাটি জানে
বৃক্ষ তোমার ইতিহাস।

ইদানিং নিজের সঙ্গে নিজে
খেলতে পারি বাঘবন্দী খেলা
নিমর্ম নিমগ্নতায় কাটাতে পারি
অনন্ত দুপুর।

নিরুত্তাপ রাত্রি।
গোপন অন্ধকারে আলো জ্বালে
মৃত জোনাকী
বিচ্ছিন্ন মুর্হূতগুলো
ছেঁড়া কবিতার মমতা...
সেই কবে তুমি এসেছিলে
নরম আলোর মত সংক্ষিপ্ত রাত্রি
দ্বিধাহীন
হঠাৎ হাওয়ায় খুলে গেল অর্গল
অনুকার।
পরিব্যক্ত অনুকারে
ফিরে যাও তুমি
ফিরে আসি আমি।

কাঙ্ক্ষিত বনভূমি

শীতের শেষে বসন্ত
এসেই পড়লো
আমার বাগানের গাছে গাছে
ঝ'রে পড়া বির্বণ পাতাদের
টুপটাপ শব্দ
কিংবা
ভোরের শিশির ভেজা বাতাসের

সুগন্ধটুকু
এখন আর নেই।

এমন বসন্ত। শুধুই বসন্ত
বাতাসে চেনা অচেনা ফুলেদের
মিলিত সুবাস
ফালগুনের মিঠে রোদ
আর ঘুঘু ডাকা ক্লান্ত দুপুর।

বুকের ভিতরে
হু হু করে
ভালোবাসার রক্ত গোলাপ
এক কাঙ্ক্ষিত বনভূমি,
ধাবমান রেলের দূরন্ত গতিতে
ছুটে চলে স্বপ্ন মিছিল
আর
হৃদয়ের নির্জনতায় সুতীব্র হয়ে
বেজে ওঠে
শুধু
তোমাকে দেখার
কাঙ্ক্ষিত বাসনা।

৬. জায়েদ ফরিদ

বিষয়-অতীত

যতটা দেখছি খোলাজল
শুশুকের ধনুক ব্যঞ্জনা
তদপেক্ষ স্বপ্নময় ডিভির পাটাতনে
থালাভর্তি সরিষা-ইলিশ

যুগ যুগ ধরে ফলের বাগানে হাঁটি
নিচে ঝরা পাতা, ওপরে গণনা করি–
মেদের বাহুল্য ভরা রসালো কাঁঠাল
এবং ভেতরে কত আঁটির আধিক্য

ঘোলা জল, ঝরা হলুদ পাতার সাথে
মানুষের নেই কোনো বিষয়-অতীত

কতটা হৃদয় আছে মাটির পাহাড়ে
ততধিক সন্ধান করি চূড়ায় চূড়ায়
কতটা জমেছে শিশুখাদ্য

মরীচিকা

জল ভালোবাসি
তাই ঝাঁঝাঁ রৌদ্রেও দেখছি
মরুসম্ভব মরীচিকা

একনিষ্ঠ সনাতন ঢেউ
এতটা ইন্দ্রিয়পর, যেন
সমুদ্রের ছাদে রঙিন মাছের ঝাঁক
বদলে ফেলছে জলরং
যে-কোনো মুহূর্তে শঙ্খ হাতে
উঁকি দেবে জলকন্যা

এখন পিপাসা নেই, মরুক মরীচি
জলের আঁচল টেনে নিক জলাশয়
বালুচরে ঘুমাক শঙ্খিনী...
জেগে উঠলেই জিজ্ঞেস করো তাকে–
কে অধিক জল ভালোবাসে?

জল নারী মোহনা

শায়িত নারীর দেহ ঝাঁকুনি খেলেই বুঝি
ভেতরে রয়েছে সান্দ্র জলের দ্রবণ

বাষ্পের সিঁড়ি বেয়ে উবে যায় সমুদ্রের জল
নেমে আসে অরণ্যে পর্বতে, আর আমাদের
অন্তঃস্বত্তা নারীদের হৃদে জলাশয়ে

জলের অস্তিত্ব বোঝে তৃষ্ণার্ত পুরুষ
ডালপানহেতু তার চাই ফিরে আসা
পুরনো দীঘির কোণে, নোনা মোহনায়

গৃহান্তর

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি অন্ধ
ডুবে আছি জল-ঘরে খাদ্যবস্ত্রহীন
ভুতুড়ে চিৎকারে জানালার মুখ গলে
উঠানে রেখেছি শিশু-পা...
নক্ষত্রের নৃত্য যত ঘরের বাইরে

সোনালি রূপালি পাত্রে বহুবিধ জীবন-মমতা
ছড়িয়েছে অলিগলি প্রধান রাস্তায়,
দুপাশের প্রাণী জল বৃক্ষের বাগানে

সড়কের শেষমাথা বেঁকে গেছে
পারবিক চিত্রশালায়
অন্ধকার ঘরে নেই চিত্রকর
দেয়ালে টাঙানো জলরঙে
বাগানের মৃদু আলো

কল্যাণ

ভাঙা নয় জলেই সচল
মাটির মড়ক এলে শাপলা-খোঁপায়
সেই জল কাছে আসে পরিচর্যাহেতু

বৃক্ষ নয় মানুষই সচল
যে-কারণে গাছের অসুস্থতায়
শোলার টুপি পড়ে আমরাই হেঁটে গেছি
বৃক্ষের পল্লীতে

এমন আত্মীয়ঘন সুখেরও অসুখ আছে–
চারদিকে নষ্টগন্ধ জলের বাগান
জীবনের কোষে কোষে ছিনতাই, ত্রাস

বলি, বৃক্ষ ডাঙা পরম আত্মীয়কুল
জল-মানুষের এই দ্বিবিধ কল্যাণে
তোমরা কি পা চালিয়ে আসবে না কাছে!

সান্নিধ্য

ছায়ার আশ্রয়ে থেকে বারবার দেখি
ফলহীন পাখিহীন বিস্রস্ত পত্রালি
লঘুকেশে বেড়ে ওঠা দীঘল মস্তক

কেন অকারণ করাতির চড়া দাম

বাষট্টি বসন্ত তার ফালি করে নেবে?
আমি কি চেয়েছি কোনো রূপের কলস?
না কি অদ্যাবধি আছে বলিক-রসনা?

আমার সান্নিধ্য চাই প্রাচীন বৃক্ষের
দু-হাত বাড়িয়ে আমি যুবক আবেগে
জড়িয়ে ধরতে চাই অতীত কোমর
বীজের প্রতীজ্ঞাবহ পুরাতন নাভি

৭. জিয়াউদ্দিন আহমেদ

ছদ্মবেশী

কেউবা বলে মৃদু ভাষী
প্রলয়কারী কারুর কাছে।
কেউবা জানে কোমলমতি
পাষাণ হৃদয় অন্যে ভাবে।

কেউবা দেখে ভীষণ রাগী
মাটির মানুষ কেউবা জানে
কেউবা শুনে মহান দাতা
ভীষণ চামার অন্যে শুনে।

ভাবে কেহ কুটিল মনের
সহজ সরল অন্যে দেখে
বলে কেউবা কবি মানুষ
সংস্কৃতিহীন কেউবা জানে।
আমি ভাবি আপন মনে
কোনটা আসল কোনটা নকল
জানে কি কেউ এই ভুবনে।

সীমার গভীরে

অশ্রু শুধু দুখিনীর জন্য নয়
আনন্দ নয় শুধু সুখীদের।

স্বাধীনতা শুধু পতাকার জন্য নয়
পৃথিবীর নয় শুধু মানুষের।
কল্পনা শুধু কবিতার জন্য নয়
মেঘমালা নয় শুধু আকাশের।

চাঁদ শুধু জোছনার জন্য নয়
ঈশ্বর নয় শুধু উপাসনালয়ের।
অন্ধকার শুধু আলোহীন নয়
নারী শুধু নয় পুরুষের।

নক্ষত্র শুধু সৌরলোকের নয়
যৌবন নয় শুধু তারুণ্যের।
স্রষ্টা শুধু সৃষ্টির জন্য নয়
স্বপ্ন নয় কেবল নিদ্রার।

ভালোবাসা শুধু দুঃখের জন্য নয়
যুদ্ধ নয় শুধু ধ্বংসের।
তপস্যা শুধু পাওয়ার জন্য নয়
জন্ম নয় কেবল মৃত্যুর।

উপসংহার :
জন্ম একটি উপহার।
জীবন অনন্য কিন্তু নয় অফুরন্ত,
প্রত্যেক মুহূর্ত হোক অর্থময়
সীমার গভীরে নিতে অমরত্ব।

তোমাকে খুঁজি

তোমাকে খুঁজেছি অনেক
বারে বারে!
কৈশোরে কৌতূহল চোখে
যৌবনে আকুলতায়।
দুখের সংসারে অথবা
সুখের পৃথিবীতে।
প্রার্থনায়, ধ্যানে,
সঙ্গীতে ও কবিতায়।

তোমারে খুঁজেছি অনেক
বনে-বাদাড়ে জনপদে,
প্রাসাদে, খড়ের কুটিরে,
ছায়াঘেরা বৃক্ষের নিচে,
যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

কোথাও পাইনি খুঁজে।

অথচ আমার একাকিত্ব
বুকে নিয়ে যখন দাঁড়াই
নিজের মুখোমুখি নির্জনে,
কল্পনার ক্যানভাসে
তোমাকে পাই খুঁজে।

তুমি এসে ধরা দাও সহজেই
আমার সামনে এসে দাঁড়াও
মৃদু হেসে।

প্রবাসী হৃদয়ে স্বদেশ

দেশ,
শুধু ভূখণ্ড নয় অসাড়
মাটি নয় নিস্প্রাণ।
মানচিত্র নয় ভৌগোলিক,
কেবল ইতিহাস নয় স্মৃতির পাতার।

দেশ,
শুধু ঠিকানা নয় অর্থহীন
কেবল বাস্তুভিটা নয় পিতামাতার।

দেশ,
সময় শেষে যাযাবরের
ঘরে ফেরার আকুল আহ্বান।
অনেক নির্ঘুম রাতের পর
নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ার সবুজ গালিচা।

দেশ,
বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহা,
মরে যাবার অপূর্ব পরিতৃপ্তি।

জিয়ারত হোসেন

ঋতু সম্ভার

অনেক বসন্ত গেলো, দেখিনি তোমায়।
দেখিনি তোমায়
ফাল্গুনের সুবাস ছড়ানো হাওয়ায়।
দেখিনি তোমায়
গ্রীষ্মের সবুজ শ্যামলীমায়।
দেখিনি তোমায়
বর্ষারাতের অশেষ শ্রাবণ ধারায়।
দেখিনি তোমায়
শরতের স্নিগ্ধ চাঁদের ছায়ায়।
দেখিনি তোমায়
হেমন্তের সোনালী ধানের মায়ায়।
দেখিনি তোমায়
শীতের শিউলী ফুলের মেলায়।
অনেক বসন্ত গেলো, দেখিনি তোমায়!

সৃজনী

তোমাকে মনে পড়ে
দিনের আলোয়, রাতের প্রহরে।
তোমাকে মনে পড়ে
গোধূলির সাজে, ভোরের শিশিরে।
তোমাকে মনে পড়ে
পদ্মার ঢেউ-এ যমুনার পাড়ে।
তোমাকে মনে পড়ে
মেঘনার স্রোতে, কর্ণফুলীর তীরে।
তোমাকে মনে পড়ে
পাতা-র মেলায়, নগরের ভিড়ে।
তোমাকে মনে পড়ে
দেশের গন্ধে, প্রবাসের নীড়ে।

গল্প ও কবিতা

কবিতা বলে–
ভাই গল্প, তোমার জন্ম কোথায়?
গল্প বলে–
আমি থাকি রূপকথার রাজ্যে
জোছনা রাতের তারায়। নিঝুম অন্ধকারে
ভূতের গলির নির্জন কিনারে।

গল্প বলে–
কবিতা, তুমি থাকো কোথায়?
কবিতা বলে–
বাস আমার রাজপথের মিছিলে
বস্তির স্যাঁতসেঁতে কুঁড়েঘরে
হাড্ডিসার শিশুর নির্জীব অন্তরে।

কবিতা বলে–
ভাই গল্প, তুমি বেঁচে থাকো কিভাবে?
গল্প বলে–
চাঁদের বুড়ির চরকা কাটার শব্দে
পাতালপুরীর মানিক খোঁজার ভিড়ে
চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙার নোঙরে।

গল্প বলে–
কবিতা, তুমি বাঁচো কিভাবে?
কবিতা বলে–
বর্গাচাষীর হাত আমার বেদনায়
দিনমজুরের জঠর জ্বালায়
জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার বীভৎসতায়।

কবিতা বলে–
ভাই গল্প, হাতে অনেক কাজ
এবার যেতে হবে আমায়

গল্প বলে–
ভাই কবিতা,
আরেকটুক্ষণ বসো
গল্প করি দু'জনায়।

কবিতা বলে–
সে তোমার কাজ, আমার নয়।
গল্প বলে–
গল্প করা কি সবার কাজ হতে পারে না?
কবিতা বলে–
হতে পারে, যদি তুমি বাস করো পৃথিবীতে।
গল্প বলে–
আমাকে কি সেখানে কাজ করাতে হবে?
কবিতা বলে–
তাতো বটেই। নইলে খাবে কি?
গল্প বলে–
কাজ না করেও অনেকে যথেষ্ট খেতে পায় পৃথিবীতে!
কবিতা বলে–
হ্যাঁ, অকর্মণ্য নেতারা ভোগ করে, সমর্থনকারী রত্ন নিরাহারী!
গল্প বলে–
তাহলে আমি কাজ করবো কেন?
কবিতা বলে–
কাজ করলে তুমি হতে পারবে আমাদের একজন।

গল্প বলে–
তাতে লাভ?
কবিতা বলে–
এতে গল্প-কবিতা গ্রন্থিত হবে একসাথে।
গল্প-কবিতা বলে–
ভেসে যাক অনিয়ম মিত্র শক্তিতে।

৮. দলিলুর রহমান

লাল গালিচা

দৃশ্যটা দেখে আমি চমকে যাই
অভিভূত হয়ে পড়ি
জিয়া বিমান বন্দরের ভেতর
লাল গালিচার উপর দিয়ে হেঁটে আসছে প্রবাসীরা
আর ঢাকার যত ভিআইপিরা–
রাজনীতিকরা, ব্যবসায়ীরা, জেনারেলরা, মন্ত্রীরা, সেক্রেটারিরা
পুলিশ সুপার-ইউনিফর্ম পরা কনস্ট্যাবলরা– ওদের দিকে ফুল ছুড়ছে,
মালা দিচ্ছে–কী অদ্ভুত!
যেনো মিছিলের ঢল, আষাঢ়ের ঢলকেও ছাড়িয়ে গেছে
মানুষের ঢল-সুট পরা, প্যান্ট পরা, জিন্স পরা, শাড়ি পরা, শার্ট পরা
বর্ষা নদীর ঢেউয়ের মতো–
বাতাসের তরঙ্গের মতো–
অঘ্রাণের ধান ক্ষেতের মতো
নকশা আঁকা খণ্ড খণ্ড মেঘের মতো
নেচে নেচে আসছে মানুষ
জড়সড় হেঁটে যাচ্ছে কেউ– মাথায় ঘোমটা–
কপালে জবজবে সিঁদুরের টিপ কারো–
পরনে সিলকের শাড়ি, সিফন, সুতি-ধুতি
জংলা শাড়ি পরা কেউ, সদ্য বউ হয়েছে কেউ
মুখে হাসির ফোয়ারা, আহা লাল গালিচা! তার উপর ফুল!
হাঁটো–
আলতা পরা পায়ে–
আলতু আলতু হাঁটো,
ফুলের গালিচায় হাঁটো।

নিউইয়র্ক থেকে আসছে ব্যবসায়ীরা:
জ্যাকসন হাইটসের
এস্টোরিয়ার
জ্যামাইকার
চার্চ ম্যাগডোনালের

ক্যানাল স্ট্রীটের
আস ট্যাক্সি ড্রাইভাররা, হকাররা, হোটেল বয়রা আস
ছাত্ররা, শিক্ষকরা, পণ্ডিতরা, বিজ্ঞরা, বিজ্ঞানীরা,
আনন্দের তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে আস
অবস মুখে
বউ হারানোরা আস
মলিন সুখে
স্বামী হারানোরা আস
হাতে সবুজ-নীল ডলার নিয়ে আস
নাও-নাও-ফুল নাও
বেলী, টগর, গোলাপ, ডালিয়া
দেখো লাল গালিচা ভরে গেছে ফুলে ফুলে
লাল-নীল-হলুদ, সবুজ, বেগুনি।

ইংল্যান্ড–অস্ট্রেলিয়ার থেকে আস
হোটেল ব্যবসায়ীরা আস, চাকরিজীবী, শ্রমজীবীরা আস
মধ্যপ্রাচ্য থেকে আস, এয়ারপোর্ট কর্মীরা, রাজমিস্ত্রিরা
ওস্তাগাররা, বিক্রি হয়ে যাওয়া নদী ও শিশুরা আস
বাদশাদের–রাজপুতদের রক্ষিতারা আস
হাতে পাউন্ড–রিয়েলের অলৌকিক শক্তি নিয়ে আস
দেশের বাতাসে শ্বাস নিতে
বর্বর বায়ুতে ঘ্রাণ নিতে
মৌল গহ্বরকারাগারে অমৃতের অভিসারে প্রাণ দিতে
শিক কাবাব ও কষা মাংসের ঝাঁঝালো গন্ধ নিতে আস।

সাউথ কোরিয়া– কুয়ালালামপুরে লাইন ধরে
দাঁড়িয়ে থাকা কর্মীরা
সব হারিয়ে জেলবাসীরা
জীবিকার আশায়––জীবনের আশায়
যারা কুলি- কেরানি ছেড়ে
ঠেলাগাড়ি রিক্সা ফেলে
লাঙ্গল জোয়াল ফেলে
শস্য জমি ফেলে
স্ত্রী-ছেলে মেয়ে ফেলে–চলে গেছ

ভাল কাপড় চোপড় পরে রোজ ঘানি টানছো
তারাও আস-ফুল-তোমাদের জন্য ফুল
তোমরা একুশের সালাম বরকতের মতো জানো?
দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোটিপতিরা, ব্যাঙ্কের সিওরা, ম্যানেজাররা,
বড় সাব, ছোট সাব, লাখপতি কেরানীরা
মিলনিয়ার সংসদরা, ধনকুবের ঋণ খেলাপীরা
ওরা তোমাদেরকে বরণ করতে এসেছে
নাও- নাও- ফুল নাও
তোমাদের জন্যই ফুলে ফেপে উঠেছে ট্রেজারী
তোমাদের জন্যই বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে হাইক্রেপার
তোমাদের জন্যই ট্রেন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সেলফোন–
শক্ত শক্ত লোহার পিলারে ক্রেন ঝুলছে
গড়ে উঠছে বসুন্ধরা, পান্থশালা,
উত্তরায়, ধানমণ্ডিতে, বনানীতে, গুলশানে নীলিমাভরা আকাশতলা,
রাতের চোখে শিখা–
ভাবুকের মাদকের উর্বশীর ঝলকে
রাতের ক্লাবে রুমাস্তের নীল আলো
ঢেউ তুলে– সুর তুলে– গমকে।

সহসাই আমার ঘুম ভেঙে যায়
পরক্ষণেই আমার চোখের সামনে সব কিছু– উল্টাপাল্টা হয়ে যায়
আমি দ্বিধাগ্রস্ত– সন্ত্রস্ত-তপ্ত মাথায় নীরব বিস্ময়ের ঘোরে
বাইরে তখন স্থবির ট্যাক্সি, বাস, ট্রাক, টেম্পো, জঞ্জাল ভর্তি গাড়ি
আর জগবাম্প শব্দাবলী।
হাতের ডানদিকে প্রবাসীদের লাইন
তারা যত্নে বাঁধা বাক্স-পেটরা-সুটকেস–খুলে–
মেলে ধরেছে–
আটকে পড়েছে চিরন্তন জটিল জটলার দরজায়
ফিরে এসে এই দুর্গম ঘরে কাতর মিনতি
তাদের ললাটে আহা! কুটিল ভ্রূকুটি
ছাড়া চাও? দাও দশটা ডলার দাও
একটা শ্যাম্পো দাও
দুটো সাবান দাও; না না ওটা না– পিঙ্ক রঙের ডা-ভ দুটো দাও
দু'প্যাকেট সিগারেট দাও– মার্লবরো হলে ভাল হয়– ৫৫৫ হলেও চলবে।

বাম পাশে তখন ভিআইপি লাইনে লাল গালিচায় এগুচ্ছে
এক দল সাপ, বিচ্ছু, শৃগাল, ফেউ, বানর, হায়েনা
হাতের রঙিন ফেস্টুন নিয়ে– একদল নবীন তরুণ-তরুণী
তাদেরকে আলিঙ্গন করছে–
দুচোখ ভরে সেই দৃশ্য দেখে আমি আবার চমকে উঠি

নিউইয়র্কের একটি ক্যাফেতে বসে ঝিমুই আর ভাবি
দেশে বন্যাক্রান্ত ঘরের মতো–
মা, বাবা, ভাই, বোন সবাই অবরোধে ঘরবন্দি
তাদের পালাবার কোন পথ নেই।
তাদের পালাবার কোন পথ নেই।

মৃতদের সভা

এ রাত মৃতদের
ও রাত্রের মৃতরা এগিয়ে যায় ধীরে
আকাশের তলে–রাক্ষসীর চোখের মতো তারা জ্বলে
সভ্যদের কালো হাত– কালো মুখ–কালো ডানায়
গিলে ফেলে পৃথিবীকে–কালো কালো ছায়ায়

মৃতরা যুদ্ধদের থেকে আসে
তেলের ভূমি থেকে আসে
বদ্ধভূমি থেকে আসে
সৈনিক ক্যাম্প থেকে আসে
বাড়ি থেকে আসে
ঘর থেকে আসে
পথ থেকে আসে
সভা থেকে আসে
মৃতরা প্রিয়জনদের ছেড়ে আসে

রাতের আঁধারে পুরানো মৃতরা আর নতুন মৃতরা জড় হয়
আগামী দিন, মাস, বছর– আরও কত মৃতরা এ খানে আসবে।
তাই নিয়ে কথা বলে আর কাঁদে।

পুরানো মৃতরা পথম ও শেষ বারের মতো কোলাকোলি করে বিদায় নেয়
নতুন মৃতরা আগামীর মৃতদের জন্য অপেক্ষা করে

সভাটি পণ্ডিতদের হিসেব ডিঙিয়ে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আমাদের ঘরে

একদল তরক্ষুর জটলায় আমাদের ঘরে
এখন কেবল হতাশা; শান্তি গেছে উড়ে
হিংস্র একদল ফেউরের হাকে
আকাশ জটিল কুয়াশায় ঢাকে
দেশকে তারা বাসেনি ভালো লুটছে সম্পদ ভুরিভুরি
ক্ষুধা তাদের মেটেনি কোনদিন করিয়া সাগর চুরি
অকাট মুর্খরা দেশকে দিতে পারেনি আজো কিছু
দুঃখ, যাতনা, দুর্ভোগ-খেয়ে আসে মানুষের পিছু পিছু

লোভীদের বগলদাবা করেছে সুযোগ সন্ধানীরা
দুর্যোগের অভিশাপ ঠেলে দিচ্ছে বিদেশী বন্ধু-বান্ধবীরা
তাদের কুচক্রে-বাণিজ্যের মধুকর
ছেড়ে যায় আমাদের ঘর
বোনে তারা মৌচাক প্রতিবেশীর ঘরে
ফেউর-তরক্ষুর জটলার ঘর থেকে শান্তি গেছে উড়ে।

বোমা

বোমা ফাটে--মাথা ফাটে
বোমা ফাটে--মাথার খুলি ফাটে,
বোমা ফাটে--পা উড়ে যায়,
বোমা ফাটে--হাত উড়ে যায়

সন্ত্রাসীদের বোমা ফাটে
মানুষ মরে, মাথা উড়ে যায়, পা উড়ে যায়, হাত উড়ে যায়

যুদ্ধবাজদের বোমা ফাটে
গ্রাম উড়ে যায়, শহর উড়ে যায়, পাতাল উড়ে যায়, সভ্যতা উড়ে যায়
মৃতদের খুলি, হাড়গোড় গুঁড়া ধূলিকণা হয়
আলো নিভে যায়, অন্ধকার নেমে আসে

ধ্বংসস্তূপে-মাটি, পাথর, ধূলিকণা আর মৃতাবশেষ
ধর্ষিতার চোখের জলে ভিজে; সব কাদা-কালি-হিংস্রতার ছবি আঁকে
আর সে ছবিতেই মৃতরা জীবিত সভ্যদের ন্যাংটো দেখে।

৯. দাউদ হায়দার

প্রান্তিক-গহনে

আজ আমি আর্জেন্টিনার ব্যুয়োনোস আইরিসে
আংশিক মহাদেশ গড়বো বলে
সুচিহ্নিত করছিলাম আমাকে। কিন্তু এই উনিশে
নভেম্বরে মেঘের বর্ণচ্ছটা। আকাশ মেতেছে কোলাহলে।

'তোমাদের রবীন্দ্রনাথের বিজয়া, মানে, আমাদের
ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর স্তোত্রময় বাড়িটাও দেখে যাও;
যদিও এখন ধ্বংস-প্রায়, উৎসাহ নেই ভ্রামণিকের,
লোকেও ভুলে গেছে অসমাপ্ত নায়িকা, ওকাম্পোর নামটাও'

আমার অনুবাদিকা হঠাৎ আমাকে সন্ধিক্ষণে
দাঁড় করিয়ে নিজেই নির্বাসিত হয়ে যান।

বলছিলাম মেঘের কথা। এভাবেই আমি প্রান্তিক-গহনে
দেশ থেকে দেশান্তরে উদ্বাস্তু ভাসমান।

সীমান্ত পেরিয়ে

এক মিলিমিটার পরিসর নিয়ে দেবতাদের
মল্লযুদ্ধ দেখতে-দেখতে
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মধ্যরাত। ভিনগাঁর চাষীদের
চিৎকারে হঠাৎ জেগে দেখি, অগ্নিবর্তে
দোহারপাড়া, মধ্যমগ্রাম।

কাঁটাতারের সীমান্ত পেরিয়ে যারা
ফিরছিল, উদ্বাস্তু, নিঃশেষ;–
ভাবছিল, দেশ-ছাড়া
কীভাবে বাঁচা যায়, না-কি, গড়ে তুলবে দন্তকারণ্য, উপনিবেশ?

যত বৈরাগী

যে-সমূহ বিপন্নতা ঘিরে আছে, তার মূলে
একটি হলুদ পাখি
উড়ে এসে বসেছে দাওয়ায়

গারো পাহাড়ের নিচে যে-মেয়েটি চুল খুলে
নিসর্গের কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কালবৈশাখী
ছিন্ন করে দিল সমস্ত আঙ্গিক;– এই নাটকীয়তায়
জগদ্ধাত্রী পুজোও শেষ হয়ে গেছে, বাকি
এখন তৃতীয় পৃথিবী;--বৈরাগী যত আমার সুলক্ষণ জোনাকি।

১০. দিলারা হাশেম

প্রেম

এক.
প্রেম সে তো নয় চুড়ি বালা
ইচ্ছেমত খুলব পরবো
রাখবো দিয়ে তালা।

অঙ্গসজ্জা সঙ্গ ক্ষণিক
নয়কো প্রেমের রীতি
প্রেমের সুবাস মাখলে অঙ্গে
পায় সে চির স্থিতি।

প্রেমের পাখি রয়না দাঁড়ে
সয় না বাধা বাঁধন
আপনি এসে দেয় সে ধরা
আপনি থামায় চলন।

দুই.
সে কথা হয়নি বলা
থাক না তা আজ তোলা

তোলা থেকে থেকে
ভাঁজ করা জামদানির মত
ভাঁজে ভাঁজে ফেটে গেছে মন।
প্রতীক্ষা দীর্ঘ হতে হতে
বাসি পান্তার মত গেঁজিয়ে গিয়েছে প্রেম
বাসনা মোম জ্বলে জ্বলে গলে শেষ।
ছোঁয়া আঙুলের একটু আলতো
না পেতে পেতে তানপুরার
তারে ধরেছে রং।

বাগানটায় মালচ্ দাওনি কতকাল?

মন তো টিউলিপ নয়
আপনি ফুটবে গ্রীষ্মের সাড়া পেলে।
তুমি ভেবেছিলে প্রেম 'পেরেনিয়াল'
অনাদরে অযত্নে ফুটবে যথারীতি।
তুহিন শীতে বরফে ঢাকা থেকেও
সে আছে, থাকবে মাটির চাদর মুড়ি দিয়ে
সে তোমার ভুল।

তুমি ভেবেছো দামি স্টেরিওটার মত
ঘরের অঙ্গসজ্জা হয়ে
প্রেম প্রতীক্ষা করবে।
যখন ইচ্ছে হবে– অন করে দিলেই
সে বাজবে মনের মত

তা তো নয়।
প্রেম যন্ত্র নয়–
দূরালাপনী আর ই-মেইল
বাঁচাতে পারে না প্রেম।

তুমি ভেবেছো সব থাকবে
সব হবে আগের মতন
সে তোমার ভ্রম।
প্রেম বায়েবীয় নয়
তরে চাই জৈব রসায়ন।

বেহিসেব

তুমি শুধুই ছিঁড়তে জানো
পাড়তে জানো
থলের ভেতর ভরতে জানো
নিংড়ে মুচড়ে সবটুকু রস
বের করে ঠিক আনতে জানো
ইউরো ডলার গুনতে জানো

লাভ লোকসান বুঝতে জানো
বকেয়া বাকি হিসেব বুঝে
উসুল করে আনতে জানো
তোমার দিকে কতটুকু হেললে পাবে
গুনতি পাকা করতে জানো
কথার নিক্তি কষতে জানো
ডালপালাতে বুদ্ধি তুমি
বিস্তারিত করতে জানো
তিলে দিয়ে কোথায় গিয়ে টানলে
পাকা হবে গেরো অংশটুকু নিখুঁত জানো
এড়িয়ে কাঁটা রসের হাড়ি পাড়তে জানো
কেল্লাফতের রাস্তা জানো
টানেল ধরে সমুখ পানে
এক ধেয়ানে চলতে জানো
সুঁই চলে না তেমন পথেও
শাবল হয়ে ঢুকতে জানো
ঈপ্সিত ধণ গর্ত খুঁড়ে
বের করে ঠিক আনতে জানো
পকেট ভারির গর্বে তুমি
ধরাটাকেই সরাখানা করতে জানো
নতুন গাড়ি নতুন বাড়ি নতুন নারী
ইচ্ছে মত হাসিল তুমি করতে জানো
চালনি দিয়ে জীবন চেলে
কাঁকর বেছে শস্যদানা খুঁজতে জানো

কিন্তু শুধু জানোনা হায়
শুভঙ্করের ফাঁকির কথা
সোনা ফেলে পাথর কুচি কুড়িয়ে নেবার
হঠকারিতার গোপন ব্যথা
সারা জীবন হিসেব কষে
যে মালামাল করলে পাহাড়
সে যে শুধু চোরাবালি নেহাৎ অসার
সেই পাহাড়ে উই-এর বাসা
পকেট ভরে আছে শুধুই
কাঁচের কুচি ধুলো ঠাসা

গোলা ঘরে ছিদ্র ছিল বেজায় বড়
সব সঞ্চয় গেছে ঝরে
মনের কাঠে ঘুণ ধরেছে
প্রাণের শিকড় গ্যাছে মরে।

নো এক্সিট

বাইরে দাঁড়িয়েই কাটবে চিরদিন
অন্দর মহলে অনেক ভিড়
পরিতোষে পরস্পরের নিমগ্ন সকলে
দাঁড়িপাল্লায় মাপামাপি ঢের।
প্রতিযোগিতায় কে এগোয়, কে পিছোয়
সব থাকে মুখোশের আড়ালে ঠাসা
অধরে মাখানো থাকে সদাতুষ্ট হাসির প্রলেপ
মেকি তোষামোদি।
ওরা দলে ভারি। মোহন জানালা খুলে
লালচায়, উস্কায়, এসো এসো ঘরে।
প্রলোভিত হই বর্ষে; দরজা খোলে না।
কড়া নেড়ে নেড়ে হাতে কড়া পড়ে।

আমার আর্ত-চিৎকার
পৌঁছয় না ভেতরে। আমি 'আউট সাইডার'।
বাইরে দাঁড়িয়ে রোদে জ্বলি ভিজি বর্ষায়
মোহন জানালা থাকে
বাঁধানো ছবির মত।
সে ছবিতে প্রবেশের ছাড়পত্র নেই
আমন্ত্রণহীন অজানা অচেনা অতিথি আমি
অবিরাম কড়া নেড়ে হাতে কড়া পরে
চিৎকারে ভাঙ্গে গলা
সাড়া দেয় না কেউ।

আমার ছোট্ট ঘরে স্থান কম
বৃত্ত ভারি ছোট। তবু

আমন্ত্রণে অবারিত আমার দুয়ার
কিন্তু তবু প্রবেশে ইতস্তত অনেকের
একবার তিনবার ভাবাভাবি চলে
ইতি উতি সকলেই
এক্সিটের ঠিকানা খোঁজে।
কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র বৃত্তে আমার
যারা আসে তাদের দাঁড়াতে হয়
গায়ে গা লাগিয়ে
মনে মন জুড়ে।
আয়নার মত হয় স্বচ্ছ অন্তর
ভেতর বাহির কোন থাকে না সেখানে।

জায়গা কম, বৃত্ত ছোট
সে বৃত্তের বাইরে যাবার
এক্সিট বাস্তবিকই নেই।
একবার যে আসে
সে আর কখনও বাইরে যায় না

এ বৃত্তে বিশুদ্ধ বায়ু পরিশ্রুতি মন
প্রাচীর তুলতে হয়
বাঁচাতে সে বিশুদ্ধ বলয়।

যাচঞা

আজ ফুটুক না একটা ফুল
ট্রেনে ধর্ষিতা নারীর ভাঙা চুড়ি
ছেঁড়া চুল গণকবরে মুখ থুবড়ে পড়া
বিকৃত শব, বন্দীশালার দেয়ালে ভাইডার
রক্ত মাখা হাতের ছাপ–
শকুনীর ডানার তলায় বুদ্ধিজীবীর
গলিত লাশ। পূর্তিগন্ধ নারকীয় খেত। এত কিছুর দামেও কী
ঋদ্ধ হয়নি মাটি?

ফুটুক না একটা রক্ত গোলাপ
ফুটুক না একটা মহাপদ্ম
আত্মত্যাগ আর রক্তের পলিতে
সমৃদ্ধ জীবন ভূমিতে হোক না আজ
একটা অবিনাশী অর্কিডের জন্ম।
ডালপালা বিস্তার করুক না
একটা মহাজাতক
প্রতিহিংসা আর ঘৃণার আর্সেনিকে
সিক্ত মাটি উল্টেপাল্টে ফেলে
বেড়ে উঠুক না একটা শান্তির বটবৃক্ষ।

উদ্ভট শোভাযাত্রা আর
মহানায়কের কণ্ঠের কোলাহল
হোক না আজ স্মৃতির আকাশ
সে আকাশ জুড়ে ফুটুক না তারা
উঠুক না চাঁদ শরতের শুভ্র মেঘ
উড়ুক না শ্বেত কপোতের মত
আজ ফুটুক না একটা ফুল
একটা রক্ত গোলাপ
একটা মহাপদ্ম অবিনাশী অর্কিড
ভালোবাসার সুবাস ছড়িয়ে পড়ুক না
আজ চতুর্দিকে।
হৃদয়ের বন্যাধারা ধুয়ে দিক না
রক্ত আর পূর্তিগন্ধের দাগ।

আজ ফুটুক না একটা ফুল
রক্ত গোলাপ মহাপদ্ম অর্কিড।

১১. দেলোয়ার হোসেন মঞ্জু

গহনা ভূমি

বৃষ্টিতে জল ভিজেছিল আর তোমাকে কালীগঞ্জ বাজার পৌঁছে দিয়েছিল একগাছা পাল-তোলা নদী। অঙ্কুরোদগমের অদম্য বাসনা নিয়ে তোমাকে স্পর্শ করে বৃষ্টির বিচি, স্তনাগ্রে লুটিয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা তীর, তীরন্দাজ। সেই থেকে হয়তো বা তোমার জলযাত্রা শুরু হয়েছিল। স্পষ্ট মনে পড়ে, ঐ দিন বক্ষব্যাপী লাফিয়ে উঠেছিল গোরস্তানের সাদা সাদা বেতবুটা, হরপ্পা নদী। তুমি নগ্ন হয়েছিলে, মেঘের চাদরে হয়তো তুমি লজ্জা নিবারণ করেছিলে।

সেই লাবণ্য-পুরাণ
আমি জানি, আদমের বহুপ্রস্থ আদিম তুমি। চরণ স্পর্শ করে যায় মেঘ আর কালিদাস। নখরে বাতাস কাটলে অতঃপর তুমি হাত ভিজালে পোয়াতি জলে। হলুদিয়া ঝিঙেফুলেরা দেখল, তোমার দুই হাতে হলহল করছে জয়তুনের বাগান আর গন্ধমের গরম।

ঐ উঠোনে তুমি দীর্ঘ দাঁড়িয়েছিলে।
বুনিয়াদি ভিটার সৌরভ
ঐ উঠোনে তুমি দীর্ঘ দাঁড়িয়েছিলে। তোমায় ভালবেসে ঐ মেঘমালা কোনো এক ধর্মদা গ্রামে নেমে এসেছিল আর নিরন্তর ভিজিয়েছিল তুলসীপত্র ও প্রার্থনার পিঁড়ি।

মেঘে মেঘে ঘাট-পার গলে যায়। যখন একে একে সবগুলো শান বাঁধানো সিঁড়ি খসে পড়ে তুমি মুখ ফুটে প্রস্ফুটন কর– ইস!

আবার সোনার কইগুলো জল ছেড়ে যখন ডাঙায় উঠে আসে, কানকো দিয়ে চরণে চিমটি কেটে যায়, ঈষৎ লজ্জিত তুমি–মুখ ফুটে প্রস্ফুটন কর–ইস!
বহু বর্ষ পরে, কবুতর ডানা আর খুদের খোয়াবে নিদ্রা ভেঙে যায়। মনে পড়ে তোমার উঠান-ভরা রোদ আর শিয়ালের বিয়া... ঝরে-পড়া চুরুক আমটির কথা, সোনালী গোদার স্বাদ আজও তোমার স্নায়ু মূলে লেগে আছে। ... আর ঐ যে হরীতকী বন, বরই, কামরাঙা–বাগান হতে কুচভরে শুধুই কি বেদনা আর বৃষ্টি কুড়িয়েছিলে! আজও তো রাত জাগো! কুদাল ভরে এলাচির শহর খুঁড়ে আন। আজও ভরা যৌবন নিয়ে তোমার বন্দরে ভিড়ে বক্ষ-খোলা
এক লাল সওয়ারী নাও।

২.

ঐ ভূপৃষ্ঠের কথা আমার মনে নেই। মনে পড়ে, বেলোরুশিয়ার বৃষ্টিতে একদা একজোড়া ফর্সা ঊরু ভিজেছিল। আমি নিদ্রিত ছিলাম। সিথান ভরা দীর্ঘ ঘুমের স্মৃতি ব্যতিরেকে আমার কোনো বৃষ্টিভেজা করমচা বৃক্ষ কিংবা আমের মুকুল ছিল না। তুমি বললে–

কালো নদীটি পাড়ি দিয়ে দিরারাই গ্রামে সূর্য উঠিয়াছে। পিতার কবরে লকলক করে হেইছা ঘাস ও পল্লী বিদ্যুৎ। বাড়ির পেছনে, পইরদাদার কবর হতে রমণীরা শুকনা পুরল পেড়ে আনে। অতঃপর নরম ছোলায় তারা পায়ের পাতা মাঞ্জন করে। পৃথিবীতে পুনর্বার বৃষ্টি নামে। বৃষ্টিতে ফর্সা ঊরু আর পিতার কবর ভিজে যায়।

ভরা আসমান নিচে নেমে আসে। আমার স্মৃতিতে লাল লাল তরকারির বাগানসহ মৌ মৌ করে তৃষ্ণার তুকার। কাটা খঞ্জরের কথা মনে পড়ে– সমূহ শিকারের স্মৃতি... তুষের আগুনে মনে পড়ে যায়– মেঘনা নদীর পুরাতন মাঝিদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আমিও তো ছিলাম।
আমি বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম...

সাপ ও সূর্যমুখী

[উৎসর্গ : সখিনা আফ্রোদিতি]

০১.
মৃত্যুন্মুখ
আমি তো শ্রাবণ
শিশুপুত্র তোমার
চুম্বন করো
আমি তো উদগ্র ঈশ্বর তোমার।

০২.
জল মঙ্গলম...
সখী
জন্মভর জেগে রই তোমার সিথানে...
চক্ষুদ্বয়ে ঘুমিয়েছো বায়ু মঙ্গলম আমার
প্রাণ মঙ্গলম আমার

প্রাণবন্ধু মঙ্গলম।

জ্বর আর যৌবন ভাসিয়েছি
বংশনদী তীরে
সখী হে, কোথায় দাঁড়াবো বল!
দাঁড়িয়েছি তোমার চরণে
দেহক্লান্ত গাছের ছায়া।

০৩.
তীরবিদ্ধ বালিহাঁস হায়!
মরুখণ্ডে চেয়েছিল জলের শুশ্রূষা।

স্থলের সৌরভ
আর কি আসি রে ফিরে
নদীয়াবাসীরে...

০৪.
সোনার ময়না রজনীতে
ডালে বসিয়াছে প্রাচীন পক্ষীকুল।
ঐপারে
মৃত নক্ষত্রে ভাসে সাপ ও সূর্যমুখী।

চরণে ঝর্ণা ঝরিয়ে
এ কোন পন্থে হেঁটে যাও
রাজবদন হায়!
কোন জলে ভেসে যায় লক্ষণসিঁড়ি নদী।

০৫.
বাহিরে বাতাস টলমল
মেঘ-মন্দ্র-ডানায় কার নামে ভেসে ওঠো
ডাহুকের গ্রাম!

দাউ দাও কাঁঠালের বিচি পুড়ে যায়
হলদে পাতায়
পিতা ও পুত্রের মৃত চুম্বন ওড়ে।

বাহিরে মানুষ
ষড়ঋতু।

০৬.
শীতার্ত দিনে
হেসে ওঠো কুকুর ও হাস্‌নাহেনা
বিষুব অঞ্চলে
মোম বৃক্ষের ছায়া পড়ে আছে।

...গৃহে ফিরব না আর
প্রেমিক, প্রজাতন্ত্রী চিরকাল
দাঁড়িয়েছি সমুদ্রতীরে
লোমশূন্য বৃক্ষের স্মৃতি।

০৭.
এতো জল
সমুদ্র শাসন করে রক্ষ-চক্ষু-চাঁদ।

সারারাত
পীতবর্ণ ছায়া মাড়িয়েছি
ফিরে যেতে চাই কোনো এক পক্ষী-ভূমে
ভাণুগাছ গ্রাম হায়!
গৃহপথে বত্রিশ দাঁতের কাটা পড়ে আছে।

০৮.
বিশুদ্ধ আঙ্গুর
পেড়ে আনি বিষ দাঁতে
খাতিমুন কবি--কালেশ্বর হে
মরণ এলো না আমার
তোমাকে ঘিরে।

১২. নাজনীন সীমন

সহ-মরণের সময়

সঘন দুঃখগুলো হিড়হিড় টেনে নেয়
অনায়াসে চিন্তার চিত্রল চন্দন চিতায়
টানটান শুয়ে পড়ি, অথবা তখনো
দাঁড়িয়ে, অপেক্ষা কখন আসবে কাঙ্ক্ষিত
পুরুষ, সুখে ও অসুখে যে চাদর
মেলিনি কখনো, নিভাঁজ, নিপাট
তার তলে আজ ঠিকঠাক উন্মোচিত হবে
সহ মরণের দীঘল পরব, ফোঁটা
ফোঁটা নোনাজল, ঘিয়ের সুবাস
ছড়াবে পোড়া এই শরীর শিকল থেকে
হাঁড়ি ভরা যদিও অনুক্ত কষ্টগুলো
তখনো থাকবে অন্ধকার কোনো গুহার
ভেতর নিশ্চিত বাদুড়ের মতো ঝুলে...

সত্য

তেতলা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে একদিন ভাবলাম
ঠিকঠিক ঝাঁপ দেবো, ত্বরণ কি মন্দন
জানিনা অতসব, নিউটন-সূত্র মনে আছে
নির্ভুল, পদার্থ রসায়ন কখনই টানেনি
গণিতে বরাবর ভীষণ দুর্বল। ভূগোল, ইতিহাস
নিতান্তই অকাট্য, ধর্মের গলিতে হাজারটা
দ্বন্দ্ব। সংঘাত প্রতিঘাতে পালিমাটি বোধ
আমার কর্কশ হতে থাকে, সামনে পেছনে
কপট অন্ধকার হাতছানি দিয়ে ডাকে
অজানা, গভীরে, ভণ্ড সভ্যতার
মুখোশে টান দিয়ে হিড়হিড় খুলে ফেলি
নিকষ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে মনে হয়
আমার এখানে একবারে কিছু নেই
পরিচিত মুখগুলো

বেলুনের মতো করে বহুদূরে উড়ে যায়
সবকিছু ঝেড়ে ফেলে যখনই ঝাঁপ দেবো
হাত ধরে টানলেন,
ঠাণ্ডা চোখ মেলে ধীরে ধীরে বললেন,
জীবন এখানে, ওপারে কিছু নেই, সত্যি কিছু নেই

কবির কলম থেকে

কবির কলম থেকে ঝরে পড়া
স্তবক আজকাল আমাকে বিবশ করে।
কবিতার ঘরে পুরনো পলেস্তারার মতো
খসে পড়ে শব্দের খড়খড়ি।
উনুনে ফোটা চায়ের জলের মতন
দপদপ মাথার শিরা
রক্তকণিকার হুল্লোড় আমাকে অশান্ত করে
তবুও টিকটিকি যেমন দেয়াল আঁকড়ে থাকে
শব্দবন্ধের প্রতি তেমনি দুর্বার আকর্ষণে
আমিও হেঁটে যাই অনেক দূরে
সুস্থ কবিতার সন্ধানে।

বন্যার পানি ও যৌন বিলিয়ন

জুতো মোজা পরা দিন আবারও
এগিয়ে আসে পায়ে পায়ে
নিয়ম করেই সরে যার বন্যার ঘোলাটে পানি
আলফা, বিটা, গামার সম্মিলনে
তীব্র ঝাঁক ছড়ায় মধ্যদুপুর।

রাষ্ট্রপতির কামুকতায় ভেসে যায়
বিলিয়ন ডলার যখন; পৃথিবীর অন্যপারে
ঈশ্বর খেলা করেন ডুবন্ত মানুষ নিয়ে
অশুদ্ধ বেহায়া কালো রক্তে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারি না–
কবি, তুমি কি পারো ভাঙতে এ দেয়াল।

১৩. নাসরীন খান রুমা

প্রথম শহর জেরিকো'র ধ্বংসস্তুপ থেকে

অঙ্গিকারের বোঝা নিয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রাচীন হলো আমাদের সংসার।
দুঃখ-বেদনায় গোপন অন্ধকার বিবর্ণতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে
আমরা পরস্পর দাঁড়িয়ে থাকি পৃথিবীর প্রথম শহর জেরিকো'র ধ্বংসস্তুপে
যে স্তুপের বালুরেখায় হেঁটেছিল ক্রুসবিদ্ধ মানুষেরা, আমারও জন্মের বহুআগে
আমি তাদের পদরেখায় হেঁটে যাই তির্‌তির্‌ আবেগে, গোপন সত্য জানি-
সংসার নয়, সংসারের বৈধ রথে হত্যা করি স্বপ্নের আঙুরলতা
পৃথিবীর সংসার বেঁচে আছে কাচের জারের ভেতর
দমধরা নিঃশ্বাস পাঁক খায়, বেঁচে থাকে এ-জীবন বেহুলার মন্ত্রে,
বৃষ্টিভেজা শরীর বৃষ্টি ছুঁয়ে ছুঁয়ে পোড়াদহ শ্মশানের বুক হাতরায়।
ঘুণপোকা খেয়ে ফেলে শব্দপ্রাণদেহ,
তবুও ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুকণায় জ্বালি মঙ্গলসন্ধ্যা
নীল অস্থিরতায় চন্দ্রগ্রহণ ভগ্নাংশ হয়ে জাগে দ্বৈরথ-প্রহরে।
বেঁচে আছি, বোহিমিয়ান কুয়াশা লুকিয়ে রাখে আমাদের মুখ
জীবন পাল্টায়, প্রতিদিনের আকাশ থাকে আমাদের দৃষ্টির সীমায়
অথচ আপনঘর পড়ে থাকে আত্মঘাতী দুঃখের মঞ্চে।
স্বপ্নের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় হাজারো নক্ষত্ররাশি
ভেঙে যেতে থাকে বিশ্বাসের যৌথ বসতগুলো,
পৃথিবীবৃক্ষ ছায়ায় মায়া বাড়ে, শুধু আশ্রয় মেলে না...

দুঃখ পাটাতন

একবেলা কেটে যায় প্রতীক্ষায়
প্রতীক্ষার ডালে বসে ছোঁ মারা চিল
দুইবেলা দুঃখে থাকে প্রচীন তিমি
সারা পথ জুড়ে হাঁটে কষ্ট পাহাড়
পাহাড় কেটে কেটে ছুঁতে চাই আকাশ সজল
আকাশ ভাঙা ঝড়, জলে জল একাকার
মৃত্তিকা পেতে চায় ঘাস রঙ সবুজ
সমুদ্রে পোঁতা থাকে অদৃষ্ট কবজ

কাজল চোখে ডোবে সুখের আঁচল
আঙ্গিনায় উড়ে আসে অচেনা প্রহর
হিজলের কষে থাকে বিষকাঁটা ঘর
বুকের শব্দে কাঁপে দুঃখ পাটাতন।

টের পাই অশোক বনের নিঃস্তব্ধতা

ফাল্গুনের আলকাপে লুপ্ত বিকেলের আয়োজন ।
দেহজুড়ে বাংলাদেশ, সবিস্তারে বাংলাদেশ।

খন্ডিত প্রস্তর প্রবাসে
টের পাই অশোক বনের নিঃস্তব্ধতা
বিষন্নতার মাঠে নীল ফড়িং-এর বিনম্র হাতছানি
অন্তর পোড়ায় রেলপথের বিস্তার
চোখের জলে চন্দ্রমল্লিকা, অচেনা এই মায়াবনে
আমি বড় একা –
বিস্মিত কাঁঠালচাঁপার মৌমাতাল গন্ধ
বুকের ভেতর কাঁপন ধরিয়ে দেয়,
গভীর কান্নার স্রোতে অন্টারিওর বরফ উষ্ণতর হতে থাকে,
গড়ে তোলে জমাট ব্যথার জুমচাষ
অবুঝ মনে হা-পিত্যেসের বসতবাড়ি
স্মৃতির সাবওয়েতে থোকা থোকা জোনাকপোকার
একান্ত লুকোচুরি ...।
তবুও পোড়া চোখে নক্ষত্র, চাতক পাখি হয়ে
খুঁজে ফিরে তোমাকে স্বস্তিময় আশ্রয়ের প্রত্যাশায়
পুত্রকন্যাসম বাংলাদেশ।

তোলপাড়

অগ্নিস্রোতে জল প্রয়োজন
ভীষণ. . . ভীষণ. . .
আগুনে পোড়ে মন

মেঘ মন্ত্রণা জানায় সজল প্রার্থনা
ঝড় জলে তোলপাড় জীবন ।

প্রত্যয়ের জারে ভরা তপ্ত বৃষ্টিকণা
শরীরের প্রান্ত তোলে আর্দ্র রক্তফণা
চন্দ্রালোকের চরে গড়ি তীব্র চাষাবাদ
চৌকাঠ খিল আঁটা, অচ্ছুত ঘৃণার দাঁত
কালরাত্রির গন্ধবীজ উড়ে বাতাসে
মন্ত্রকোপে নিভে আলো
সাতটি তারার দেশে –
ডানা ভাঙা বিবর পক্ষী যাবে কদ্দুর,
রক্ত ফসল ভাসে দূর সমুদ্দুর . . . ।

১৪. নাহার মনিকা

গৃহস্থালী- ৩

অবিশদ খেয়ালের বুক জুড়ে
বরফে মাখানো নই শাড়ি
ফ্যাকাসে করেছে রং, শূন্যতা
রাত্রির সাথে যার আড়ি।

দেয়ালে সাজানো আছে সুখ
জানলার শার্সিতে দম্ভ
দুঠোঁটের ভাঁজে ভাঁজে উন্মুখ
ক্রোধান্ধ হাসি উল্লম্ব।

তোমাকেও ডেকেছে এ উৎসব
একা এসো পা মেপে মেপে
জীবন্ত দগ্ধে ও লুট সব
বুঝিয়ে দিয়েছে সংক্ষেপে।

ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়েছে স্তাবক
যদিও যুদ্ধ ফেরা ক্লান্ত
গা বুক অন্তরাত্না জুড়ালেও
কমলো না ভেতরের ভানতো।

গৃহস্থালী–৪

মনোমালিন্যের দাগ লেগে থাকে কাপড়চোপড়ে
চুপসানো চাঁদের শাসনে ঘরবাড়ি উচ্ছেদ হয়ে
বাস করি বিবশ জীবন। ঘা খাই, ঘায়ে নুনের
ছিটা দিয়ে উঠে যায় অখাওয়া ভাতের থালা।
বাসক পাতার রস নিংড়ানো দেহে পোড়া কয়লা
গুঁজে দেয় একখণ্ড চোখা মাখা কথা।

বিবস্ত্র সাজতে থাকি যুদ্ধের সাজ। আমার-ই
পরোয়া নাকি, জীবনের বাজি ভুলবার?
পচন অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কবে মাথা তোলে
আলোভরা উঠোনের কোনো। অকস্মাৎ কোপ
খায় ফণা তোলা অধিকারবোধ। দাঁড়িয়ে
চাঁদের গর্তে মাথা ঠেকে, ধাক্কা খায়
ফুড়ফুড়ে মগজের কোষ।
দাও তবে ব্যথার, বাথান, কান্না দাও
মাখাই শরীরে। গোড়ালি নিয়ে
আমার সঙ্গ নাও। মালিন্য মাখিয়ে
নিই পুরোদস্তর আঙুলে আঙুলে।

বরং বাতাসকে বলি

বরং বাতাসকে বলি জেগে থাকো
দুঃখী দুপুরে রাজারা ঘুমায়
তুমি ঘুমিও না
তুমুল বয়ে যাও
দীর্ঘশ্বাসের সাথে তলপেট যেন
কথা কয়ে ওঠে
মুখের কথারা যেহেতু হারায়
হারায় নদীতে
শত সূর্যের কৃপণ আকাশে।

বরং বাতাসকে বলি, ঘিরে রাখো নদী
আড়িয়াল খাঁ
মানুষের কথা ডুবে যাবে ভয়ে
ঘিরে রাখো টাইগ্রিস
চোখ মুছে একফোঁটা ঘুম
পাড়িয়ে দাও চারণের বন্ধুকে।
গোড়ালির ভারে হেঁটে আসা পথে
ভিটেমাটি হীন ভিটেয় দোলাও
শান্তি-শান্তি

ফিসফিস শব্দের বাহারি...
বরং বাতাসকে বলি,
আর কেউ নেই
তুমি সঙ্গে থাকো, বিশুদ্ধ থাকো,
অন্তত সবাই শ্বাস নিতে চাই

মাঠ

মাঠ সেকি মাঠ!
ইষদুষ্ণ স্থির
আমরা দাঁড়িয়ে আছি মাঠের কিনারে
অদৃষ্ট পন্থী
সামনে জমাট ছায়া
আগ্রাসী মাঠের শরীর।
প্রার্থনারত আমরা
পৃথিবীর সর্বশেষ অগ্নুৎপাত শেষে
প্রতীক্ষারত
কেউ বুঝি উঠে আসবে
মাঠের পাঁজর ঘেরা ধ্বংসস্তূপ
ফুড়ে
আমাদের গুনে গুনে প্রবেশের
পথ করে দেবে।
আমরা ভয়ে কাঁপি
সময়র রোষ ভেবে কম্পিত
দাঁড়িয়ে থাকি মাঠের কিনারে।
একটু সবুজ খুঁজি,
সবুজ আর সোনালীর তালমাত্রা খুঁজি
লুপ্তপ্রায় জলমগ্ন ধূসরতা খুঁজি
ধূসরের কিছুটা দূরত্বে
সোনালীর অমাপা দূরত্বে
সবুজের যোজন দূরত্বে
বিস্মিত আর ইষৎ চকিত
আমাদের পলক পড়ে না।

সময়ের প্রতিনিধি ইতোমধ্যে
না এসে পৌঁছালে
আমাদের পরস্পর গণনা পিছিয়ে যাবে।
মাঠের কিনারা গিয়ে মিশে যাবে
উর্ধ্বশ্বাসে অন্তহীন আরেক কিনারে।

মাঠ সেকি মাঠ।
আমরা দাঁড়িয়ে আছি মাঠের কিনারে
কজন দাঁড়িয়ে আছি
কদিন প্রতীক্ষারত, কিছুই জানি না।
মাঠের জমাট বাঁধা বুকের ছায়ার গভীর থেকে
সময়ের উঠে আসা অনিশ্চিত নয়,
এইটুকু জানি।
অন্তর্জালে তার ছুঁয়ে সুর দরকার,
আমরা কথা শুরু করি
ধীরলয়ে, তারপর ক্রমাগত কাব্যভাষায়
বাতাসের বাহারি শাড়িতে গাঁথা।
অনাগত সুতোর দোলায়
দাঁত দিয়ে খুলে রেখে দিই
আমাদের হাতের আঙুলে
বেজে যায় অধৈর্যের আদুল এস্রাজ।

মাঠের ছায়ার মধ্যে
কাঁপন শুরু হয়
জমাট কুচকানো পায়ে
ছায়ারা নৃত্য করে
আমরা বুঝতে পারি, কেউ বুঝি
আসবার সময় হয়েছে।
আমাদের লোভ তীব্র হয়
গণিত হতে, আঙুলের খাঁজে খাঁজে
নামাঙ্কিত হতে, উচাটন হই।
পোশাকের স্বচ্ছতায় ততক্ষণে
দৃশ্যমান সবুজ নিকটে
সোনালী জড়িয়ে আছে
আমাদের পা,

ধূসরেরা মুহূর্তে উধাও।
আমরা নিজের কথা ভাবি
মেরুদণ্ডে বনে দিই–

এক একটি কাল্পনিক সংখ্যার সারি।
আমরা জানতে চাই
আমরা ক'জন?
ক'দিন দাঁড়িয়ে আছি?
কেন এই হু হু করা
মাঠের কিনারে?

১৫. ফকির ইলিয়াস

অন্ধ অঙ্গীকারগুলো

বুকে বিপন্ন বারুদ। চোখে বাউলবেলা। পশ্চিমে প্রভাত জেনে
আমাদের রূপালী পিছুটান... অতীতে তবে নিশ্চয়ই থেকে যায়
হিরন্ময় স্বপ্নের বাগান। জলের জোয়াল টেনে যে সমুদ্র খুঁজে
সহচর, তারও গন্তব্য সেই প্রেমঘোর–দুঃখধ্বনি সুরম্য বিবর।

বিবর বদ্বীপে বাড়া অন্ধ অঙ্গীকারগুলো গড়েছে
যে ঘ্রাণের খামার, আমরা তারই অন্তর্গত আলো।
রহস্য উৎসবে তাই ব্যস্ত ভোর ডেকে বলে, বাধিত প্রেমিক জাগো স্মরণে আবার।

সীমানার শস্যমেরুতে এর আগে যারা করেছিল বসন্তচর্চা এবং যারা কবি
পিছুটানে স্পর্শিত সূর্যের মতো কংকাল খুঁজে, তারাও কি হয়ে যাবে প্রবাহের ছবি।

মেঘবিধান

অশান্ত আকাশ ঢেকে দিতে রচনা করি যে মেঘবিধান, তারও সংস্কারের
দাবি উঠবে একদিন। কিংবা যে জলবিধান দিয়ে করি সমুদ্রের পরিচর্যা,
তাও শুদ্ধ বরফতন্ত্রের অধ্যাদেশে হয়ে যাবে সংশোধিত। শোধন, গোটা
সৃষ্টি প্রণালীকেই করে দেবে চলমান সূর্যচারু। বদলাবার আনন্দে এভাবেই
প্রেমভান্ধে মাতাল হবে তাবৎ প্রেমিক-প্রেমিকা।
আর যারা ভাষাচিত্রী, তারা রঙভাষা রপ্ত করে
শিখে নেবে সবুজ-হলুদ-নীলের ভবিষ্যত পরিকল্পনা। জীবন ঋতুমুখী।
আয়ুর আকাশ সেই ঋতুবিধান মেনেই যখন কালচক্রে আবর্তিত হয়
শিকড় সমৃদ্ধ মেঘ, তাপ পেতে পেতে খুঁজে ফের বর্ষা-নিলয়।

সঞ্চিত নৈঋতগ্রহে

মাটির সাথেই মনের সখ্যতার সম্ভাবনা বেশি, পাতার সাথে
পদ্যের, আর পূর্ণিমা?– সে তো সীমার সমুদ্রে ভাসা
মুখরিত মৌল কোলাহল।

জল জানে জন্মের আদিগন্ত গাঁথা। যে বুনন
ধারণ করে আলোদের ক্ষণ আর বর্ষণ, তুমি সেই
ভাসমান বর্ষণ হয়েই থেকো যাও...
তোমাদের সঞ্চিত নৈঋতগ্রহে, একদিন
শিশির হয়েই ঝরে পড়তে দেখবে অগণিত সমুদ্র সম্মতি,
ক্ষতি নেই,
আমি না হয় চিরকালই থেকে যাবো
অভিন্ন এক পর্যটক পথ।

ধাবমান নেশার বুনন

আঁচড়বিন্দু এবং অশ্রুঐক্যর মতোই ধাবমান থেকে যাচ্ছে নেশার বুনন।
ঘুমপ্রিয় গ্রহের গহীনে জেগেছিল যে কামশিল্প, জন্মভাষায় তা
হয়ে যাচ্ছে, একক দৃষ্টিসাক্ষী। অজ্ঞাত আলোর সন্ধানে এর আগে
ছুটেছিল যারা, তারাও ফিরছে গৃহে– ছাদহীন আশ্রয় আয়েশে।
আকাশ সরে গেলে দিগম্বর মহান মৃত্তিকা
যেভাবে খুঁজে নেবে উষ্ণ-উপশম, তার তালিকা
মিলিয়ে মানুষও যদি স্থাপন করে মাটি সভ্যতায়
গভীর বিশ্বাস, তবেই হয়তো বা সংযমী শ্রাবণের
মতো...
স্বপ্নবীজ বুকে নিয়ে প্রজন্ম পাখিরা আঁকবে শান্তির প্রিয় ছায়ালিপি।

বিরহের ব্রজকথা

বিজন বপন সেরে যতোদূর যাই
কার হাত আগুনের ছায়া হয়ে সাথে
পার্বতী-পুরান মন বাজায় সানাই
বিরহের ব্রজকথা নীল মালা গাঁথে।

গ্রহণে পুবের আলো যদি আসে কাছে
তবে তো জড়িয়ে ধরে নকশা সমান
আঁকাআঁকি রাতগুলো স্থির হয়ে আছে
সন্ধ্যাগিরিতে ফিরে কালের আদান।

আর যারা এই পথে খুঁজে বিবর্তন
তাদের গন্তব্য থাকে অনাবাদী যুগ
উত্থান সমুদ্র চায় গ্রহের পতন
কবিই অনন্ত– কবি, কবিতার ভোগ।

বিরহ বপনসূত্র মিলনের ভাঁজ
শব্দের শক্তিই তাই গ্রহের আওয়াজ।

পথের ভেতরে আছে ভাটিময় পথ

পথের ভেতরে আছে ভাটিময় পথ। শত নক্ষত্রের জল।
ফলময় কালের অনুজ। খোঁজ নিতে যাই পাথরের পাতার
কাছে। আছে ঘিরে সহস্র বছর, যে আকাশ মানুষের
ছায়া।
কায়াটুকু প্রলম্বিত বাহু যার রশ্মির
রেখা। দেখা পেলেই ডেকে নেয় কাছে– আদরে।
চাদরে ঢেকে রাখে বুকের উত্তর। সত্তর বছর ধরে
যে দশক পরিক্রমা। সীমার অজান্তে আঁকে আরেকটি
অপেক্ষার সীমা।

আমরা আজ চিহ্ন কুড়াবো না

রবি থেকে অবকাশ যাপন শেখে আমরা যাত্রা করি
বুধ গ্রহে। মাঝে পড়ে রয় মঙ্গল। এটি অন্য কারো জন্য
থাক। আমরা আজ চিহ্ন কুড়াবো না। স্পেস সভ্যতার
এই পার্শ্বপথ
অস্পর্শিত থেকে যাক...
যেমন নিয়ামক থেকে যায়
কোনো কোনো মানুষের হৃদয়। উৎক্ষেপণ আগ্রহে পাঁজরের
সুবিশাল স্থাপনা। জীব এবং জীবনের আয়ু চিত্রনে।
বৃষ্টির বশ্যতা যেমন লুকোচুরি খায়, ঘন বনায়নে।

ঘ্রাণ ও ঘনত্ব

উড়ে যাচ্ছে রোদসমুদ্রের প্রাণ। ঘ্রাণ ও ঘনত্ব মেপে নির্ণিত হচ্ছে সবুজ জোসনা। জানা অজানা জীবনের পদাবলী ছুঁয়ে পরিশুদ্ধ হবার কথা ছিল আমাদের। ঢের দেরি হয়েছে জানি, কিন্তু এভাবে পরাজয় কালের নিয়ামক নয়।
ভয় কখনোই হরণ করতে পারে না মানুষের উত্তর-সাধনা। ডানা মেলে সে কথাই বলে যায় পরিযায়ী পাখি। উঁকি দেয়া রোদ যেভাবে শিখেছে মনপুঁথির ভাষা। ভালোবাসার ও বসন্তের ঘ্রাণে পরাগায়ণে। ধীবর রোদ ডুবে বোধের উজানে।

কালের কৃষক

আবার নিবন্ধিত হই মনোজ রূপান্তরে। ঘরে ফেলার তাড়া ছিল বলে সমূহ অর্জন বন্ধক রাখি রাতের ঠিকানায়। হায় চৈতন্য, হায়
গৃহপ্রবেশ! বেশ তো ছিলাম পূর্ব জনমেই। সেই অন্ধমুগ্ধতা থেকে তবে কেন চেয়েছিলাম ক্ষেপন-উত্থান?
ধান ও দরদ-দুটোই পুষ্ট করে কৃষক সাম্রাজ্য। ত্যাজ্য রাতের গহীনে ভূমিপুত্র-ভূমিকন্যাদের নাম লিখে লিখে। শিখে নেয়া হালের কৌশলকে শনাক্ত করে কালের কৃষক। ত্বক ও তাপের ক্যানভাসে। যে জীবন শিল্প হয়ে বার বার আসে।

১৬. ফারহানা ইলিয়াস তুলি

বিভক্তির ভাষা

বিভক্তির ভাষা বুঝে না দুপুরের সূর্য অথচ
সেই সূর্যকে নিয়ে যারা খেলা করে, নদীর আত্মকথা
শুনে যাদের বীক্ষণ পূর্ণ হয়–শুধু তারাই জানে
অবিভক্ত আকাশের মতো এই বিশাল ভূখণ্ডও একদিন
বাঁকহীন সমগ্র ছিল। গ্রহালোকের একক প্রতীক।

আর নিয়ন্ত্রণপ্রিয় মানুষেরা বার বার খুঁজেছিলো
জন্মের সহজ অন্তমিল, গুহাপথে ফিরে যাবার
গতি ও পদ্ধতি। তারপর বিকল্প পূর্ণিমা কলায়
হারিয়ে দিয়েছিলো নিজেদের সত্তা, কুয়াশার সন্ধ্যাহাতে
ভূগোল বিষয়ক দৃশ্যগুলো ধারণ করে বুকে ও ভূমিতে।

অনাদি আড়াল

নির্ভুল না হলেও অন্তত নিয়মিত বৃষ্টিপাঠের
পাঠশালায় হাজিরা দিই। দৃশ্যান্তরী দ্বীপগুলো
পেরিয়ে আয়ত্ত করি জোসনার প্রতিচিহ্ন, অনাদি আড়াল।

ভ্রূণের উষ্ণতা জানে জীবনের প্রথম পরমাণু কখন
অতিক্রম করে রক্তের দেয়াল, প্রকৃত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে
নির্মাণ সন্ধিতে বন্দী প্রেম খুঁজে তরঙ্গের অধিক সান্নিধ্য।

কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ প্রযোজিত কালের বিপরীতে
এঁকে যায় ভিন্ন সকাল, মেঘে ভাসা বকুলের পরাগচিত্র
দর্শক সারিতে বসে কেউ খুঁজে বিনিদ্র রাতের প্রচ্ছায়া।

বৃষ্টিপাঠের পাঠশালায় হাজিরা দিতে দিতে আমি কি তবে
অর্জন করি কারো উত্তরাধিকার? প্রভু প্রকরণে
তবে কি আলোর আয়ুই প্রেমের সফল উদ্ধার!

বপনের আলো হাতে

বপনের আলো হাতে বসে থাকি, এই ভোর বয়ে
যাওয়ার আগে লালসূর্য রেখে যাক তার পরিপুষ্ট
বীজ, ভাদ্রের আমিষে-খনিজে
আরেকবার তর্জনী তুলে আমাদের
প্রতিবেশী চাঁদ বলুক বনজ সাম্য সংবাদ।

একদিন সবুজ সমুদ্র ভ্রমণে গিয়েছিলাম আমরা
যে ক'জন, আজ তারাও হারিয়েছে নিখোঁজ নিবাসে
আদিবাসী উঠোনের আঙিনায়
জেগে থাকা ছায়া
জ্বলে উঠে, কাছে যাই–
ভোর ভেঙে প্রজন্ম গোলাপে হারাই।

অন্বেষার ঋতুমালা

আসলে আমাদের নদীগুলোই প্রচণ্ড মেধাবী
পলির সহজ পরাগায়ণে ভাসিয়ে নেয়
প্রাচীন দুঃখ-সীমানা, তারপর সুবর্ণ উৎসবে গাঁথে
ঋতুমালা,
আষাঢ়ের অধিক গভীরে।

নদীমাতৃক গ্রহচিহ্নগুলো ডুবে থাকে নিজ
সম্প্রদায়ভুক্ত চাঁদোয়া-মায়ায়,
মানুষ ও নদী–উভয়েই
আসলে সম্প্রদায়হীন
সমান্তরাল মুক্তির অন্বেষায় ঘরে ফিরে
ধারাবাহিক স্বপ্নে হয়ে একক বিলীন।

পূর্ণ এই জলবিঘা জমি

সূর্যের উত্তরে জন্ম নিয়েছে যে শস্য একর
একদিন সেই নক্ষত্রেই ছড়াবো স্বপ্নের ঋতুরেখা

একদিন সক্রেটিসও হাঁটতেন যে নির্মাণ বিশ্বাসে
একদিন রবীন্দ্রনাথ
যে সংলগ্ন সৌন্দর্যে গাইতেন গান।

পূর্ণ এই জলবিঘা জমি তারপর রেখে যাবো
ভরসার ভিন্ন প্রান্তরে,
পাথর হয়ে জমে থাকবে দিন
ফুল হয়ে ফুটে থাকবে রাত্রি
এবং আমাদের রেখে যাওয়া শব্দায়নে
কর্ষিত আনন্দের মাঠ।

পাতা ও পৃষ্ঠাসংখ্যা

উল্টাতে উল্টাতে অঙ্গীকারগুলোর দেখা পেয়ে যাই
সুবর্ণ শৈশব নিয়ে তারা জেগে আছে
শুশ্রূষাহীন, অনিবার্য অগ্নিকোণে
পলায়নরত প্রাণেরা যেমন পেছনে তাকায়।

চোখের পাতায় প্রেমের উষ্ণতা থাকে
রমন বাসনা নিয়ে প্রত্ন-প্রদীপ
জ্বলে ও জ্বালায়
জীবনের পৃষ্ঠাসংখ্যা।
আয়ু বাড়ে, কমে জ্যোতি
আয়ু কমে, বাড়ে ব্যঞ্জনার পালাবদল
সমগ্র শিল্পসত্তাই তখন হয়ে উঠে
মানুষের পঠিত পঞ্জিকা।

১৭. ফেরদৌস নাহার

অন্ধকার ও যুদ্ধের বাজার

আমার বাংলাদেশ যখন জেগে থাকে তখন কী করে ঘুমাই আমি?
আর তাই কতদিন হলো ঘুম নেই আমার,
সারারাত অন্তর্জালে ঘুরে বেড়াই, চোখের জলে নিঃশব্দ-একাকার
বাংলাদেশ শুধু তোমারই জন্যে।
খুব কি সস্তা শোনাল এই সত্য বেদন? শোনাক,
করার কিছু নেই এতো শুধু কথা নয়- আত্মার আর্তনাদ,
ঘরে ঢোকার চাবি খুঁজে না পাওয়া অস্থিরতা,
অবসন্ন আঁধারে দেখা একনিষ্ঠ দগ্ধ মরিচিকা
ছুটে যাই অসুস্থ অন্ধকার ও অকৃত্তিম যুদ্ধের বাজারে।
যখন আমার দু'চোখ রাত্রি দেখে দেখে ক্লান্ত
জানি তখনও জেগে আছো তুমি মাতাল হাওয়ার আয়োজনে
ও-স্বদেশ আমিও জেগে আছি তোমারই সাথে
একই গোলার্ধের উল্টো দিকে।

অ্যাবরিজিন্যাল নিয়তি

চারিদিকে এই কোলাহল, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে নাম ধরে কারো ডাক শুনতে।
তুমি ভুলে যাও হে নাম, হে পুরনো দিনের ডাক গন্ধমাখা পাখালির পরন্তবেলার গান,
উষ্ণ ওমের মাঝে লুকিয়ে রাখা ভালোবাসার খসে পড়া হাড়
শুনছো কি আদিবাসী পুরুষের রাতজাগা হু-হুঙ্কার খেদিয়ে নিয়ে বেড়ায় বন্যপ্রাণীর ছায়া।

কালরাত্রির চিহ্ন নিয়ে যারা যায় অন্ধগলির চিরপথে তাদের নখে লেগে আছে বিষ,
পান পাত্রের ব্যথা শুঁকে ঢক ঢক গিলে ফেলে কদম্ব-অন্ধকার দুঃখ জাগানিয়া
নাম বল নাম- আজ নাম জানবো তাহলেই জানা যাবে বঞ্চিত আলো।
তুমি আমাকে নতুন কিছু বলো, প্লিজ নতুন কোন শব্দ কিংবা নতুন কিছু ধ্বনি
ধ্বংসের মুখোমুখি সেই ধ্বনি তুলে তুলে প্রতিধ্বনি টেনে আনবো নদীর ওপরে,
আমাকে দেখাও সেই ঢাকা শহরের গভীর গোপনে লুকিয়ে থাকা হারানো হাসি
আমি তারে ভালোবাসি এ-সত্য নতুন করে জানাতে আজ এতো কষ্ট!
এতো পুরনো ব্যথা, এতো জেগে থাকা রাত্রি, বাঙালি পুরনো হলো অথচ
পুরনো হলো না তার অ্যাবরিজিন্যাল নিয়তি।

সে আমাকে বলছে

আমিতো একটি সকালই চেয়েছিলাম-একটি সকাল কি সেভাবে চেয়েছিল আমাকে? রাতদিনের ব্যবধান ভুলে একটি হিসেবী হাত পথ দেখিয়ে দেয় অন্যদিকে, বুঝে নেই কেউ আমাকে চাইছে না। আমার কবর খোঁড়া হচ্ছে জ্যোৎস্নার ভেতর। আর একটু পরেই গুমটি ঘর থেকে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজবে। তবে কি আমি কারাগারে শুয়ে আছি এতোটা বছর? আমার ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবীকে মনে হয় দূর কোনো নক্ষত্রলোকের ঠিকানা। কুয়াশার ইশারা তাকে আরো বেশি অচেনা করে তুলেছে। প্রতিরাতের চিৎকার, আর্তনাদ, বেঁচে থাকার আকণ্ঠ বিষ আমার বুকের কাছে ফণা তুলে চেয়ে আছে একাগ্র আমারি দিকে- আমি নড়তে পারি না। আমার বয়সের চেয়ে অনেক বড় এই পৃথিবী আমারই কোলের কাছে ছোট্ট শিশু হয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে। আমি তাকে ছেলে ভুলানো ছড়া শোনাই, রূপকথার গল্প বলি তবু তার ঘুম আসে না। সে কি তবে আমারই আদল কোনো প্রাচীন পুরাণ, সে কি তবে অসুখে অসুখে ক্লান্ত অরক্ষিত হাসপাতাল? তার গায়ে এতো দাগ, এতো আঁচড়, এতো কামড়ের চিহ্ন! আমি তারে কোথায় লুকাই? কানে কানে বলছে সে, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। কিযে ছেলে মানুষ! আমি হেসে পাশ ফিরে শুই। আগামীতে একসাথে দেখা হবে মৃত্যু ও প্রভাতের সাথে। একটিই সকাল চেয়েছিলাম, সে কি তবে ভুল ছিল? মর্গের করুণ হাসি, ঘোলা আলোর শীতল উষ্ণতা সবকিছু চেয়ে থাকবে আমারই দিকে, আর পৃথিবী বলছে-সে আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

ব্যথার গালে টোল পড়ে ব'লে

কতটা অন্ধকারে হেঁটে যেতে পারি,
কতটা ব্যথায় চুমুক দিয়ে ভেতরে নীল টেনে নিতে পারি।
তোমাদের মায়েরা কি আমার মাকে চেনেন ?
বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মা ! আর আমি
পিতা পিতা বলে হাত পা ছুঁড়ে ডাকতে থাকি।
তিনি তখন পান্ডুর জ্বর পেয়ে ভুলে গেছেন সব...

মাটির সাথে মৃগয়ার আড়াআড়ি সবতো যাদব ঘোষের অঙ্ক নয়-
এটা নিদারুণ রেষারেষি, হাত পাতলেই কী সকলে নাড়ু দেবে,
অথবা এক গ্লাস জল ? কেউ কেউ আঁচড় কাটবে গালে-কপালে।

গাঢ় অন্ধকার কান পেতে বসে আছে, কে তাকে ডাক দেয় ?
নিশিরাতে কলিংবেল, প্রত্ন প্রকাশের প্রচ্ছদ হাতে শাওন
আমাদের বাড়ি চেনেন ঢাকার অনেক কবি-শিল্পী,
জাহাঙ্গীরনগরের আউল বাউল মেয়েগুলো,
রাতভর গল্পপান ঝিম ঝিম হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ ...
তোরা যে এত গল্পও জানতিস,
কিযে হাসাহাসি মাতামাতি,
প্রচুর কবিতার বই, ডাইনিং টেবিলে আড্ডা রাতভর ...
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পুরো বাড়িটা জেগে থাকতো তাহাদের মত।

ব্যথার গালে টোল পড়ে ব'লে আমার কাছে ব্যথাকেই হ্যান্ডসাম লাগে
যে যা ভাবতে পারে, উদাস স্বপ্নখেকো স্মৃতিদগ্ধ ঘূর্ণিপ্রকৃতি যা খুশি
আসলে আমাদের বাড়িটা বেঁচে ছিল শেষমেশ আমারই আশাতে ।

প্যাপিরাসের দেহ

জানি জন্মাবো না আর। এই বইখাতা কলম কী কম্পিউটার পড়ে থাকবে অন্যকোনো কবির জন্য। মাথার ভেতরে তারও কি ঘুরবে জ্যাক দেরিদা, মিশেল ফুকো কিংবা উত্তরাধুনিকতার ঘোলাজল? যে জল কখনই কোনো কাজে আসেনি কারো, তর্কচর্চা ছাড়া। আর সে কি মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করে ডাকবে- আয় আয় শাহাবাগ তর্ক খেয়ে যা, তর্কের কপালে তর্ক বমি করে যা! সন্ধিহান অন্ধকারে চামড়ার জুতোজোড়া খাটের নিচে ঠেলে দিতে দিতে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে খালি পায়ে হেঁটে যেতে যেতে একটি জলকল কিংবা শীতাতপ ভ্রমণ সেও কি আশা করবে? সেও কি শতজন্মের অনিদ্রায় পাশ ফিরে ছুঁতে চাবে অবিশ্বাস্য আঙুরলতা?

বন্ধুদের মাথায় ঘোরে দ্বৈত রথের অধিবাস। দীর্ঘশ্বাসের চেয়েও আরেকটি সুদীর্ঘ মরু-হাহাকার। অথচ জলের দেশে শাসনের ঝুঁটি চেপে হাঁক ছাড়ে নগ্ন কালাকার। সামুদ্রিক লবণ খেয়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে বিধ্বস্ত আয়ু। জন্মাবো না এই আমি নিতান্ত ঘাসফুল হয়েও। আমাকে যারা জন্ম দিয়েছিল তারা গেছে মাটি খুঁড়ে প্যাপিরাসের দেহ অন্বেষণে। মুখোশের রাজ্যপাট নাভি থেকে ছড়ায় আগুন।

১৮. বদিউজ্জামান নাসিম

সুখ

দূরের জানলার দেখা রমণীকে মনে হয় অপরূপা।
তাকে শুধু দেখা যায়; জয় করা বড়ো কষ্ট।
সুখ ঐ দুর্জয় রমণীরই মতো বহুদূরের এক
আলো-আঁধারীর খেলা।

তুমি চিরকাল অমনি;
দূর-জানলার দুর্জয় রমণী।

গোপন ক্ষত

আমার ভালোবাসা গ্রহণ করতে তুমি অপারগ।
তবু জানতে দাও; তোমাকে না-পাওয়ার কষ্টে
যে ক্ষতের সৃষ্টি গোপনে, তার খবর তুমি জানো।
এতেই আমার স্বস্তি।

কাছে তুমি
নাইবা আমায় টানো;
শুধু বলো:
গোপন ক্ষতের খবর তুমি জানো।

মহাযুদ্ধ

যুদ্ধ'র সাথে মুগ্ধ'র অন্তঃমিলের কোন
আপাতঃ সম্ভাবনা আমরা দেখিনা।
কিন্তু তাও ঘটে যায় মহাযুদ্ধে।

কে কার প্রদেশ কোরবে অধিকার
মধ্যরাতে যুদ্ধ ছিলো তার;
ছিলো সারারাত মহাযুদ্ধ
দু'জনাতে দু'জনায় মুগ্ধ।

চিহ্নবিহীন

চিহ্নবিহীন এক আকুলকরা নদীর নাম : প্রেম

বোলতে পারি খুব সহজে
প্রশ্ন করো যদি;
তুমিই আমায় চিনিয়েছিলে
চিহ্নবিহীন আকুলকরা কূলহারা এক নদী।

করাত

মহাকাল নামের এক নিষ্ঠুর করাতের কাছে
সমর্পিত আমাদের সবকিছু। ... আমাদের রাত্রিদিন,
আমাদের যৌবন, আমাদের সর্বস্ব।

কাটে দিন
কাটে রাত;
কাটে যৌবন
কালের করাত।

শীতের গল্প

(নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আবু সাঈদ শাহীন সম্পাদিত ‘শঙ্খচিল’-এর একই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল দুই গোলার্ধের দুই কবিতার দুটি অনবদ্য কবিতা; দিলারা হাশেমের ‘আলোয়ান’ এবং নির্মলেন্দু গুণের ‘তোমার চোখ এতো লাল কেন?’। কবিতা দুটির কাব্য-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন ‘শীতের গল্প’।)

এখন শীতকাল এদেশে।
প্রচণ্ড শীত এই শহরে।
তুষার ঝড়ে কেঁপে ওঠে মধ্যরাত।
অকস্মাৎ। কোনো কোনো রাতে।

তখন কাঁপন লাগে সবখানে
স... বখানে।
তবু দুয়ার খোলে না।

একজন কবি এসেছেন দেশে থেকে
আমাদেরই ক্ষণিকের অতিথি।
হাজার বছরের ক্লান্ত পথিক বুঝি তিনি।
লম্বা পাঞ্জাবি তাঁর গায়ে, খদ্দরের চাদর;
এতে শীত মানে না।

কবি কাঁপছেন ঠাণ্ডা হাওয়ায়
আপনারই ঘরের বাইরে।
দরজাটা খুলে দেবেন কি?

গুণদা, নাম্বারটা কি মনে আছে?
অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বার?
আমি বলছি, আপনি লিখে নিন।
আপনি লিখবেন কী করে!
আপনার হাত ডুবে আছে পাঞ্জাবির অতলান্ত পকেটে
একটু উষ্ণতার আশায়।

কোনোমতে এই বোতামটা টিপুন–
তিন ছয় তিন।
দেখবেন, নিঃশব্দে খুলে যাচ্ছে দরজা
খুলে যাচ্ছে দূরবেশী এক আরশিনগর আপনারই সম্মুখে:
ধীরে ধীরে
ধী... রে ধী... রে।

অবশেষে যিনি এসে দাঁড়ালেন আপনার মুখোমুখি
তিনি আপনার অনেককালের চেনা। তবু
কেন যেন চমকে উঠলেন আপনি;
কী এক বিস্ময় আপনার চোখেমুখে!
অকস্মাৎ কি ভেসে ওঠে দূর কোনো স্মৃতি–
বহু পুরাতন, দুঃখ-জাগানিয়া?

তিনি কিন্তু একটুও অবাক হননি আপনাকে দেখে।
একটুও না।
যেন কথাই ছিলো এমন হবে একদিন:
তিন ছয় তিন–

ওই বোতামে আপনার পরশ লাগতেই তিনি জেগে উঠবেন;
অনাদি অপেক্ষায় আর্ত
শীতার্ত এক একেলা কবি এই গোলার্ধে।

অতঃপর তিনি খুলে দেবেন নিজ হাতে
রুদ্ধ দুয়ার। বন্ধ দুয়ার। একে একে।

গুণদা, আপনি যা চেয়েছিলেন, তা কিন্তু ঘটলো না।
কবি একবারও জানতে চাইলেন না:
'তোমার চোখ এতো লাল কেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে
তিনি শুধালেন অন্য কথা–

কবি, আমার আলোয়ান কই?

১৯. মুজিব ইরম

রান্না

কাঁঠালের তরকারি বুঝি তুমি শুধু রাঁধো!

ডেফলের তরকারিতে একটা বয়স এসে থেমে যায়
কলার থোড়ের মাঝে আরেক জীবন...
নালিয়া শাকের বুঝি বয়স আর বাড়লো না এখনো!

তুমি রাঁধো
তোমার রান্নার পাশে এ-জীবন অর্থময় হোক।

২.
তুমি আজ রান্না করবে লতা আর হিদইল
মানকচু তোমার হাতে আনাজি হয়েছে...

নইলার হাওরে যদি ফের যাই আলোয়া শিকারে
যদি যাই বিজলা গাঙ্গে ঘাসীয়ারা নাওয়ে করে
উড়াল জালে তুলে আনতে জ্যোৎস্নার ঝিলিক...
তুমি কি ফজরে উঠে কালিয়ারা মাছের স্বাদ বাতাসে ছড়াবে?

দড়াটানার মাছের স্বাদে বহুকাল আটকা পড়ে আছি!

৩.
কতোদিন মনু-জলে মাছেদের উড়াল দেখি না
মনে বড়ো বাদলা নেমেছে...

তুমি তুলে আনো ঘি শাক, ফরাসের বিচি...
বিরান করো পাঙ্গাসের পেটি, বোয়ালের কুর...
রাঁধো পাবদার সুরু, ইলিশের নিল্লা সালন...
উরির বিচির সাথে কড়ই ভাতের খয়েরি আয়েস

এই মন-বাদলার দিনে

তোমার রান্নার কাছে নতজানু হয়ে জীবনের মুগ্ধতা বাড়াই।

৪.
তুমি মাখাইয়া রান্না করো চেলাপাতা মাছের সালন
জীবনের সন্তুটি বাড়ায়...
গোয়ালগাদ্দা উরির ঝোলে তুমি কি দিয়েছো ঢেলে মায়ার নিমক?
তোমার হাতে চুকাইপাতা টেঙ্গা হলে
এ জীবন মুখসুন্দরী বিলের মতো ফর্সা করে আফালি বাতাস...

তুমি দেবী
তোমার হাতের ভুনা খেয়ে এ জীবন স্বপ্নরাঙ্গা করি।

৫.
তুমি দিও তেজপাতা, কমলার শুকনো বাকল
ডিমাল মাছের ঝোলে দিও তুমি সরিষার বাটা, বাড়তি মরিচ
যদি হয় পুকুরের হলহলা মখামাছ, দিও তাতে বিলাতি বাখরপাতা
আমড়ার বউল হলে বাউশের ডিম...
কৈশাকের মাঝে দিও জিওল, মাছের সুগন্ধি বাগার
লতার চচ্চরিতে কাঁঠালের বিচি, কাঙলার হিদইল
হইলফার টেঙ্গায় যদি মনে না-ধরে
দিও তবে রাঙ্গা ডুগির তরকারিতে বেলকইর স্বাদ...
চুকাইপাতার সিরা যদি রেখে দেই
হাতকড়ার সিরা যদি রেখে দেই
হাতকড়ার সুবাস যেনো তোমার ছোঁয়ায় জীবন দেখায়...
এমন রাঁধুনি হইও– দিও তুমি তৃপ্তিভরা সন্তানের মুখ।

৬.
একদিন তুমি বানিও মরিচা গুড়ের চা শ্রাবণের মেঘলা সকালে
এই জন্মে আমি বড়ো পিয়াসী রয়েছি...
তোমার হাতের ফিকা চা
লবঙ্গ-এলাচ দানার-ঘ্রাণ নিয়ে এলে
আমি তবে জীবনের রঙ খুঁজে নেবো...
একদিন তুমি বানিও ইক্ষু-রসের ক্ষির মাঘের সকালে
শীতে ভিজে এই জন্মে ক্লান্ত হয়ে আছি
কোনো এক পৌষের ভোরে

ফুলে-ওঠা চৈ পিঠার পেটে তুমি নারিকেলের উষ্ণতা দিও
– আমাকে বাঁধিও তুমি সপ্তরাঙ্গা জলে...

৭.
তোমার আঁচলে লেগে আছে বাটা হলুদের দাগ, মসলার ঘ্রাণ
যতনে মুছিয়ে দাও এই কর্দমাক্ত পাপের শরীর...
কমলার বনে তুমি ঘুরেছো কি দিনভর?
তবে কাঁচা কমলার রসে মেখে দাও উন্নিগরম ভাত
– আমার এখনো কেনো জ্বর সারে না?
কাগজী লেবুর বনে ছায়া পড়ে থাকে
রান্নাঘরে কী এমন টান, ভরা রোদে রাঙ্গা হয় চইলতার আচার...
তোমার গতরে লেগে আছে রসুনের ঘ্রাণ, পেঁয়াজের ঝাঁঝ
কেটে দাও জলডুপ আনারসের সুগন্ধী আরাম
–আমার এখনো কেনো জ্বর সারে না?

২০. রোকসানা লেইস

কম্বিনেশন

সুনসান স্কারবরো ছেড়ে
খুঁজি মধ্যরাতে ডাউন টাউনে স্পন্দিত জীবন
ঘুমহীন রাত আলোর মালায়
“সেটারডেনাইট” বাজে দ্রুত লয়ে
পান ,আনন্দ, হাসি,নাচ,গান– কারো
নতুন পরিচয় কারো ভেঙ্গে যাওয়া হৃদয়
গভীর নিশিথে খুঁজি মানুষের প্রকৃতি
টরন্টোর পথে পথে স্প্রিং এর শীত বাতাসে
ফেরদৌস ও আমি সাথে গুণদার ১০০ কবিতা
এক্সেলেটোর বেয়ে নামি ভূগর্ভ অতল ট্রেনে
দূরন্ত বাতাসের ঝাপটায় উড়ে ধাতব শব্দ।
হলুদ সোডিয়াম বাতি জ্বালা গুহায়
ছোটে সাবওয়ে।
আমাদের কণ্ঠে বাংলা কবিতা পাশে
জ্যামাইকান র‍্যাপ ।
গভীর রাতের অন্ধকার চিরে পৌঁছায়
অবরুদ্ধ আকাশের কাছে।

শূণ্যতায় ঘাস ফড়িং দিন

বন্ধঘরে সাদা মসৃন দেয়াল কড়িকাটহীন ছাদ
প্রাগঐতিহাসিক শ্যাওলা, নোনাধরা, চালচিত্র
কিছুই নেই।
শুধুই মসৃন সাদা দেয়াল বিমর্ষতায় জড়িয়ে থাকা
সারাদিন শুয়ে থাকা আর বন্ধ দেয়ালে
আটকানো চোখ টলমলো।
কাঁচের ওপারে দৃষ্টি ফেলে নীল মেঘের অরণ্যে
স্বপ্নজাল বোনা,
থমকে থাকা জীবনের জটখোলা
ছড়ানো আবীর কৃষ্ণচুড়া পাপড়িতে গাঁথা

মরুসময় অজানা বাতাসের শিসে কাঁপে।
লেইক ইরীর জলকণা গায়ে মেখে
রঙধনু বেয়ে হেঁটে চলা -
আমার বাবার বুকে মাথা রাখার জন্য
হেঁটে চলা হেঁটে চলা পথ চলা...
ক্লান্তিহীন অপেক্ষা জীবনের জলছাপ খুলেদেখার
আমাদের হৈ চৈ আনন্দ, ছেলেবেলা
কবে ফিরবে আবার ঘাস ফড়িং দিন?
গলার সমস্ত আওয়াজ ঢেলে
গান গাওয়া দিন, বকা খাওয়ার দিন
জোছনা ভাসা রাতে গল্প শোনা সময়,
শূণ্যতার বিবরে ছন্দ তুলে ভরাদুপুর নিমফুলগন্ধ ।

এখনো

উজ্জ্বল আলোর হাতছানিতে
তোমরা পেরিয়েছো রক্ত নদী
হয়ে গেছো শাশ্বত ইতিহাস
জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের মতো আমাদের বুকে।

কচি দূর্বাঘাস, লাল গোলাপ নীলআকাশ বা
সরষে ফুলের হলুদ কিছুই ছুঁতে চাওনা তোমরা
নির্বিকার তোমরা গর্বিত স্পন্দিত আজ-
রক্ত নদীর বালুকায়।
কিন্তু তোমরা কী জানো !
লাল নদীর তীরে যে সূর্য - প্রতিদিন ওঠে নামে
আজো আমরা তাকে ধরতে পারিনি।
আজো পঙ্কিল জমিনে কীটপতঙ্গ বেষ্টিত হয়ে আছি
আনন্দধারা প্রতিধ্বনি তোলে
আমাদের হৃদয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে
আমরা সাজাতে পারিনা হৃদয় মথিত গোলাপ বাগান
বিবর্ণ বনানী সবুজ শ্যামল পত্রপল্লবে গেঁথে
সাজাতে পারিনি এখনো।

অন্ধত্ব

আকাশের কাছে হাত পেতে
আলো চেয়েছি আলো
দুহাত ভরা ঐশ্বরিক আলো নিয়ে
ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি
বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা
ঢাকেশ্বরী মন্দির ভাঙ্গা
অন্ধ মানুষের চোখে।

পৃথিবী জুড়ে এত অন্ধত্ব
জম্মু, কাশ্মীর, আসাম, জাফনা
বাগদাদ, নিউইয়র্ক...
আমার দশ আঙ্গুলের মুঠোর আলো
কার চোখে মেখে দিলে
দূর হবে পৃথিবীর এত অন্ধত্ব?

২২. শবনম আমীর

অনির্বাণ জ্যোতি

(প্রয়াত শ্রদ্ধেয় কবি শামসুর রাহমানের আত্মার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।)

কবিগুরু শেষজীবনের মনোবেদনা নিয়ে
লিখেছিলেন বিরহের কবিতা, অমৃত সঙ্গীত
অক্ষরের শব্দ সাজিয়ে নিবেদন করেছিলেন
বাংলাভাষাকে বিদায়ী প্রেম।
স্মরণাতীত স্মরণের উৎকেন্দ্রিক কাব্যে
পৃথিবীকে সম্বিতহীন করে
চিরতরে চোখ বুঁজে গড়েছিলেন
শতাব্দীর অহংকারের ইতিহাস।

অস্ত আপনিও বাঙালীর বুকের
গর্বের শান্তিকে অশান্ত করে
চলে গেলেন আলোকবর্ষ দূরে
হাজারো হৃদয়ের বিবরে অশ্রুজলের
প্রপাতের প্লাবন ছড়িয়ে।

ধর্মের প্রতিহিংসায় উড়েছিল
যে রক্ত মেশানো ধুলো
অজস্র কবিতার পঙক্তিতে
সেই সব নারকীয় ধুলোকে
করতে চেয়েছিলেন কুসুম রেণু
হোলীর রাঙা ছাপ।

বারুদের ঝাঁঝ নেভাতে চাইতেন
শব্দধারার সঞ্জিবণী যাদুতে
আপনার রচিত মঙ্গল কাব্য, তাই
আপনার স্বাধীনতার মতন ‘অমর-অন্তর’।

কোন এক উন্মনা অবসন্ন প্রহরে
লিখেছিলেন বিমর্ষ আবেগে একটি কবিতা

নাম তার ‘সত্যি, কোথাও যাওয়ার নেই’
কিন্তু তাকি সত্যি ছিল! অমোঘ
ছিল বলেই আপনিও চলে গেলেন
নিজেরই অজান্তে, আপনার কবিতার
শেষ চরণগুলোর মতন–

জনমের আগে আর মরণের পরে
শুধু ধু-ধু অস্তিত্বহীনতা,
এ জগতে বটে এসেছিলাম একদা
অবশেষে বস্তুত নিশ্চিহ্ন হওয়া ছাড়া
সত্যি কোথাও যাওয়ার নেই।

হে মহান কবিবর ! ক্রমশ মরণের বুকে
ঢলে পড়া এই ধ্রুব সত্য
মৃত্যুর আমন্ত্রণের অতিথি হয়ে
আপনাকেও যেতে হলো অসীম সীমান্তে
চিরসত্যের পথবেয়ে চলে গিয়েও
রয়ে গেলেন শোনিতাক্ত কাব্য সম্ভারে
আমাদের চোখের জলের কারুকার্যে
জড়াগ্রস্ত বিবর্ণ ক্ষয়িষ্ণু প্রিয়,
স্বাধীনতার অনুভবকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে!

অসম্পূর্ণ পৃথিবী ওদের

স্বর্গমালঞ্চের ঝরে পড়া
পুষ্পকলি ওরা
ওরা দেবদূত, নিষ্পাপ পারিজাত
অহিংসার উজ্জ্বল বর্ণময় অলঙ্কার।

ওরা জানে না ঈর্ষার বিষ
অমৃতের পেয়ালা ওদের হাতে
ওরা বোঝে না সংঘষের শলাপরমর্শ
বোঝে না পতাকার বিভেদ

পৃথিবীর অঙ্গনে ওরা নতুন শব্দের বাহক
আগামীর শুভময় আশ্বাস।

ওরা বোঝে না যুদ্ধ চেনে না বারুদ
সীমানার কাঁটাতার
ওরা নয় লেবানিজ নয় ইসরাইলী
নয় আফগান নয় তাবদ দেশীয়
জাতের নামের বিশেষণ।

ওরা শুধুই শিশু নতুনের অহঙ্কার
তবুও ওদের শত্রুমিত্রের সংশয়াবিহীন
ছোট হৃৎপিণ্ডের রক্তক্ষরণে
ভেজে মায়ের কোল বাবার কাঁধ
নয়তো রাজপথ। প্রকৃতির মাটির
দখল নেবার ভয়াবহ লিপ্সায়
সবে শুরু হওয়া জীবনের ওপর
নেমে আসে যবনিকা পাত।

অমৃতের পেয়ালা ডুবে যায়
হেমলক রসে, পদ্মপলাশ চোখগুলো
বুজে যায় বড় অসময়ে অনন্ত কালের
গভীরে।
বিকারগ্রস্ত মানুষের উদগ্র কামনায়
ওদের অসম্পূর্ণ পৃথিবীর বাতাস
কাঁদে দীর্ঘতর বেদনায়।

কুমারী মন

হৃৎপিণ্ড দুলিয়ে বয়ে যায়
ফুলের সুরভী লুটে নিয়ে পাগল বাতাস
টুপটাপ ঝরে পড়ে স্মৃতিমঞ্জরী
কোন একদিনের ভরদুপুর–
জল ছপছপ উঠোন, নদীর মেটে সুগন্ধ
লালচে মাটির আঙিনার স্ফিত বুক

যেন যুবতীর সুগঠিত যুগল স্তন!

রোমাঞ্চ জাগানো আকাশজোড়া
যুবক মেঘেদের ঘনঘোর প্রেমের আহ্বান
যে ডাকের শিহরণ আজও ছুঁয়ে আছে
আমার অনেক পুরনো মনে
দেহে আর আত্মার প্রত্যন্ত প্রান্তরে।

কোনদিন শরীর মাতাল করে
হয়েছিল যৌবনের অভিষেক
কদম্বের রেণুতে পরাগে
বেলফুলের সুবাসিত আদরে
জীবনের বসন্ত উৎসব
নারীত্ব পেয়েছিল সলাজ কুমারী মন।

আজ বর্তমানের বর্ণহীন ক্ষরার
প্রহর ভরে তাকিয়ে খুঁজি
অতীতের সুরময় বর্ণালী স্বর্গ সময়
বুকের পাঁজরের অনেক গভীরে
লুকানো অরণ্যে উথাল-পাথাল
করে ঘরভাঙ্গা নিঃশব্দ ঝড়।

দু'চোখের গহ্বরে নামে
ঈষদুষ্ণ জলের প্রপাত
স্থবির অন্তর নিয়ে
আমি শুধু পিছু হটি–
পিছু হটে যাই অজান্তে আমার।

রাঙা মাটির তনয়া

ঝড় উঠবার আগ মুহূর্তে যেমন
দিনের অবয়ব নিস্তব্ধ হয়ে যায়
সুবাসী ফুলেদের সৌরভ
ভরে তোলে বিবাগী নির্জনতা

অন্তরীক্ষে বেজে ওঠে করুণ কিন্নরধ্বনি
যেন পঞ্চ নদীর মোহনায়
আলিঙ্গন করে ফেরারী
আনন্দ-বেদনা উদ্বেল সুখের উৎসব।

সেই সব দৃশ্যাবলী
মাকড়সার জালের মত পেঁচিয়ে ধরে
আমার অন্তর।
ছককাটা মেয়াদী জীবনের
সকাল-সন্ধ্যার একাকিত্বের বাসর
অতঃপর ভেঙ্গে, ভেঙ্গে বিদ্যুতের মতো
তলিয়ে পড়ে বর্তমানের
আলোর কুসুমের বিচ্ছুরণ।

পেয়েছি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা
জীবন-গনিতের সবকটা অঙ্ক কষবার
অফুরান সুন্দরের সীমানা ছাড়িয়ে
মহাবিশ্বের সীমান্ত থেকে
সীমান্তে পাড়ি দেবার
পেয়েছি ছাড়পত্র জগতের
প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে
সোহাগী হাত বুলাবার

রাঙামাটির তনয়া আমি
মেঠো বাতাস শরীরে মেখে
স্মৃতির ভস্মসার ফুঁড়ে উঠে এসে
চুমু খেয়েছি আসমুদ্র
হিমাচলের হৃৎপিণ্ডে
তাই এই বেঁচে থাকাই
আমার জন্ম-জন্মান্তর!

২৪. শামসুল হুদা

ইচ্ছে

বিচিত্র সব ইচ্ছে হয় আমার।
আমার ইচ্ছে হয় তোমার জন্যে অকারণ মরতে
ইচ্ছে হয় তোমাকে বুকের গভীরে নিবিড় জড়িয়ে ধরতে
ইচ্ছে হয় টোনাটুনির মতো নিস্তরঙ্গ সুখের সংসার গড়তে
আমার দারুণ ইচ্ছে হয় তোমার সাথে অন্তহীন প্রেম করতে

বিচিত্র সব ইচ্ছে হয় আমার।
আমার ইচ্ছে হয় অনুক্ষণ তোমাকে একান্ত পাশে রাখতে
ইচ্ছে হয় তোমার চোখে মায়াবী আদিম মুগ্ধতা মাখতে
ইচ্ছে হয় তপ্ত শরীর দিয়ে তোমার রপ্ত শরীর ঢাকতে
ভীষণ ইচ্ছে হয় তোমাকে পাওয়ার অস্থির সুখের ছবি আঁকতে।

আমিতো চাইনি

এক.
আমিতো চাইনি, তবুও নিজের গরজে এসেছ
আমিতো চাইনি, তবুও খানিক ভালো বেসেছ
আমিতো চাইনি, তবুও হৃদয়ের কপাট মেলেছ
আমিতো চাইনি, তবুও পাতানো খেলা খেলেছ।

দুই.
আমিতো চাইনি, তবুও তাজমহলের ছবি এঁকেছ
আমিতো চাইনি, তবুও নানা রংয়ের স্বপ্ন দেখেছ
আমিতো চাইনি, তবুও দুচোখে মুগ্ধতা মেখেছ
আমিতো চাইনি, তবুও বুকে কিছু গোপন রেখেছ।

তিন.
আমিতো চাইনি, তবুও আমার বিলাসী ইচ্ছের
অশোভন দাবি মেনেছ–
আমিতো চাইনি, তবুও আমার সঙ্গিন অস্তিত্বের
দুঃখবহ সমাপ্তি টেনেছ।

কখনো কখনো

ক.
কখনো কখনো আমার যে কী হয়–
ভাবি নির্ঘাত দিব্যি থাকবো
যদি তোমাকে রাখি যোজন দূরে
নির্বাসিত স্মৃতির অন্তঃপুরে।

খ.
কখনো কখনো আমার যে কী হয়–
ভাবি তোমাকে একান্তে পেলে
বিষণ্নতার দুস্থ মোড়ক ছুড়ে
সব দুঃখ যাবে শূন্যে উড়ে।

গ.
কখনো কখনো আমার যে কী হয় –
ভাবি ভালোবাসা হারিয়ে গেলে
নিষ্কাম নিদাঘ আগুনে পুড়ে
তোমাকে কিসে রাখবো মুড়ে?

চাওয়া এবং পাওয়া

সতেরো বছরের সাজানো সুন্দর সংসার ফেলে
তোমাকে চেয়েছি গোপন দুঃখের বোঝা কমাতে,
অথচ, হায়রে হায়, নির্মম নারী তুমি শুধু এলে
আমার দুঃসহ কষ্টের নিঃসীম নীল পাহাড় জমাতে!

২৫. শারমিন আহমেদ

একটি বোবা মেয়ের কাহিনী
[একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে]

শুধু কিছু স্মৃতি নিয়ে কথা
একটি জীবনের
একটু কিছু ক্ষণের।
শব্দহীন উল্লাসে আলোড়িত হৃদয়ের।
কখনো আয়নার সামনে এসে
সে দাঁড়ায়।
দুটো চেনা চোখ দেখে
নিঃশব্দ শব্দের সম্ভারে
মুখরিত জলসায়
বোবা তার ঠোঁট দুটো কাঁপে
যেন বর্ষার অজস্র জল টুপটাপ
নদীর মত কথা বলে
উঠবে এক্ষুণি।
ভরা পূর্ণিমায় পদ্মের মতো
চোখে প্রথম প্রেমের সম্ভাষণ
বুঝে নিতে হয় অনুভূতি দিয়ে।
কথা বলবে এমন সামর্থ্য
নেই ওর।
জল ভরা শ্রাবণের দিঘিতে প্রক্ষালন
গন্ধরাজের অদৃশ্য উপস্থিতিতে
হৃদয় তোলপাড়
নভোমণ্ডলের অপার্থিব খেলায়
আপ্লুত সন্ধ্যা...
চেরাছেঁড়া এমনি সব
মূক স্মৃতিতে ভরপুর
বোবা মেয়ের জীবনে ঝড় এলো একদিন।
তুমুল সে ঝড়।
রাজপথে সেদিন গুলি চললো

এদিক সেদিক।
ফাল্গুনের ৮ দিন সংঘবদ্ধ জনতার
প্রচণ্ড চিৎকারে মুখরিত হলো।
কৃষ্ণচূড়ায় রঙে মাখা।

শরীর নিয়ে যে যুবক ঘরে
ফিরলো সেদিন
বোবা মেয়ের কান্না তখন
বিদ্রোহী সঙ্গীতের মতো
সুউচ্চ ঝংকার তুললো এঘরে সে ঘরে
পথে প্রান্তরে
পাহাড়ি ঝরনার মতো অবিশ্রান্ত
চিৎকারে বলে উঠলো সে
'না, এ হতে পারে না... না, না, না'
ইতিহাসের অন্তরালে উন্মোচিত
সেই সশব্দ প্রতিবাদে
এই বোবা মেয়ের নবজন্মের কাহিনী
রচিত হলো সেদিন।

সীমান্তের ওপারে

বর্ডার পেরোলেই শান্তি–
মা'র শক্ত করে ধরা হাতে
হোঁচট খেয়ে চলি।
অন্য হাতে কুড়োনো চকমকি
পাথরের থলি থেকে ছিটকে
পড়ে নুড়ি।
আমি আতঙ্কে কেঁপে উঠি
লাশের পাহাড় ডিঙোনো
আমার সাধ্যে নেই।
মা শক্ত হাতে হিচড়ে
নিয়ে চলে। লাশ, রক্ত, কাদা
পচা ডোবায় শরীর একাকার
করে থমকে থমকে বলে

ধৈর্য ধর সোনা!
ঐ তো দেখা যায় বর্ডার।
ওটা পেরোলেই পাবি শান্তি।

সমুখের বোবা কালো রাত
মন্থরা কিশোরী রাবেয়ার
প্রসবের যাতনায় গ্রেনেড হয়ে ফাটে
বর্ডার পেরোনো পর্যন্ত
অপেক্ষা করা গেল না।
যতিনের বুড়ো বাবা অগুনিত
মানুষের ভিড়ে জীবনের
বর্ডার পার হয়ে গেল
কেমন অনায়াসে।
প্রণামের মতো জড়ো ওর
মুঠিবদ্ধ হাতে খামচানো
মাটিটুকু ঝাড়তে যাবার আগেই
কসবার পাহাড়ে মেশিনগান ছোটে
ঠা ঠা ঠা ঠা ঠা ঠা ঠা!!!
অধৈর্য আমি চিৎকার করে বলি
মা, বর্ডার আর কতদূর?

নিমিষেই মার ঠোঁট দুটো
মৌনী হয়ে যায়।
দুটো পা আচমকা ঝড় হয়ে ওড়ে।
শরীর হয়ে যায় নদীর মতো সচল।
অন্ধকারে রাশি রাশি চোখে
নক্ষত্র জ্বলে।
সম্মুখে বর্ডার। ওটা পেরোলেই শান্তি।
তারপর সময়ের দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে চেপে
এক লহমায় দুদশক পার করে দেই?
নক্ষত্রের চোখ মেলে
নতুন কোন বর্ডার খুঁজে ফেরা
পথহীন পথে।
নদী যেমন সমুদ্র খোঁজে
পাখি নীড় খোঁজে

আলোরা আঁধার খোঁজে
আমি খুঁজে ফিরি অজানা সীমান্তের রেখা
যেন ওটা পেরোলেই সব
শান্তি হয়ে যাবে।

২৭. সাহানা চৌধুরী পপি

চারাগাছ

সকালের রোদ মাখা চায়ের কাপে
রৌদ্র-কুসুমের ঘ্রাণ নিতে না নিতেই
এক ফাঁকে ঢুকে পড়ো নির্জন বাগানে

আমাদের ছায়াগুলো হাঁটে
পাশাপাশি বহুকাল
গ্রামবাংলার পথে
ধানক্ষেতে সোঁদা মাঠে
আলোজ্জ্বলা বৃক্ষের উপত্যকায়
জানালায় চোখ রেখে সেই কবে থেকে
বসে আছি আমরা দু'জন...

গাছের তলায় হাঁটে রাশি রাশি চারাগাছ
নুয়ে পড়া ডাল, কালো কালো ডানা
চিৎকারে ভরিয়ে দিয়ে ভোরের বাগান

আমি চেয়ে থাকি শূন্য চায়ের কাপে
তুমিও চেয়ে আছ জানি
আড়ালে আমার দিকে
আমরা কি জানি, চেয়ে আছে
আমাদের চোখে,
ঐ চারাগাছগুলি?

মৃত কাকাতুয়া

ভালবেসে মরে যাই–
রঙিন ব্লাউস পরে নেমে পড়ি
পুকুর-কাদায়

আলো নেই, অন্ধকারও

হিম অতীত-চুম্বনে
আমার কান্না আমার জামা
আমার পোষাকগুলো
এভাবে শুকিয়ে নেয় ঝড়ো হাওয়া রোদ

এক মৃত কাকাতুয়া গুটিয়ে রাখে
সাজানো সংবাদ
ফলমূল মাংশ
এবং গরম রুটি

আমি রঙিন জামা গায়ে হেঁটে চলি
গুলিস্তান চৌরঙ্গি অথবা
জোনাকির বনে

ছবি হোক হারানো মানুষ

চোখের সামনে বেড়ে উঠছো–
এইতো সঞ্চয়
মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সুচারু ছন্দের মোহে
জড়াও বিবাদে

জানালায় দাঁড়িয়ে ভাবি, ছড়িয়ে দিই
তোমার সকল ছবি
গাছ হও, ছবিগুলো তার পাতা আর পাখি
কিংবা বাড়ি হও, ছবিগুলো ঘোরানো সিঁড়ি
আকাশে তারা আর ছিন্ন মেঘের আবর্তন
তুমি পৃথিবী হও
ছবি হোক হারানো মানুষ

সেই প্রশ্ন

সেই প্রশ্ন এবং তুমি এক
রহস্য জলাশয়, জরসূত্রহীন

বুকের ভেতর বৃষ্টির ঘ্রাণ
আমি সাঁতরে পার হই সেই জল
আমার নীলপাখি পোশাকগুলো
ডানা মেলে উড়ে যায় শূন্যে
তখন কি-ঘন অম্বর
আমার খুব কাছে
শাদা মেঘ লাল মেঘ
সবকিছু অনিন্দ্য, যুবক

এখন মেঘ আছে তুমি আছো
আছে প্রশ্ন এবং আমিও
শুধু বেড়ে গেছে
তুমি আর প্রশ্নের ভেতরে
রহস্যময়তা

স্মৃতিহীন

অবিরাম বৃষ্টি হোক উদায়াস্ত
মেঘের জরায়ু ছিঁড়ে নেমে এসো জল-শিশু
প্লাবনে ডুবিয়ে দাও গ্লানির পৃথিবী

ধ্বংসের কিছু অবশেষ থাকে, কিছু চিহ্ন থাকে
চিহ্নকে জড়ো করে গড়ে তুলি
স্মৃতির জগৎ

শূন্য গৃহাঙ্গনে জন্মভুক প্রাণী
রক্ত-উৎসবে মেতে উঠি হোলির খেলায়

দ্বিধার আকাশে
বাষ্প প্রেরণায় বিস্তৃত মাটির ইতিহাস
একাকি ওড়ায় ধুলো
মধ্যাহ্ন বিক্ষোভে

একাকি

মেঘের বাগানে মিটিমিটি সূর্যমুখি
তুলো-বনে রংধনু সাঁকো
ওদের নিঃশ্বাসে, তপ্ত আবেশে
জড়ায় গ্রহের পাখি

হঠাৎ অপেক্ষা-ভোরে রাতের চঞ্চল স্মৃতি
মেঘের আড়ালে জোৎস্নাবর্তী রাত
পথ-বাঁকে নদী হয়ে নামে

বটমূলে সুর তোলে
ঘুম ভাঙা রাতের বেহালা
আমি বসে থাকি
ভীষণ একাকি

২৮. সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

ঘুমকুমারী

ঘুমকুমারী, ঘুমপরীদের সখী তুমি নভো নীলে
ঘুমাকাশে ঘুরছো ঘোরে ভাসছো যেন চিল গগনে
সমকামী নীলপরী আর লালপরীদের বোন হয়েছো
বৃষ্টিভ্রমণ আর কত দূর মেঘদূতের সেই নীল দূতাবাস?
দেখছো শাদা-কালো মেঘের যোগ বিয়োগ ভাগ
আর তারাদের মিল মহব্বত। তুলো মেঘের মনবিছানায়
নিদ্রা-নৌকো তন্দ্রা-তরীর ঢেউ তুলে আজ শাদাকালো
কিংবা রঙিন রঙধনুর সুর স্বপ্ন দেখো। মেঘকেলীতে ভাসছো যেন
ফ্লিপারে পা পদ্মপাতা। তুলতুলে পা, পা-ডানাতে
মেঘের রেণু, জোছনা-ভেজা হাত পাখাতে সাঁতার কাটো
একুশ আকাশ তোমার এখন পাখির স্বভাব
নীল সীমানায় উড়ছো ঘুরছো ঘুড়ির মতো–
ঘুমকুমারী কিন্তু তোমার লাটাইসুতো কার হাতে গো?

ত্রাণগম খাচ্ছে জেব্রা-ঘোড়া

আমরা ৯৫% সাদামাটা, সবুজ। বুঝি না ব্যাকরণ

আমরা নদীর ঘাটে গিয়ে বন্দরের তৃপ্তি পাই
রোদে ভেজা আমাদের পিঠে ফুটে উঠে নুন;
আমাদের অনাহারী বিড়াল ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদে।

যাদের কুপিবাতির কেরোসিন কেনার সামর্থ্য থাকে না,
যাদের গ্রামীণ বউ-এর ব্লাউজ-পেটিকোট নেই
তাদের ছেলেরা মেয়েরা লেবেন্চুস পেলেই–
নবেলের আনন্দে-নাচতে থাকে।

আমাদের ছনের ছাদের ছিদ্রি বেয়ে বৃষ্টি পড়ে সানকিতে
জোছনা ঝরে ছেঁড়া কাঁথায়...
আমরা ব্যাকরণ জানি না, নাগরিক নই।

আমাদের ঢেউটিন ৫% কোটিপতির কারখানায় কেনো?
আমাদের ত্রাণগম খাচ্ছে তোমাদের জেব্রা-ঘোড়া
আমাদের শিশুদের দুধবিস্কিট খাচ্ছে–
তোমাদের পুকুরের মাছ, প্রিয় কুকুর।

আমরা তোমাদের পুকুরের মাছ হতে চাই–
আমরা তোমাদের বারান্দার ‘কুত্তা’ হতে চাই–

বিভ্রান্ত সময়

হাঁটতে হাঁটতে জুতো হারিয়ে ফেলি
সময় দেখতে গিয়ে হারিয়ে যায় ঘড়ি
পড়তে গিয়ে হারিয়ে ফেলি চশমা।

এভাবেই হারিয়ে যাচ্ছে চাবি ও চিন্তা
হারিয়ে যাচ্ছে মন ও মূল্যবোধ
ফুরিয়ে যাচ্ছে–ফারহানা
হারিয়ে যাচ্ছে–ফারহানা
হারিয়ে যাচ্ছে প্রিয় প্রজন্ম, পার্স
ক্ষয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে, ইঁদুরে খাচ্ছে–
মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট।

গান গাইতে-গাইতে হারিয়ে যাচ্ছে সুর
মনে করতে করতে ভুলে যাচ্ছি বর্ণমালা
মরতে-মরতে মৃত্যুর ভেতর থেকে
জন্ম নিচ্ছে– জীবন।

২৯. সুরাইয়া খানম

ওয়ার্ল্ড ট্রেড

টেকনোলজির সাইকোলজী দেখলে কলজে ফাটে
চোখ উপড়ে চামড়া খুলে রাজনীতিকরা হাঁটে।
গরীব দেশের কি কি আছে? প্রাকৃতিক সম্পদ।
আরও আছে শিশু-শ্রমিক, মেয়ে মানুষের দেহ
বাড়তি জনসংখ্যা আছে, আরও অনেক মোহ।
চলছে পাচার নারী-শ্রমিক, ভাবছে তাহা কেহ? উঁহু।

মরা নেতার চামড়া খুলে ডুগডুগি-বাজ সুখে
তমঘা এঁটে, লেবেল সেটে মানুষ নাচে, ধেই।
কেউ ভাবছেন দু পকেটে ভরেনি বন্দুক
পয়সা দিয়ে পালবো লেখক, মুষ্টি করে ভারী
দলছুট কেউ হলেই দেবো পিঠের মধ্যে কিল।

এখন শুধু শুনতে বাকী স্যুইস ব্যাঙ্কের নোট,
ডলার ঢালুন, ঋণ খেলাপী, বেগম বাজার গড়ুন।
চুলগুলোকে ছাঁটতে হবে, মুখে পালিশ মাখতে হবে
ছুটতে হবে দেশ দেশান্তে, আনতে হবে যুদ্ধ সাজ।

আশা

সোনালী আঙুল মুছে দ্যায় যত মৃত্যুর খতিয়ান
অভিধানে লেখে মানবিক ভাষা আশা
এইত জেনেছি চিরকাল যুগে যুগে
প্রেম নির্ভর জীবন। জীবন দেখেছি, পেয়েছি অঢেল।
তবু কেন দানবেরা জয়ী হয় যুগে যুগে?
ভয়ে কেন আজ পরাজিত সব ভাষা?
আহামরি কত সেয়ানা শয়তানী
উল্টে পাল্টে তছনছ জনপদ।

এখনো শুনছি আহাজারী করে মরে
পৃথিবী জুড়েই কত বুকভাঙ্গা মাতা
ন্যায়-অন্যায় এও কি এখনো আছে?
প্রেম নির্ভর জীবন কি হলো একেবারে বঞ্চিত?
কোথায় সে সব সোনালী গোলাপী আশা,
মায়ের কোলের অমলিন গানগুলো?

মশালের মত জ্বলেনা কেন যে মানুষের পরিত্রাণ?

নাচের শব্দ

জোড়া শালিখ নাচে যখন
          খয়েরি হলুদ শব্দ হয়
মানুষ পাখি মারে যখন
          লাল কালো সব শব্দ হয়
মানুষ মানুষ নাচে যখন
          লাল গোলাপি শব্দ হয়
মানুষ মানুষ মারে যখন
          তখন নাচের কোন সময়!

সেফটিপিন

আতুর হয়ে চাইছ ভিক্ষে
চাই না এসব কঠিন শিক্ষে
আমার ফাটা জামা সারার রিফুর বিদ্যে
ধৈর্য, সময় শিল্পগুণের সবই মিথ্যে–

সব সমক্ষে একটি বিনয় রাত্রিদিন :
দিল আমাকে, দিন আমাকে সেফটিপিন!

আমার হৃদয় ছেঁড়াফাটা
সময় মত তালিমারা, আবার কাটা,
এখন তখন ঝুলতে থাকে অসঙ্গত
লোকে বলে : এ যে বেজায় অভদ্র ত!

তাইতো বলি, মিনতি রাখি প্রত্যহ দিন
দিন আমাকে, দিন আমাকে সেফটিপিন!

আপনাদের তো অনেক আছে : হাস্যলাস্য অহঙ্কার
বিনয় বিবেক বৃদ্ধি সাবেক সংস্কার,
আমার তো হায় কেবল একটি চমৎকার
ছিন্ন হৃদয়, ছিন্নভিন্ন পোশাক আর–
গলায় আছে অসংখ্যবার ও চীৎকার :

দিন আমাকে, দিন আমাকে সেফটিপিন ;
না হয় আমায় সেরেফ জবাই করেই নিন!

নিঃসঙ্গ ভ্রমণ

নষ্ট যমুনায় আমি যতবারই পা ডোবাতে গেছি
উদ্যত হাঙ্গর দাঁত আমাকে কেটেছে শুধু আর–
গর্কির ধাক্কায় আমি ভেসে গেছি ঢেউ-এর পাহাড়ে একাকিনী!

লোকালয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল
ভেঙ্গে গেল সময়ের সাঁকো!
ঢাকা পড়ে গেল কত মাসুম আয়াত ;
সোনার দর্পণে এলো আঁচড়, আঘাত!

আর আামি কলসী কাঁখে যতবার লোকালয়ে ফিরি
সাপ সাপ বলে ভীত মানুষ পালায়!

স্ফটিকের মতো এই শুভ্র দেহ মনের উদ্ভাসে
ওরা কি দেখতে পায় ধবংস হত্যা তান্ডবের রেখা?

ভ্রষ্টলগ্নে ম্যানিফেস্টো

এই গাছ, কবিতা শোন আমার,
শোন পাথর, কবিতা শোন দেওয়াল,

এই শুয়োরের বাচ্চা, শুনে যা আমার কিস্যা,
কুকুরের ছানা শোন কবিতা আমার!

সিংহের শাবক শোনে কবিতা আমার,
ওরাং ওটাং-এর ছাওয়াল শুনে যা শুনে যা,
আমার কবিতা শোনে বনের হায়েনা!

হাঙ্গর, কুমীর, কেচো শোন শোন–
এই কুত্তার জাত, পাও-চাটা অধম উত্তম
শোন তোরা কবিতা আমার!

ঘেউ ঘেউ বন্ধ হয়, মাতলামি থামা;

: শোন গান শুনছে–ঐ অমর অরফিউস
ম্যোৎসার্ট, বাখ, বেটোফেন, বেলাল, তানসেন,
মীরাবাঈ, রাই, জুলেখা, সখিনা।
শোনরে কুত্তার ছানা, শোন তুই আমার কবিতা;

লগ্ন যাচ্ছে :
ভ্রষ্ট লগ্নে শুনে যা আবার
অমল শব্দের ধ্বনি প্রাণের টঙ্কার।

উদ্ধারের ইস্টীমার ছাড়ছে ঐ।
শোন
ছাড়পত্র আমারই কবিতা!

৩০. সোহেলী সুলতানা

স্মৃতিময় যুদ্ধ

স্মৃতির জানালায় দেখি কুয়াশাবৃত্ত
আধো স্পষ্ট অতীত।
শতাব্দীর পোড়ো বাড়িটি যেন
পাটাতনের নড়বার শব্দ শোনায়।
রাতের গভীরতায় ঝিঁঝির
কান ধাঁধানো আওয়াজে সাধি
হারানো সেই প্রিয় সুর।
মধুময় ধ্বনি যেন বিহ্বল পৃথিবীর
বিপুলতায় হারাতে চায় অর্বাচিন পিছুটান।
অঘোষিত দুঃখেরা খিড়কী দুয়ার
মেলতে বড্ড নারাজ।

স্মৃতির বিলীনতায় সুখেরা যেন
খুঁজে ফেরে কল্পনায় রোপা
মহীরুহের বিস্তৃত শোকরের সন্ধান।
সবুজ পাটে যেন বাকলেরা
দিতে চায় সত্য ভাষণ।
প্রকৃতির বিহ্বল মৌণতায় গৌণ হয়
কৌণিক নৈতিকতা বিবর্ণ এক রোদহীন কুয়াশায়।

জমাট মেঘের আলোয়ান ভেদ করে
তবু পূর্ণিমার অশীসম মশি
শান্তিময় যুদ্ধের দামামা বাজায়
যেন বলে ওঠে–
'এখন যৌবন যার যুদ্ধ যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।'

স্বদেশ

ওই আকাশে চাঁদ উঠেছে
মেলেছে ডানা পাখি
তোমার সাথে আমার আজও

হয়নি বাধা রাখী।

সুদূরের ওই মেঘগুলোকে
বলতে ইচ্ছা জাগে
সে কি আজো আমার তরে
অপেক্ষাতে থাকে?
শিউলী ফোটা শীতের ভোরে
ভালোবাসতে যেমনি মোরে
আজো আমি এলে ফিরে
রাখবে তেমন যতন করে?

কষ্টগুলো কষ্ট করে
তোমার স্মৃতি রাখছে ধরে।
যুগ যুগেরই ব্যবধানে
হৃদয় খানি তোমার পানে
তেমনি আজো ধায়
তোমার গানে তোমার তানে
স্বপ্ন ভরা গভীর ৰণে
তোমার পরশ পায়॥

জীবন তরী

জীবন যদি নদী হতো
পূর্ণিমাতে ভাসা
দুই মনেরই মিলন হতো
যেমন ছিলো আশা।

কান্না যদি পড়তো ঝরে
বকুল তলার মতো
মালা গেঁথে তোমায় আমি
দিতাম অবিরত।

এই জীবনের দুঃখ সুখের
তরীখানি মোর
বাইতে বাইতে দেখবো সেদিন
হয়ে গ্যাছে ভোর।

সেদিন আমি দেবো তোমায়
কবিতার সব ডালা
ফিরিয়ে তুমি দিওনাগো
প্রেমের বকুল মালা।

কবিতা ও সত্য

বাংলার কবি
বাংলার রবি
বাংলার গর্ব।
বাংলার গল্প
গাইতে গাইতে
গেলেন স্বর্গ॥

কবি নজরুল
করে নিকো ভুল
তবু কেন তিনি
দিলেন মাশুল।

এ পৃথিবী হায়
তারই পানে ধায়
আছে যার ভূরি ভূরি
তাইতো আমরা
চোর বনে রই
যদিও করিনি চুরি।

বাংলার আয়ু
বাংলার বায়ু
যতদিন বয়ে যাবে
কবিতার সাথে
সত্যের প্রেম
ততদিন টিকে রবে।

৩১. হারুন চৌধুরী

মনে কি পড়ে?

বছর ঘুরে আবার
এসেছে বসন্ত
সুন্দরের মাঝে
পুষ্পের গন্ধ
কোকিল কণ্ঠে
কুহু কুহু ডাক
প্রবাস জীবনে পরাভূত।

কৃষ্ণচূড়ায় লেগেছে আগুন
তাই তো বাংলায় এসেছে ফাগুন।
পাতা ঝরার দিনে
এখানে? শিশুরা
স্নো ম্যান গড়ে
চারিদিক বরফে আচ্ছন্ন
দেশের টানে মন বিষণ্ন।...

কালের চক্র

সময় বয়ে যায়
কারও পানে
ফিরে না তাকায়।
দিন আসে বছর ঘুরে
ঋতুগুলি যায়
দূরে বহু দূরে।

আসে বৈশাখ আসে জ্যৈষ্ঠ
আসে আষাঢ় আসে শ্রাবণ
আসে ভাদ্র আসে আশ্বিন
আসে কার্তিক আসে অগ্রহায়ণ
আসে পৌষ আসে মাঘ

আসে ফাগুন আসে চৈত্র।
তারপর এরই ফাঁকে–
শৈশব পেরিয়ে আসে যৌবন
উন্মাদনায় সব ভেঙ্গে করে বিমর্ষ এখন।
কখন পাঁকে আম
কখন পাঁকে জাম
কখন পাঁকে কুল
কখন পাঁকে তেঁতুল
নবান্নের ধানের চিড়া মুড়ি খৈ
প্রবাস জীবনে সেই সব দিনগুলি কই
শ্রাবণের বর্ষণ
হেমন্তের দর্শন
সবই যেন আজ কল্পনা
হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের প্রতিমা।

দুই হাজার বায়ান্ন সাল

এক.
ভাষা আন্দোলনের ১৯৫২ সাল
একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল বসন্তকাল।
আবার আসবে কি ফিরে
আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী পরে।
আবারও কি মিছিলে গুলি হবে?
আবারও কি ঢাকার রাজপথে–
রক্ত ঝরাবে!
আবারও কি গুলির খোসায়
ভরে যাবে ঢাকার রাজপথ!
আবারও কি বারুদের গন্ধে
ছেয়ে যাবে ঢাকার আকাশ বাতাস!
আবারও কি শকুনীরা উড়বে আকাশে
গুলি খাওয়া মানুষের মাংস খাবার আশায়।
আজ ছালাম বরকতেরা কোথায়?
তারা ঘুমিয়ে আছে
আপন ঠিকানায়।

ঠিক এই দিনে, ২১শে ফেব্রুয়ারিতে
অর্ধশতাব্দী পরে
তারা কি আবার জেগে উঠবে?

দুই.
এবার ভাষা আন্দোলন নয়
ভাষার হয়েছে জয়।
ঢাকার রাজপথে স্লোগান উঠবে
রাজাকারমুক্ত বাংলাদেশ চাই;
কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা এসো
আমরা সবাই এক হয়ে লড়ি ভাই।
ভাষা আন্দোলনের সৈনিকেরা
তোমরা আজ কোথায়!
তোমাদেরও কি খুঁজতে হবে অর্ধশতাব্দী পরে
বিশ্ববিদ্যালয়ের আস্তানায়।
গাজীউল হক গাফ্ফার চৌধুরী
অলি আহাদ আব্দুল মতিনেরা।
আমরা তোমাদেরই ভাই
আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো
বছর ঘুরে এলে একুশের গান গাই।
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
বাংলা আমার প্রাণের ভাষা
এই ভাষাকে লিখি পড়ি
এই ভাষাতে কথা বলি
জন্মেছি এই বাংলায়
মীর জাফরের দালালেরা
আমার মুখের ভাষা
কাইড়া নিতে চায়।

তিন.
হে বাহান্ন সালের শহীদেরা
হে বাহান্ন সালের ভাষাসৈনিকেরা
তোমরা কান পেতে শোন
আমার সকল শ্রদ্ধা ভালবাসা
তোমাদের স্মরণে

আমার সকল পূজা
তোমাদের চরণে।
তোমরা আবারও কি বটতলায় যাবে
দুই হাজার বাহান্ন সালে
আবারও কি তোমাদের সাথে
দেখা হবে, অর্ধশতাব্দী পরে?

৩২. হাসানআল আব্দুল্লাহ

তুমি চলে যাবার পরেও

শেষ পর্যন্ত তুমিও অমানুষের কাতারে!

নিয়ম বা অপনিয়মের তোয়াক্কা না করে
বলা যায় চৌহদ্দির সকল সম্ভাবনাই
এইভাবে মুখ থুবড়ে পড়তে পারে।

অমাবস্যা পূর্ণিমার কথা আমি
বলা ছেড়ে দিয়েছি আগেই। মাঝে মাঝে
তোমার কথাই বলতাম; সম্ভাবনা
শব্দটি আমার পছন্দের মাত্রা
বাড়িয়ে দিতেই আমি তোমার প্রতিটি
পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখার চেষ্টা চালাতাম।

তুমি চলে যাবার পরেও
আমি কবিতার কথা ভাবি।

১১.২৪.০৬
কুইন্স, নিউইয়র্ক।

হায়েনা স্বকাল

ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিয়ে তুমি মুখ থেকে চারিদিকে
ছুঁড়ে দাও গন্ধযুক্ত লালা। জমানো প্রতিশোধের
বিষ ঢেলে রাস্তাগুলো করে তোলে তামাম পিচ্ছিল;
সচিবালয়ে বন্ধ্যাত্ব, হাইকোর্টে হায়েনার হাত,
দালালের কাছে দাও নির্বাচন কমিশন লিখে।
অশিক্ষা, অন্যায়, অন্ধকার, অবর্ণনীয় ক্রোধের
রাজ্য করছো কায়েম, আর সন্ত্রাসী শক্তিতে খিল

এঁটে দিয়েছো সহসা ক্রমাগত জ্ঞানের ধারায়।

–বঙ্গভবনে এখন পরিণত বিষধর সাপ–
চারিদিকে একে একে বসিয়েছো পুতুল হায়েনা;
আমার জমিনে তুমি এইভাবে করছো আঘাত।
ভুল, মিথ্যা, অকথ্য বিকৃতি এনে আমার পাড়ায়
চিরস্থায়ী ভাগাড়া বানাতে দ্রুত ছড়াও উত্তাপ;
ঐতিহ্যের অন্ধকূপ তুমি, নও অতোটা অচেনা।

১১.৩০.০৬
কুইন্স, নিউইয়র্ক

আতঙ্কগ্রস্ত সকাল

আতঙ্কগ্রস্ত সকাল নষ্ট একটি দিনের কথা বলে গেলে
বাইরের সূর্যও তখন অস্তিত্ব বিমুখ হয়ে পড়ে।
আমাদের জাগতিক জীবনকে জর্জরিত করে
ভাবনাগুলো অর্ধচন্দ্রের মতো ঘাড়ে পিঠে
কপালে বুকের মাঝখানে ঝিম মেরে বসে যায়।
চায়ের পেয়ালা, রুটি বানানোর শব্দ ও রাস্তায়
গাড়ির ইঞ্জিন থেকে ছুটে আসা মাথাকোটা ঘরঘর
অমূলক বলে ভ্রম হয়। টেবিলে হেলান দিয়ে
ভাবলেশহীন পড়ে থাকি– ভাবি নিজেকে এতোটা নিঃস্ব,
সর্বহারা মনে হয়নি কখনো...

স্মৃতি থেকে দু'টি কথা ধার নিয়ে চাঙ্গা হয়ে
ওঠার মতন সম্ভাবনাও যখন আর দেখা না-যায়, তখন
দু'হাতে নিজের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে, মাটিতে পা
দাপাতে দাপাতে, বাথরুমে ছুটে গিয়ে
বমি করতে করতে মরে যেতে ইচ্ছে করে।
অথচ মৃত্যুও অতোটা সহজে আসতে চায় না...

০১.২১.০৭
কুইন্স, নিউইয়র্ক

মিল

আমি গাধা ও গরুর মধ্যে
তেমন তফাৎ খুঁজে পাইনি, যেমন
ধান ও গমের মধ্যে।

আমি কোরআন ও বাইবেলের মধ্যে
তেমন তফাৎ খুঁজে পাইনি, যেমন
ডাল ও ঝোলের মধ্যে।

আমি মোল্লা আর ভিক্ষুকের মধ্যে
তেমন তফাৎ খুঁজে পাইনি, যেমন
কচু ও ঘেচুর মধ্যে।

আমি মূর্খ ও মৃতের মধ্যে
তেমন তফাৎ খুঁজে পাইনি, যেমন
ধূর্ত আর শেয়ালের মধ্যে।

বস্তুত মূর্খই মৃত,
ধূর্তই শেয়াল।

০১.২৩.০৭
ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক

ওয়াজিউল্লাহর লাশ

চোখবন্ধ অন্ধকার চারিদিকে মেখে দিয়ে
ভিড়ের ভেতর একাকী দাঁড়াই।
ভেসে ওঠে অশিক্ষিতের শাসন;
তামাম বাংলার দৃশ্যপট। শিলা বৃষ্টির ভেতরে দেশ;
বারুদের গন্ধ যার বাতাসে এখনো ছড়ানো ছিটানো–

ওয়াজিউল্লাহর রক্তাক্ত লাশ,
ছেঁড়া প্যান্টের ভেতরে ভাঁজ হয়ে পড়ে থাকা দেশের বিবেক–
রাজপথে ছুটে যায় আবারো দানব ট্রাক,

ঊনসত্তরের ট্রাক থেকে তেমন আলাদা নয়
দু'হাজার ছয়ের এসব স্বৈরাচারী যান।

নব্বই তো বেশি দূরে নয়।
তবে কেনো মানুষের আরো আর্তনাদ!
চলমান মিছিলগুলো এখনো অবিকল
স্মরণ করিয়ে দেয় একাত্তর সাল :
এক নদী রক্তের তুফান।

আর নয় ঘরে থাকা
আর নয় অন্ধকারে পড়ে থাকা
অশিক্ষিতের শাসন ভেঙে
অনাক্রান্ত বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাই,
মিছিলে মিছিল টেনে
বিদ্যুৎ চমকের মতো
সাড়ে তিন দশকের অন্ধকার
ছুঁড়ে ফেলে যথাযথ স্বাধীনতা ফিরে পেতে চাই।

১১.১৭.০৬
'জে' ট্রেন, ম্যান-কুইন্স

৩৩. হোমায়রা আহমেদ

ফিঙের মেলায় চাঁদ

বাতাসের শরীর বেয়ে বাতাবী গন্ধ নিয়ে চুপ
হয়ে থাকে হলুদ বিকেল, ঘুম ভেঙে পাখি গায়;
মৌমাছির চাক থেকে মধু ঝরে টুপ টুপ টুপ।
দুপুরের কোল থেকে নিঃশব্দ আনন্দ নিয়ে যায়
ঝুলে পড়া সূর্য। তোমার মুখের মতো রূপ নিয়ে
নিরিবিলি সন্ধ্যা আসে– আরক্ত উদাসীন, চিকন
আলোর রেশে ফিঙে হাঁটে– জিরিয়ে রাখা স্মৃতি দিয়ে
গুটিগুটি পায়। তারপর নিভে যায় নীল মন।

মাঠের আকাশ জুড়ে ফিকে আলো চাদর বিছায়
অন্তরাল নিয়ে ছোঁয় সোঁদা সোঁদা মাটির শরীর
নতুন শহর নিয়ে অবশ নগরী জেগে যায়,
আরেক সকাল নিয়ে জেগে ওঠে চাঁদ ভাঙা তীর।
মাটির আবেশী ঘরে ফিঙেগুলো নেচে বলে যায়
চাঁদোয়ায় মেলা বসে মানুষের মুখ করে ভিড়।

জীবন চেটে অশ্বারোহী

জীবন চেটে চেটে অশ্বারোহী পথিক
আর কতোদিন। আপেলের রেকাবীতে
মাছি– পচন দ্রুতগামী জানিয়ে দিক
তবু ব্যস্ত– জীবনের খুব ঘষে নিতে।
নারী ও জীবন দু'হাতের আঁজলায়
স্বাদের লবণ সেও চেখে যায় পাতে,
জীবনের মতো তাজা মাছ ফাল দেয়
মাছরাঙা উড়ে এসে বসে ডালটায়–

অপয়া মেয়েটার ভাঙা বিয়ের মতো
রূপালী জীবনটাকে গেঁথে নেয় ঠোঁটে।
খোঁড়ায় জীবনে যারা ভীরু ভাগ্যাহত,

গুনতে পারেনি দিন কড়কড়ে নোটে।
চেটে চেটে জীবন তবু সুস্বাদ লাগে
অশ্বারোহী নূতন পথে সশব্দে জাগে।

অন্যস্বাদ

আমার পৃথিবী ছাড়া অন্য পৃথিবী আছে
পৃথিবীতে আমি ছাড়া অন্য আমি আছে
ভুলে যাও তোমরা–
তখনই অন্ধ গলি থেকে বন্ধ ইচ্ছেদের উঠে আসা;
উঠে আসে আমিত্বের কবচ পরানো কালো হাত
অদৃশ্য মোহের সরোবর বেঁটে পদ্ম তোলে
পঙ্কিল পিচ্ছিলতায় বারবার দেহ যায় ডুবে
তবুও কি এক অমেয় আস্বাদ লেগে থাকে
জীতের তলায়–
ছুটে এসে প্রশ্ন করে কেউ একজন
বলতো কি স্বাদ, কার সাথে তুলনা মেলাই?
নিরুত্তর সময় সজাগ, তারপর বলে ওঠে
–ঠিক মৃত্যুরও আগের মুহূর্ত যেন
উদ্ভাসিত ফেলে আসা জীবন
আকাঙ্ক্ষিত অথচ কি সত্য।
পেনসিলভেনিয়া

কাঁচের শহর

কাঁচের ভেতর দ্রুত দেখার জীবন
পায়ে হেঁটে, সাইকেলে, গাড়ির চাকায়
জীবনের ভোর শুরু। স্টারবাক থেকে
এক্সপ্রেসো, ক্যাপাচিনো ভুসভুস শব্দে
অপরিচিত মুখোশে মলিন হাসিতে
অভিবাদন জানিয়ে শুরু হলো দিন।

হলদে আগুন হয়ে অমলিন সূর্য
জ্বলে মাথার ওপরে, উনুনের মতো

সেদ্ধ করে সারাদিন মানুষের মন,
উত্তাপে উচ্ছেদ হয় হোমলেস হোম;
গারবেজ ব্যাগে পিঠে ময়লা কাপড়
মাথার জটায় পোকা– জায়গা বদল
করে ফেরে সারাদিন, পিটার, জোসেফ।
এপার্টমেন্টে একাকী রোববার ভোরে
জানালার কাঁচে কাটে স্থবির সময়
ক্ষীণ কটি মেয়েদের তীক্ষ্ণ জগিং
চোখের তারায় জাগে বউ বউ স্বাদ
সময় চিবিয়ে খায় চাটমশলায়।
দুপুর বারোটা বাজে– রাস্তায় হকার
হাটডগ, মিটবল পার্কের বাতাসে,
গড়াগড়ি হ্যাট টাই চুকচাক প্রেম
আকাশ বিছায় রোদে মৃদু ভালবাসা
কাঁচের ভেতরে দেখা পুতুল শহর,
সাতটা বাজায় দ্রুত ঘুম নেমে আসে।
জেলখানা জানালায় প্রবাসী যুবক
মনে করে শহরের প্রাণ ছিলো দিনে
এখন রাতের কাঁচে রঙিন আলোয়
স্কাইস্ক্র্যাপার গুর্দাটা টিপ টিপ জ্বলে।

অন্তর ছাড়া যন্তর

অন্তর চাই অন্তর চাই বলতে বলতে
শরীর থেকে পতঙ্গ পোড়া গন্ধ বের হয়,
আকাশের বিধ্বস্ত সীমানা পেরিয়ে পোয়াতি
অন্ধকারে কৃষ্ণপক্ষে জন্ম নেয় এক
ধোঁয়াটে শরীর। সময় কথা বলে ওঠে–

শব্দ ওঠে। শতাব্দীর দরজায় এসে গাঢ়
অন্ধকারে পোড়া ভীরু মানুষের আর্তনাদ–
হয়তো উন্মাদ– পৃথিবীটা হাতের মুঠোয়,
কালের করাতে কাটা জিভ ধুলোর গড়ায়
নিঃশব্দে, যেনো রাবারের চাকা, মুছে যায় চিহ্ন।

মুছে যায় জলে ভেজা লুকোনো পুরানো চিঠি,
দেরাজের নিচে রাখা হলুদ ছবি,
জ্যোৎস্নার গান গাওয়া নির্মল খোলা ছাদ,
নূপুর বাজানো কোনো অলস দুপুরবেলা–
ধীরে ধীরে মুছে যায় অন্তর, শরীর।

যন্তর হাঁটে গুঁজে– মাংসের খাঁচা,
আকাশের নীল চিল ঠোঁটে করে নিয়ে যায়
শেষ সুখ। রবিবার শেষ হয় ঘুমহীন
শ্রাবণের রাত হয়ে, হাঙরের উৎপাত
শানত নদীতে আনে বুকফাটা লাল জল।

পর্ব- দুই. ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও অন্যান্য

সরোজিনী কদমবিবির গামছা কবর

আনোয়ার শাহাদাত

‘দক্ষিণা’ বলে অপবাদ কি গালি খাওয়া গাও-গেরাম অঞ্চলের লোক, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের কাদা-পানি প্যাকে খাওয়া পা দু’খানার ঘায়ের দুর্গন্ধের সাথে ভাদ্র মাসের ভ্যাপসা গরমের কষালো ঘামের যোগ বমি উদ্‌গীরন তুল্য দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী লোকটি যে কিনা এখন বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক আবসার হাসানের সামনে এবং যার কাহিনী কোনো না কোনো ভাবে শুরু হয় আমেরিকা থেকে।

কাজেম আলী নামের লোকটি বরগুনা-ঢাকা লাইনের দোতালা লঞ্চে এসে সকাল বেলা সদর ঘাটে নেমে সংগের ঠিকানা অনুযায়ী ধানমন্ডি লেকের পারে সদ্য নির্মিত বিশাল কথিত অট্টালিকা সমান এপার্টমেন্ট বিল্ডিংএর সামনে এসে দাঁড়ায়। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটির কোন পরিবর্তন হয় না যেমন ক্ষেতের আগাছা বাছতে কি লাঙ্গল জোয়াল টেনে ক্লান্ত গরুর বিরতির জন্যে জোয়াল খানা খুলে গরুর খুড়ার উপরে ও নিজের উরুতে কামড়ে জড়িয়ে থাকা জোক ফেলে সূর্য্য ঢাকতে কপালের উপরে হাতটা রেখে বাড়ির কান্দির দিকে চোখ কুচকিয়ে কোমরটা মচকে যাওয়ার মত দাড়িয়ে দ্যাখা বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে কেউ এলো কিনা, চাষা কাজেম আলী ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় ওই রকমই দাড়ায়, যাকে ঢাকার শহর অনুপোযোগি বলে একটি লোক বিবেচনা করা গেলেও যেতে পারে, সেই লোকটিকেই ওই মুহূর্তে এই বিলাস বহুল এপার্টমেন্টের দারোয়ানদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয় যে এই ঠিকানাই তার সঙ্গে থাকা কাগজে লেখা রয়েছে, যে কাগজ খানা সঙ্গে নিয়ে আসা দুটো পুরোনো লুঙ্গি দিয়ে বানানো পোটলা দু’টোর দ্বিতীয়টা থেকে মোড়ানোর পর মোড়ানো বিধ্বস্ত কাগজের ভেতর থেকে বের করা হয়। কাজেম আলীর কাছে থাকা ঠিকানার বর্ণনা অনুযায়ী ধানমন্ডি এলাকার অভিজাত তালিকার উল্লেখযোগ্য এই এ্যাপার্টমেন্টের কথা থাকলেও ভবনের সার্বক্ষণিক কর্তব্যরত দারোয়ান বাহিনী এই মর্মে সন্তুষ্ট হতে পারে না যে এমন একটা চাষা চেহারার লোক এ এ্যাপার্টনেন্টের কোনো সদস্যের বাড়িতেই যাওয়ার উপযোগী হতে পারে, তাও কিনা এমন এক লোকের নাম ও এ্যাপার্টমেন্টের কথা উল্লেখ করা আছে যার বাসায় এই সব দারোয়ানরা ভাবতেই পারেনা এমন একটা চাষা এসে ঢুকবে বা ঢুকতে পারে, কথা হচ্ছে আবসার হাসানের বাসা নিয়ে। আবসার হাসানের প্রতিটি উপন্যাসের পেছনে ছবি সহ লেখা থাকে তিনি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহন করেছেন জাতীয় তথ্য, দারোয়ানরা সে সব বই দেখেছে, কখনো তা পড়েছে, ও পড়ে বিনোদিত হয়েছে, একে আপরকে তৃপ্তির সঙ্গে বলেছে, লিক্‌ছে এক্‌খান জব্বর। তাদের ভাষার জব্বর এই

লেখক বাংলা সাহিত্যের এ সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয়দের একজন, সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জন্ম, আল্লা-বিল্লা সামাজিক দায়িত্ব সহ যাবতীয় ম্যাসেজে ভরপুর উপন্যাসিক গত বছরও যার ডজন খানা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, তার আগের বারও প্রায় সম সংখ্যার ক'খানা বেরিয়ে ছিল, তারও আগের বার নিজের লেখা বইয়ের সংখ্যা অবশ্য জোর সংখ্যার, তা প্রায় কমছে কম ১৪ খানা কি তারও কিছু বেশী কি কম। সেই তুলনায় গত বারের ক'খানা সংখ্যা নিচে নামার কারণে আগামীতে ১৬ খানা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন লেখক, সে অনুযায়ী কাজও করে যাচ্ছেন তিনি অর্থাৎ লিখছেন। তার স্ত্রী আতিয়া সিদ্দিকা হাসান নিজের গলার স্বর্ণালংকারে সহসা পাচ আঙ্গুল বোঝাই ভারী সব আংটি সহযোগের হাত সঞ্চালন করে অন্যদের সাথে যে ধরনের কথা বার্তা বলেন বা বলতে পছন্দ করেন স্বামী প্রসঙ্গে, আল্লার ইচ্ছায় 'সুলেখক', মাল-ছামানা, ধন সম্পত্তি যাবতীয় যা তা লেখকের পক্ষে সম্ভব হওয়ার কথা না, কিন্তু আমাদের ওনার উপর তেনার নেক নজর আছে, তেনা বলে লেখক স্ত্রী 'সৃষ্টিকর্তা' তেনার কথা বলেন বোঝা যায়। 'সুলেখক' স্ত্রী হয়তো আরো বলতে থাকেন, তাছাড়া উনি সব ধরনের মানুষের সঙ্গে উঠ-বস করেন, লেখক মানুষ তাই বড়-ছোট, ছোট-বড় যত্তলোক সক্কলের সঙ্গে উঠ-বস্, 'সুলেখক' স্ত্রী এর পর আবারও তার স্বামীকে ইঙ্গিত করে বলে যেতে থাকেন, ল্যাখক মানুষ অত বাছ বাছাই করলে কি চলে, আর তাছাড়া ছোট লোকেদের সঙ্গে মিশলেইতো আর বড় লোকের ফোসকা পড়ে না বা ইজ্জত কি ধুইয়া নেমে যাওয়ার জিনিস যে ল্যাখক হিসাবে দুই চারটা নিব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে উঠ-বস করলেই তা ধুয়ে নেমে যাবে।

পুরোনো দারোয়ানরা এসব জানে, অতএব তারা ভাবতে পারে না আজকের জনপ্রিয় লেখকের বাসায় এমন একটা চাষা প্রকৃতির লোকের আগমন ঘটতে পারে। পাছে দমক খাবার ভয় থাকে আবসার হাসানের কাছ থেকে তাই দারোয়ানরা এই গেও লোকটির আগমনের খবর দিতে ইতস্তত, দারোয়ান দলের একজন অবশ্য একবার বলে দিয়েছিল, ঠিকানা ঠিক থাকলে কি অবে, যার নাম লেহা তাও ঠিক কিন্তু আপনার মত লোক যাইতে চাইলেইতো আর আমরা পাটাইতে পারি না। কাজেম আলীর প্রকাশে ঢাকার নাগরিক দারোয়ানের বিনয় থাকে না যখন কিনা দারোয়ানদের ওইসব কথার উত্তরে বলে, আরে সাইব এইডা কোনও কতা অইল নাহি, এইডা কি কওনের কতা কিনা যে ঠিকানা ঠিক আছে, মানুও ঠিক আছে কিন্তুক যাইতে দেবেন না, আরে ভাই আমি কি চোর, নাহি ডাহাইত, না যোচ্চর নাহি বদ্‌মাইস না কি কি? যার জইন্যে যাইতে দেবেন না? দারোয়ানরা একটু দ্বিধায় পরে- "লোকটি গেয় হলেও কাথার মধ্যে কোথায় যেন একটি শক্তি আছে।"

অচলাবস্থা কাটাতে ইন্টারকমের দায়িত্বে নিয়োজিত দারোয়ান সাহস করে লেখক আবসার হাসানকে ফোন করেলেখকের নিয়ম অনুযায়ী বিশেষ করে ব্যস্ত ও জনপ্রিয় লেখকের নিয়মনুযায়ী তিনি সকালের সেশনের লেখা লিখছিলেন, যে উপন্যাসটি তিনি

এ বছরের সব চেয়ে কাটতি হবে বলে ধারণা করছেন, সেটাই সেই মুহুর্তে লিখছিলেন, লিখছিলেন বললে ঠিক হবে না, লেখা থামিয়ে কলমটা অর্ধেক পাতা লেখা কাগাজের উপরে ছেড়ে দিয়ে ওই হাত দিয়ে বোডাম ফ্রেঞ্চ প্রেস এর বিখ্যাত কফি পট থেকে কলাম্বিয়ান কফিতে একটু চুমুক দিলেন, এবং কাগজের উপর কলম ছেড়ে দিয়ে লেখার বিরতি নিলেন। লেখার বিরতি নিলেন কারণ তিনি তার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে দিয়ে একটি গভীর ঘন চুমুর দৃশ্যের কথা লিখছিলেন। লিখতে চাইলেন কিন্তু তার মধ্যে একটা সোশাল কমিটমেন্ট বাধা সৃষ্টি করল। ভাবলেন তার নায়ক-নায়িকা এক রুমে ঢুকে একটা চুমু খাবে তা 'নতুন প্রজন্মের' মূল্যবোধকে অবক্ষয়ে সহযোগিতা করবে কিনা। এমন বোধের তাড়নায় তাকে ক্ষাণিকক্ষন বিরত নিতে কি 'কলম' থামাতে হয়, সে লেখকের 'ঔচিত্য অনোচিত্য' কি কর্তব্য বোধের ফলাফল। তার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে দিয়ে যে চুমুটি তিনি খাওয়াতে চাইলেন তার পেছনে ছোট্র কাহিনী আছে এবং ওই চুমুর দৃশ্যে তিনি জীবনে সবচেয়ে বেশি প্যাশন বোধ করেছিলেন, তা তার শেষ বার আমেরিকা ভ্রমণের সময়। ঢাকায় থাকা কালে বহু বছর আগে চেনা একটি ছেলের সঙ্গে জ্যাকসন হাইটসের দোকানে তার স্ত্রীর জন্য শাড়ী ও বাইশ ক্যারেটের খাটি সোনার গহনা কেনার সময় দেখা, বড় লেখক যেচে কারো সঙ্গে কথা বলেন না, তাও আবার নিউইয়র্কে যেখানের ভক্তদের সঙ্গে দেশের দুর মফস্বলের ভক্তদের খুব মিল কিন্তু কি কারনে যেন নিজেই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলেন। ছেলেটি হাই হ্যালো ধরণের উষ্ণতা দেখিয়ে, ক'সেকেণ্ডের মধ্যে বলে বাই দ্যা ওয়ে আপনি যদি আমাকে সময় দেন তাহলে একটি লেসবিয়ান বারে নিয়ে যাবো, এক লিটারের ম্যাক্সিকান কফি টেস্টের কাহ্‌লুয়া মদ খাওয়াবো, এ্যাঞ্জেলিকা থিয়েটারে যে কোন একটি ছবি দেখাবো, একটি বিকাল, একটি সন্ধ্যা আমাদের উৎসব, বললে সে উৎসবকে ফস্টি-নস্টিও বলা যেতে পারে, ছেলেটি এই বলে হাসে এবং বলে এর সবই হবে যদি রাজী থাকেন। 'তিনি লেখক মানুষ অসম্ভবের প্রতি অদমনীয় কৌতূহল অতএব রাজি হলেন'। অন্ধকারাচ্ছান্ন সেক্সপিয়ারিয়ান আমলের জাহাজ ধরনের ডেকোরেটেড একটি বারে মদ খাওয়ার সময় সঙ্গী ছেলেটি ওই কাহ্‌লুয়া মদের ইতিহাস বর্ননা করতে থাকে যেমন কেউ কেউ পেটে এ্যালকোহল পেলে অযৌক্তিক বাচালে পরিনত হয়, দ্বিতিয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মদের জন্ম, বাষট্রিতে এর আমেরিক আগমন ইত্যাদি সব ভগর-ভগর চলতে থাকে। যদিও লেখকের লেসবিয়ান বারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আশানুরূপ নয় যেমনটি তিনি ভেবেছিলেন ও আশা করেছিলেন, তারপর ছবি দেখার পালা শুরু হলে লেখক ওই চুমুটিতে নিমগ্ন হলেন, তখনই ভাবলেন কোন একটি উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে দিয়ে তিনি তার দেখা চুমুটি খাইয়ে দেবেন, যদিও চুমুটির পরের অভিজ্ঞতা তার জন্য ছিল আশ্চর্য হওয়ার। কেননা গভীর উত্তেজিত ঘন ওই চুমুর দৃশ্যের শেষে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন নারী ও পুরুষ নয় দুটো পুরুষের মধ্যে ওই চুম্বন চলল যা অবশ্য তার বমি অনুভূতি দিয়েছিল সে সময়ের জন্যে। ছবিটি স্পেনের এক পরিচালকের যিনি নিজেও নাকি সমকামী, তিনি কখোনোই ওই পরিচালকের নাম মনে করতে চান না যদিও

ছেলেটি বলেছিল অনেক কথা তার সম্পর্কে । সেই চুমুটিই তিনি যখন তার নায়িকাকে দিয়ে করাচ্ছেন বলে কলম তুলে নিয়েছেন, যদিও ওই মুহূর্তে কল্পনায় আসা তার নায়িকাকে পুরুষের মতই মনে হয়, ঠিক সেই সময় নিচের গেট থেকে ইন্টারকমে লেখককে কাজেম আলীর আগমনের সংবাদটা জানানো হয়। লেখক আবসার হাসান 'মিষ্ট লেপ্টিত' মানুষ, নিজের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা ছাড়া আবার এটা সেটা পড়েও অভিজ্ঞতা রয়েছে অতএব তার কৌতূহল কাজেম আলী নামক লোকটির আগমনকে ছোট করে দ্যাখে না। যদিও তিনি গেটের দারোয়ানদেরকে একটু চেক করে পাঠাতে বলেন মৌলবাদিদের পক্ষ থেকে লেখকদের উপর আক্রমণের বিষয়টির কথা মাথায় রেখে।

কাজেম আলীকে নিয়ে একজন দারোয়ানের সে ধরনের কাজ করতে হলো যে ধরনের কাজ তারা খুব ভিআইপি ধরনের অতিথিদের ব্যাপারে করে থাকে। অর্থাৎ বাড়ির গেট থেকে এ্যাপার্টমেন্টের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে আসা, সেটা অতিথিকে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান দেখানো। কিন্তু কাজেম আলীকে একইভাবে একজন দারোয়ানকে সঙ্গে করে লেখক আবসার হাসানের দরজার সামনে আসতে হয় তার কারণ কাজেম আলীর পক্ষে লিফটে ওঠা বা আবসার হাসানের বাসার দরজা পর্যন্ত আসা সম্ভব নয়। দারোয়ান দেখলো লেখক সাদা পাজামার উপর একটি ফতুয়া পরে দরজা খুলে বাইরে এসে হল ওয়েতে অপেক্ষা করছেন। দারোয়ান আবারও 'কথিত' শ্রদ্ধাবনত হলো মনে মনে লেখকের প্রতি, তা কাজেম আলীকে লেখকের এমন সম্মান প্রদর্শনের কারণে। লেখক দারোয়ানের সঙ্গের লোকটিকেই কাজেম মিয়া সম্বোধন করে তার এ্যাপার্টমেন্টের দরজার ভেতরে যেতে উদ্যত হলেন, দারোয়নও ফিরে গেল।

কাজেম আলীকে লেখক আবসার হাসান তার লিভিং রুমে ঢোকার পর যথারীতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন 'দয়া করে বসুন'। কাজেম আলীকে বসতে বলার পর লেখকের নিজের কাছেই খটকা লাগল, তিনি লোকটিকে বসতে বলবার সঙ্গে 'দয়া করে' কথাটা বললেন কেন ? তিনি জানেন 'দয়া করে' কথাটা বললেন কেননা একজন চাষা-ভুষা শ্রেণীর মানুষকে বিনয় দেখাতে আর কোন ভাষা তিনি খুজে পাননি। এরপর অবশ্য তিনি আরো ভেবে পাননা এমন বিশেষ বিনয় কেন দেখাতে হবে, তার ভেতরে কি কোন অপরাধ বোধ কাজ করে? কি অপরাধ বোধ, তা নিজের ভেতরে কোথাও হয়তো, এ সময় বুকের কোন এক এলাকায় ব্যাথা করে ওঠে। তিনি জানেন না সে কি ধরণের ব্যাথা তবে নিজেই বোঝেন 'সস্তা উপন্যাসের সস্তা ব্যাথা সঞ্চালন' এর এখানে কোন মূল্য নেই অতএব তিনি কাজেম আলীর জগতে ফিরে আসেন।

কাজেম আলীর কোন পরিবর্তন নেই লেখকের এই বিশাল ড্রইং রুমে ঢুকে, চারদিকে তাকায় না পর্যন্ত, অথচ আবসার হাসানের ড্রইং রুমটা তাবৎ দুনিয়ার জিনিস পত্রে ঠাসা, 'একটা আধুনিক সাজানো যাদুঘরের মত'। কাজেম আলীর তাতে কেন, কোন কিছুতেই কিছু যায় আসে না, এই ভাবনাটা লেখকের। কাজেম আলীর ভাবনার বিষয়টা এ মুহূর্তে জানা যায় না, সে শোনে না যে লেখক তাকে বসতে বলেছেন এবং তাও 'দয়া' জাতীয়

শব্দ ব্যবহার করে। কাজেম আলী নিজের মত উদ্যোগ নেয়- তার সঙ্গে দুটো পোটলা, দুটোই লুঙ্গীর কাপড় থেকে বানানো, স্ত্রী শ্যামেলা দ্বিতীয় পোটলা বানিয়েছিল একটি পুরোনো শাড়ি কাপড় দিয়ে, পোটলার পেছনে কোন মূল্যবোধ থাকতে পারে তা কাজেম আলীর স্ত্রী শ্যামেলার জানা থাকবার কথা ছিলনা, স্বামী কাজেম আলীরও জানবার কথা নয়। কিন্তু সে যে জানে তা বোঝা যায় যখন তার স্ত্রী শ্যামেলাকে বলে হোনো মস্ত বর ল্যাখকের সঙ্গে সায়ক্ষাৎ, মেয়ে-ছেলেদের হাড়ি-কাফুড়ে বানানো পোটলা দেইখ্যা যদি ল্যাখক দেলে কষ্ট পায়, দ্যাহো আর একখান লুঙ্গি কাফুড় পাও কিনা। সামনের আশ্বিনে কাথা সেলাইর জন্য রাখা লুঙ্গী নামিয়ে শ্যামেলা দ্বিতীয় পোটলা বানায়। কাজেম আলী তার সেই লুঙ্গিও বানানো প্রথম পোটলা বাম বগলে চেপে দ্বিতীয় পোটলা থেকে লাল প্রধান সবুজ চেকের একখানি গামছা বের করে, কোন রকম লেখকের কোন মতামত গ্রাহ্য না করে কাজেম আলী লাল রঙ্গের গামছা খানি লেখক আবসার হাসানের দামী কার্পেটের উপর বিছাতে থাকে। প্রায় তিনবার গামছা খানি কাজেম আলী বাতাসে ঢেউয়ের মত করে দুলিয়ে পরে বিছায়। লেখক আবসার হাসান খেয়াল করেন গামছা বিছানোর সময় গ্রামের এই লোকটির হাত দুখানি এমন ভাবে দুলে ওঠে যেন শ্রাবণের আউশ ধানের উপর বাতাসের ঢেউ, যে ঢেউ লেখক নিজে স্বচক্ষে কোন দিন দেখতে পারেননি, দেখেছেন টেলিভিশনে। গামছা বিছানো দেখে লেখক বুঝতে পারে যে কাজেম আলী ফ্লোরে কার্পেটের উপরে বেছানো গামছায় বসবে। গামছা বিছিয়ে কাজেম আলী লেখকের দিকে না তাকিয়েই নৈর্ব্যক্তিক বলতে থাকে - সাইবদের বাড়ি ঘর, মোগের মত লোক-জোনের গা-গতরে থাহে রাজ্যের কাদা-মাডি। লেখকের যে কাজেম আলীকে বলতে ইচ্ছে করেনা তা নয় যে, তার স্প্রিং বিশিষ্ট সোফায় কাজেম আলী বসলে কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু তিনিই আবার বোঝেন কোন কাজ হবে না, কারণ লোকটা ইতোমধ্যে প্রমাণ করে ফেলেছে যা সে ভাববে বা ভেবে আছে বা করতে চাইবে তা সে করবে। আবসার হাসান 'লেখক' অতএব তার ক্ষমতা সম্পন্ন ভাবনায় এও ভাবেন নিজের ব্যাপারে যে কাজেম আলী তার নিজস্ব হালকা প্রায় অদৃশ্য সবুজ চেকের লাল রঙ্গের গামছা কোনো অভিমত ছাড়া বিছিয়ে বসতে না চাইলে তিনি ওই লোকটিকে সোফায় বসতে বলতেন কিনা। বরং তিনি ভেবে পান কাজেম আলী নিজের দিক থেকে সোফায় বসতে চাইলে হয়তো আবসার হাসানই বলতেন, না না ওখানে বসবেন না, ভেতর থেকে কাপড় আনাবার ব্যবস্থা করছি, আপনি মাটিতে বসেন; তিনি আসলে জানেন না কি হলে কি হতো, কিন্তু এসব ভাবেন। কাজেম আলী তার গামছায় বসতে বসতে পরিতৃপ্তির সঙ্গে যে সংবাদটি লেখককে দেয় তাহলো 'ঝালহাডির গামছা', আমগো দক্ষিণাঞ্চলে ঝালহাডির গামছাই অইল যাইয়া আহমনার সেরা গামছা। লেখক ভেবে উঠতে পারেন না এ ধরনের সংবাদ কাজেম আলী নামক লোকটি তাকে দেয়া বোধ করছে কেন, হয়তো কি দিয়ে কথা শুরু করবে তেমন বোধ থেকে সে এ সব কথা বলছে। কাজেম আলী বসে পড়বার পর আবসার হাসান কোথায় বসবেন দ্বিধায় পড়েন, ক'মুহূর্তে তার দ্বিধা কেটে যায় সোফায় নিজের আসনে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে

কেনোনা তিনি বুঝে ফেলেছেন তার সৌজন্যতার কোন প্রভাব এখানে পড়ছে না।

আবসার হাসানের আগ্রহ ভেতরেই থাকে, কাজেম আলীর কাছে তা প্রকাশ করেন না, ধরেই নিয়েছেন একটা কিছু তো আছে না হলে গ্রামের এই লোকটি এত আস্থার সঙ্গে তার বসার ঘর পর্যন্ত আসতো না। 'লেখক' বলে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার রয়েছে সে সব অভিজ্ঞতা কেবল ঘটনাক্রমে বা দুর্ঘটনাক্রমে হয়েছে এমন নয়, নিজে সোৎসাহে অভিজ্ঞতা সংগ্রহে উদ্যোগিই হয়েছে। আর এখন প্রতিষ্ঠিত লেখক হিসেবে তার অভিজ্ঞতার অধিকাংশই আনুষ্ঠানিক বা সাজানো তা আবসার হাসান জানেন, কিন্তু তাতে তার খুব তেমন অসুবিধা হয় না, নিজের মত করে অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ও যাচাই করে তার উপন্যাসে ব্যবহার করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তার উপন্যাসের উপকরণ আসে প্রধানত অন্যের বলা অভিজ্ঞতা কি কাহিনী থেকে। আবসার হাসানের সর্বশেষ হিট উপন্যাসগুলোর উপকরণ সবই মানুষের বলা অভিজ্ঞতা-গল্প বা কাহিনী থেকে নেয়া অতএব কাজেম আলী যে সে রকমই একটা ব্যাপার তেমনটি আবসার হাসান মনে মনে ধরে নেয়। তারপরও তার কৌতূহল প্রকাশ হয়ে পরে না বরং অধির আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, 'দেখা যাক কি হয় ধরণের' সে আগ্রহ। নিজের বিছানো গামছায় কাজেম আলীর 'আসন' ভঙ্গীতে বসার মধ্যেও কোন এক ধরণের অস্বস্থি কাজ করছে সেটা বোঝা যায়। সম্ভবত সেই অস্বস্থি থেকে কাজেম দু'হাত এমনভাবে হাটুর দু'পাশে ভর দিয়ে নিচের মাটিতে রাখে তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অস্বস্তি ও তার হাতের ভর দেয়ার ধরনের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে। আবসার হাসান উপলদ্ধি করেন কাজেম আলীর ওই অজ্ঞাত অস্বস্থি, বলেন, ভাই সাহেব আরাম করে বসেন, বসতে অসুবিধা হচ্ছে না তো ? কিছু মনে না করলে বলি, আপনি আরাম করে সোফায় বসুন, আমি কিছু মনে করবো না, বরং খুশি হবো। আবসার হাসান যেন জানতেন তার বসতে বলবার অনুরোধ কাজে আসবে না, তারপরও বলেছেন নিজের মনের শান্তির জন্যে, অজ্ঞাত অপরাধ বোধ দূরীকরণ উদ্যোগ। উত্তরে কাজেম আলী তেমনটি অপরিবর্তিত আসন ও হাতে ভর দিয়ে বিনীত ও আস্থাবান কণ্ঠে বলে, ছার হাইল্যা-জাইল্যা মানু আমাগো আসন দিয়া বওনের অইভ্যাস নাই, আসন মাইর‌্যা বইলে পরে মেইদারা, পাছা, আড়ু, পায়ের নলা, খূড়া সবই আহ্‌মনার ব্যাতা হওে, জনাবের অনুমতি পাইলে পরে আত পা কয়হান ইটটু খুইল্যা বইতে পারি। আবসার হাসান নিজের আসনে একটু নড়ে ঝুকে হাত সামনের দিকে দিয়ে বলেন, দয়া করে আপনি হাত-পা খুলে আপনার সুবিধা মত বসুন, আমি কিছুই মনে করবো না। এমনকি আপনি আমার পাশেও বসতে পারেন, তিনি তার ডান হাত সোফার ডানদিকে ছোট চাপর দিয়ে দেখান যেন ওইখানে ইচ্ছা করলে কাজেম আলী বসতে পারে। কাজেম আলী নিজের গামছার উপরে থেকে দু'পায়ের পাতার উপরে বসে তার আনা দুটো পোটলার উপরেই হাত রাখে, যে পোটলায় তার বসবার গামছা ছিল সেই পোটলার গিট খুলে হাতায় এবং আর একখানি গামছা বের করে, এবারের গামছা খানিও লাল তবে লালে লালে তফাৎ আছে, আগেরটি শিমূল লাল সবুজ চেকের মধ্যে আর

এবারেরটি হালকা হলুদ চেকের মধ্যে শক্ত পাকা খেজুরের রং ও আয়তনে বসবার গামছা খানির তিন ভাগের একভাগ। কাজেম আলী পা খুলে বসে, যেমন পায়ের বুরো আঙ্গল প্যাচ দিয়ে গরুর গলায় বা খুড়ায় বাধার জন্যে পাটের দড়ি পাকানো ভঙ্গিতে। কাজেম আলী ছোট গামছাখানি পায়ের পাতার উপরে ফ্যালে, আসলে দু'পায়ের পাতা ছোট ওই হলুদাভ লাল গামছা দিয়ে ঢেকে দেয়।

তার আগে গামছাখানি কাজেম আলী পায়ে বিছানোর সময়ে যেন একবার গন্ধ নেয়, লেখক আবসার হাসান তেমনটিই মনে করেন। তার মনে করাকে নিশ্চিত করে দিয়ে কাজেম আলী লেখককে জানায় শিশু সন্তানের মত আরকি, মায়ের কাপড় নাকের পাশে রেখে ঘুম পারিয়ে দেয়া, শিশু মায়ের কাপড় থেকে গন্ধ পেয়ে, মা মনে করে সস্তিতে নিরাপদ ভেবে ঘুমায়। কাজেম আলী এভাবে ভাঙ্গিয়ে না বললেও লেখক ইন্দ্রিয় শক্তি তা বুঝে নেয়। আবসার হাসান মনে করে কাজেম আলী হয়তো ভাবছে খোলা পায়ে লেখকের সামনে বসা বেয়াদবী হবে ভেবে হয়তো কাজেম আলী তার পা ঢেকে দেয়। কাজেম আলী লেখকের এ ভাবনা দূর করে দেয় এ কথা বলে ছার মোরা অইলাম যাইয়া আইল্যা-জাইল্যা মানু, কাদা প্যাকে থাকতে থাকতে পাও দুইহান ঘা হইয়া যায়, দুর্গন্ধ ছড়ায়, আহ্‌মনের সঙ্গে দেহা হরতে আমু বুইল্যা তিন হপ্তা আগ থেইকা কাদা পানি ভাঙ্গা বন্ধ হইর‌্যা দিছি, পিরতিদিন তভুত মাইখ্যা রাখছি ঘা পচা যা আছে হেও ঠ্যানো হুগাইয়া যায়। সেই কাদা প্যাক না ভাঙ্গা ও তুত মাখিয়ে পা শুকিয়েছে ও দুর্গন্ধ মুক্ত হয়েছে সে কথা কাজেম আলী লেখককে জানায়। আরো জানায়, তারপরও সাইব বইল্যা কতা, ওই লক্ষী ছাড়া দুমড়াইন্যা-মছড়াইন্যা পাও দুইহান আহ্‌মনে দেখপেন ক্যা ? আবসার হাসানের প্রত্যাশার বাইরে কাজেম আলী আরো খবর দেয় যে এই গামছাখানি আয়তনে ছোট কেন? ছোট কারণ এই গামছা খানি তার 'পরিবার' শ্যামেলা বিবি চুল ঝাড়ার কাজে ব্যবহার করে থাকে। কাজেম আলী তাই দূরে কোথাও গেলে স্ত্রীর গামছা সঙ্গে নিয়ে যায়, গামছায় চুলের গন্ধ স্ত্রীর উপস্থিতি কাজেম আলীকে সঙ্গ দেয়।

এ পর্যায়ে আবসার হাসান অনানুষ্ঠানিক ভাবে তার লেখার রশদ যোগার শুরু করেন। তিনি তার উপন্যাস লেখার জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে থাকেন কেমন করে স্ত্রী এই গ্রামীণ মানুষটির কাছে 'পরিবার'। কেমন করে স্ত্রীর ব্যবহৃত গামছা যা গোশল এর চুল ঝাড়তে ব্যবহার করা হয়, যার গন্ধ নিয়ে কাজেম আলী স্ত্রী সংস্পর্শ বা উপস্থিতি অনুভব করে। আবসার হাসান ইতোমধ্যে কাজেম আলীর প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে পুর্ণ হতে শুরু করেন, কেনোনা স্ত্রীর চুল ঝারা ও গামছা বৃত্তান্ত তথ্যটি দিয়ে তার পরবর্তী কোন উপন্যাসে পাঠকদের চমকে দেবেন বলে ভেবেছেন। লেখক নিজের দিক থেকে আর কিছু জানতে চান না কাজেম আলীর কাছে তাতে আশংকা থাকে স্বতঃস্ফূর্ততা ও সরলতা হারাবার যা সৎ উপাত্ত সংগ্রহের পরিপন্থী।

ধনী লেখকের বাড়ির নিয়মানুযায়ী কাজের লোক চা ও বিস্কুট নিয়ে আসে, কফি টেবিলের উপর কাজের ছেলে দু'জনার চা ও বিস্কুট নামায়। আবসার হাসান নিজের

বাসার এই রেওয়াজে অবাক হন না যে কোন অতিথি এলে আদেশ-নির্দেশের আগেই চা-কফি আসবে। কিন্তু অবাক হন অন্য কারনে, তিনি জানতেন না, যে কাপে কাজেম আলীর চা এসছে সে রকম নিম্ন মানের কাপ ও পিরিচ তার বাসায় রয়েছে। একথা তার কাছে অনবগত নয় যে, তিনি হাভ-ভাব কি বেশ–ভূষায় যাই হোন না কেন ভেতরে 'শ্রেণী ভিত্তিক' লেখক, যদিও মূল পরিচিতি ওই 'বাম ঘরানার বুদ্ধিজীবী গোত্রীয়' হিসেবে, তাই বলে তার চর্চা যে এই পর্যায়ে তারই পরিবারের ভেতরে হয়ে থাকে তা তিনি জানতেন না। তিনি আরো দেখলেন কাজের ছেলেটি কাপ পিরিচ নামিয়ে ট্রে নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় হাতের কাপড় দিয়ে একটি জায়গা মোছা দিল যার পরিষ্কার অর্থ দাড়ালো কাজেম আলীর আগমনে কার্পেট বা এই বাসার ফ্লোর নোংরা হয়েছে যা এই বাসায় মানুপোয়োগী নয় বলে ধারণা দেয়া। আবসার হাসান এর সবই বোঝেন কিন্তু ঠিক এই মুহুর্তে কাজেম আলীর সামনে তিনি তার এ বিষয়ে যা যা বুঝতে পারছেন তা নিয়ে কথা বলবেন না, সেটা কাজেম আলীকে সম্মান দেখানোই কেবল। তিনি কাজের ছেলেটিকে বললেন এই মুহুর্তে এখান থেকে চলে যাও, আমি না ডাকলে আর তুমি আসছ না।

আবসার হাসানের খারাপ লাগছে কাজেম আলীকে খেতে বলতে, কারণ আপ্যায়নের উপস্থাপনের ভঙ্গীতে এরই মধ্যে কাজেম আলীর সামনে অস্বস্তি বোধ করছেন। অবশ্য একটি শান্তনা রয়েছে, কাপ পিরিচের যে বৈষম্য কাজেম আলীকে আপ্যায়নের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়েছে তা কাজেম আলী বুঝতে পারছে না, লেখকের এই ধারণা কারণ কাজেম আলী সেদিকে তাকায় নি পর্যন্ত অতএব অন্য বৈষম্যের ব্যাপারে লেখক আবসার হাসান ভাবতেও পারেন না, যে বিস্কুট বাসার কেউ খায় না এমনকি কাজের লোকেরাও যা ছোঁয়না তা আনা হয়েছে কাজেম আলীর জন্যে। আফসার হাসানের জন্যে ভাল সংবাদ হচ্ছে এর কোন কিছুর প্রতি কাজেমের আগ্রহ আছে বলে তার মনে হয় না, সে কেবল লেখক আবসার হাসানের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে, লেখরেক সঙ্গে কথা বলতে আসার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কিছুর সম্পর্ক থাকতে পারে এমন ধারনা হয়তো তার নাই। কাজের ছেলেটি চা বিস্কুট দিয়ে চলে যাওয়ার পর কাজেম আলী লেখককে বলে ছার আহ্মনের সঙ্গে দ্যাহা হরনের বুদ্ধি করি মোরা গত শালে চৈত্তর মাসের শেষে, খুব গরম আছিল হেইদিন, টানা মেলা দিন গরমের পর সাদ্যের ঠাডা পইর‍্যা ঝড় বইন্যা অইল, দুনিয়াডা ইটটু ঠান্ডা, ঝড়া আমের নুন কাচা মরিচে ভর্তা বানাইয়া খাইতে খাইতে স্কুল ঘরের মইদ্যে এই কতা অয়, কতা উডায় পেরাইমারি বিদ্যালয়ের আইএস সি মাস্টোর আবুয়াল হোসেন। কাজেম আলীর এই লম্বা করে কথাটার মধ্যে দিয়ে লেখক আবসার হাসান জানতে পারে তার আগমন কেবল একক ব্যাপার নয়, এর মধ্যে রয়েছে আমরা, যা কোন এক চৈত্রের পরন্ত দুপুরে কাল বোশেখী সেই ঝড়ের পর কতিপয় মিলে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে লেখকের সঙ্গে এই কাজেম আলী দেখা করতে আসবে। আবসার হাসান বুঝতে পারেন তার গল্প শুরু হয়ে গেছে যা তিনি শুনে যাবেন প্রায় কোন প্রশ্ন ছাড়া; খুব

জরুরি কোথাও কোনো প্রশ্ন করতেই হবে এমন মনে না করলে। আবসার হাসানকে জানানো হয় ঢাকা কিভাবে যাওয়া হবে, কিভাবে আসা হবে যাতায়াত ভারা বাবদ খরচাদি, লেখকের ঠিকানা যোগার ইত্যাদি সব বিষয়ে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজেম আলী লেখকের সঙ্গে দেখা করতে গেলে যথা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক আশাক, আচার আচরণ সহ এমন জিনিষ বাদ থাকে না যা হতে পারে বলে কাজেম আলীরা ভাবেনি । 'পেরাইমারি' স্কুল শিক্ষক আবুয়াল হোসেনের দুর সম্পর্কের 'বেয়াই লাগে' এমন আত্মীয়র ছেলে ঢাকার শহরে থাকে, তারই কাছে একটা বই পেয়ে সেই বইয়ে লেখকের ভূমিকা থেকে আবুয়াল হোসেন জানতে পারে কিভাবে লেখক ওই উপন্যাসের উপকরণ পেয়েছিল কোন একজন অচেনা লোকের কাছ থেকে। অতএব আবুয়াল হোসেন ধারণা করে কাজেম আলীর কাছে যে একটি কাহিনী রয়েছে সেই কাহিনীর বয়ান আবসার হোসেনের মত কোন লেখককে বলতে পারলে একখানা পুথি রচিত হতে পারে, যে পুথিখানার মাধ্যমে কাজেম আলী, আবুয়াল হোসেন সহ অন্যান্যরা সন্তুষ্ট হতে পারে এই মর্মে যে আর যাহোক তাদের মতে উল্লেখযোগ্য অথচ ঘটনার বাস্তবতায় আজ যা ছোট সেই সব ঘটনা অন্তত একখানা পুথির ভেতরে থাকবে। এসব এখন আবসার হাসানের জানা হয় এবং বোঝেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেন যে নিজে আগ বারিয়েকিছু জানতে চাইবেন না। তিনি মনে করেন, যে উপন্যাসটির ভেতর থেকে তাকে এখন হাটতে হবে সেই মুখে বর্নিত উপন্যাসের লেখক এই কাজেম আলী, তা সে যে ভাবেই বলুক।

ঘটনা নাকি অনেক বছর আগের যার নির্ধারিত সন-তারিখ কাজেম আলীর পক্ষে বলা সম্ভব হয় না, স্মৃতিই নির্ধারিত সময় মনে না থাকবার প্রধান কারণ যদিও সঙ্গে কাজেম আলী আবসার হাসানকে জানায় মোরা অইলাম যাইয়া আলেহা পড়া আইল্যা জাইল্যা, শোন তারিকে মোরা চলি না, ওয়া বুজিওনা। জোয়ার ভাডা, জোবা, চান্দের ক্ষয়, আর পূর্ণিমায় বুঝি দিন যায় আয়, এই রহম সব। তবে কাজেম আলী লেখক আবসার হাসানকে একেবারে সময় সম্পর্কে অন্ধকারে রাখে না, একটি ধারণা অন্তত দেয় তা হলো বড় বইন্যার আগের কি পরের বচ্ছর। লেখক চোখের পাতায় লম্বা পলক ফেলে শান্তভাবে ঘারটা একটু দুলিয়ে কাজেম আলীকে যেন বলে সন তারিখে কোন অসুবিধা নাই, সে যা বলতে চায় তা বলে যেতে পারে।

কাজেম আলীদের গ্রামের নাম বউলাপুর, পাশের গ্রাম নোলকঝোর, নোলকঝোরের সুবিমল মিস্ত্রি ভারত চলে যাওয়ার পর তার কাজ ধরে নোভা শফি, কাজেম আলী ভাঙ্গিয়ে বলে নোভা শফির অর্থ কি, শফি লোভা প্রকৃতির লোক, খাবার দেখলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ছোট বাচ্চারা লোভা বলতে পারত না তারা বলত নোভা, সেই ভাবে সে হয় নোভা শফি। কিন্তু সেই সব সময় বলতে কোন্ সময় তার কোন ধারণা কাজেম আলী লেখককে দিতে পারে না, কেবল বহুত আগিলা কাল, বহুত পুরানা দিন সব, এমন ভাবে বলে। তয় হেই নোভা শফি সুবিমল মিসতিরির কাম ধরলে তহন থেইকা হেয়ার নাম নোভা শফি গোনে শফি মিসতিরি অয়। হেই শফি মিসতিরির যে পোয়া অইল হেই

পোয়ার নাম অইল যাইয়া রহম, রহম আলী। রহম আলী বাপের মিসতিরিগিরি না হইর‍্যা হে হইল যাইয়া আহ্‌মনার ভাসার আড়ের ছাতি হারানি মিসতিরি। কাজেম আলী ব্যাখ্যা করে, মিসতিরি গিরিডা ঠিক থাকলে, খালি কামের ধরণ বদল অইল, ঘর মিসতিরিগিরি থুইয়া ছাতির মিসতিরি ধরলে। আবসার হাসান তখন কাজেম আলীর মাধমে জানেন যে রহম মিস্ত্রির তার বাবা শফি মিস্ত্রিকে বলে যে, ঘরের কামের কোনো ঠিক থাহেনা, বচ্ছরে একটা কি দুইডা হেরও কোনো সোময় ঠিক নাই, হের চাইতে ছাতির কামে আড়ে আড়ে কিছু অন্তত আইবে, এই ভাবে এবং এই কারণে রহম মিস্ত্রি ছাতির মিস্ত্রিতে পরিণত হয়। এরপরে লেখক আবসার হাসান কাজেম আলীর মাধ্যমে জানতে পারে রহম মিস্ত্রির বাবা নোভা শফি কি শফি মিস্ত্রি গল্পে একেবারে প্রোয়াজনহীন কেননা হঠাৎ করে কাজেম আলী এবারে ওই রহম মিস্তির ছেলের প্রসঙ্গ আনে যার নাম বলা হয় খবির মেয়া। কাজেম আলী খবির মিয়ার নাম তার কাহিনীতে যোগ দিয়েই সেইভাবে বইন্যার আগের বছর পরের বছর প্রসঙ্গটি আর একবার তোলে যাতে আবসার হাসানের মনে হয় তার কাহিনীতে শফি মিস্ত্রির উপস্থিতি অত জরুরি নয় যতনা এখন সময় উল্লেখের কারণে রহম আলী মিস্ত্রি কিংবা খবির মিয়ার উপস্থিতি সঙ্গত।

তাদের কতাবার্তা চলাকালে কাজের ছেলে ঢুকে পরে আবসার হাসানকে জানায় ক্যানাডা থেকে ফোন এসেছে। আবসার হাসান কাজের ছেলেটিকে বলেন আমি একটি কাজে আছি, জরুরি কাজ এবং এমন কাজের সময় আমার বাসায়ই থাকবার কথা নয়, কাজটি বাসার বাইরে ঘটবার কথা, অর্থাৎ লেখক কাজের ছেলেটিকে বলে দিলেন অন্য আর কোন ফোন এলে যেন তাকে জানানো না হয়। তিনি এই ধরণের কাজের সময় তাত্ত্বিক ভাবে বাইরে তা ফোন করা ব্যাক্তি সে কবি বা গল্পকার কি উপন্যাসিক হোকনা, সে ক্যানাডা না হোক আমেরিকা প্রবাসী হোক, কি চন্দ্র প্রবাসী, আবসার হাসান কারো ফোন ধরবেন না, তিনি কেবল কাজেম আলীর সঙ্গে কথা বলবেন, নোভা শফি থেকে রহম মিস্ত্রি হয়ে খবির মিয়ার অনির্ণিত সময়ে বিচরণ করবেন। কাজের ছেলেটি লিভিং রুম থেকে চলে যাওয়ার আগেই কাজেম আলী লেখক আবসার হাসানকে বলে ছার জল-পিপাসা পাইছে, পানি এটটু। কাজেম আলীর মত লোকের মুখে জল-পিপাসা পেয়েছে শুনে আবসার হাসান সম্ভবত ভেতরে ক্ষাণিকটা হোচট খান, শুধু ভেতরে কেন হয়তো বাইরেও, তা না হলে কাজেম আলী নিজের দিক থেকে শোধরাবেন কেন ঐই পাশের গেরাম নোলক ঝোড়, হেইহানে কয়ঘর ইন্দু পরিবার আল্‌হে, ছোট্ট সোময় হ্যাগোর সব বাড়তে গেলে মোরা ওইরম হইর‍্যা কইতাম, এটটু ‘জল-পানি’, হেরাও ওইরম কইত মোগর সব বাড়তে। আবসার হাসান কাজেম আলীর এই ব্যাখ্যায় কিছুই বলেন না অথবা বলেন ঠিক আছে ঠিক আছে ও কিছু নয় অথবা কিছু, এর কিছু নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে তার অগোচরে একটি দীর্ঘশ্বাস পরে, যদিও সেই দীর্ঘশ্বাস নাসারন্ধ্র থেকে নিঃসরিত হওয়ার পর তার কাচাপাকা ‘পুরুষালী’ প্রতীকের গোফের উপর দিয়ে গড়িয়ে পঞ্জের মত কুচকানো কি অমসৃণ তেল তেলে বিশেষ গোত্রীয় জোকের দেহের মত ঠোট গড়িয়ে

চিবুকে মিইয়ে যায়, যেখান থেকে গড়িয়ে বুকের উপরে শার্টে পড়বার আগেই। তিনি মনে করতে পারেন না কাজেম আলী যে কথাটি অর্থাৎ জল-পানি যে বলল সেই রকম একটা কথা তিনি কবে বলেছেন বা আদৌ বলেছেন কিনা কোনদিন, নাকি লেখকের কমিটমেন্ট ‘উদারতাও’ কমিটেড হয়ে পরে। কত কিছু করা উচিৎ উনুচিতের কর্তব্যের কারণে বলা হয়নি কখনো, কোথাও, কাউকে কোন সময়ে, না সজ্ঞানে, না ভুলে। আবসার হাসান কাজের ছেলেটিকে পানি দিয়ে যেতে বলেন, তিনি জানেন কাজের ছেলেটি কাজেম আলী উপোযোগী করে পানি নিয়ে আসবে যা তার দেখতে ভাল লাগছেনা। তাই নিজের জন্যেই পানি দরকার এমন করে কাজের ছেলেটিকে পানি আনতে বললেন। কাজের ছেলেটি পানি আনতে গেলে কাজেম আলী প্রথম পোটলার ভেতরে কি জানি খুঁজতে থাকে, আবসার হাসান কোন আগ্রহ দেখায় না বাড়তি। তিনি শুধু দেখে যেতে থাকেন যে কাজেম আলী অপর আর একটি পোটলা থেকে একটি গ্লাস বের করে, ছোট পেতলের গ্লাস, পরিষ্কার ঝকঝক করছে। লেখক বুঝে ফেলেন তার বাড়ির গ্লাসে কাজেম আলী জল বা পানি খাবে না। নিজের হাতের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আবসার হাসানের উদ্দেশ্যে কাজেম আলী বলে ছার দানা ছাই দিয়া পরিবার মাইজ্যা পরিষ্কার হইর‍্যা দেচে, কতা অইল বড় লোহের বাড়ির গেলাস-পাতি আমাগোর মত মাইনষের বেবহার কইর‍্যা নষ্ট হরা উচিৎ কিনা, হেইর লইগ্যা পরিবার ও অইন্যাইন্যরা গেলাসের কতা কইল, গেলাসটার আবার ইতিহাস আছে, ওই নোলক ঝোড়ে সুবিমল মিস্ত্রি যাওয়ার আগে মোর বাফরে দিয়া গ্যাছে। আবসার হাসানকেই পানি তার পেতলের গ্লাসে ঢেলে দিতে বলেন, আবসার হাসান তাই করেন কেনো না তিনি বোঝেন কাজেম আলীর ভাষায় বড় লোকের বাড়ির জিনিস পত্র ধরে তার হাতের কারণে যেন নোংরা হয়ে না যায়। পানি পানে এত তৃপ্তি মানুষ পেতে পারে এমন ধারণা যেন আবসার হাসানের প্রথম হলো। কাজেম আলী আবার শুরু করে সেই বড় বন্যার আগের বছর না কি পরের বছর যার ঠিক কিছু নাই এবং রহম মিস্ত্রির ছেলে খবির মেয়া। হাটে ছাতি সারানোর রহম মিস্ত্রির ছেলে খবির মিয়ার নাম বলার পর অনেক কথাই হয়তো তার বলবার থাকে, কিন্তু শব্দ সীমিতের কারণে কি বর্ণনার দুর্বলাতার কারণে সেভাবে না হলেও কাজেম আলী বলে সেই মোগোর সব গেরামের খবির মেয়া, সোনার চান্দ, চাইন্দের টুকরা, গোবরের পইদ্দ এই কতা লোকে কইত কিন্তুক মুই গোবর চিনি পইদ্দ চিনি না, হেইর লইগ্যা নিশ্চিন্ত কইতে পারমু না গোবরে পইদ্দ কি জিনিষ। আবসার হাসান কাজেম আলীর কথা শুনে আরো বোঝেন যে অমন ছেলে দুই চার দশ বিশ গ্রামে কি থানায় কি জেলায়ও হয়না। কিন্তু তাদের পাশের নোলক ঝোড় গ্রামে সেই রকম সোন্তান হয়। আবসার হাসান কাজেম আলীর গল্পের আর কোন ধারনা পায় না কেবল খবির মেয়া নামক লোকটি মেধাবী বলে তার কাছে মনে হয়। তবে আবসার হাসানের এ ধারণা হয় যে খবির মিয়া নামক লোকটি নিশ্চয়ই মারা গেছে তা না হলে এটি কেন গল্পের উপকরণ হবে বলে কাজেম আলী কি আবুয়াল হোসেনরা ধারণা করতো না?

বোঝেন সাইব হেই খবির মিয়ার স্ত্রীর সোন্তান হইবে, এইডা কি খেলা কতা ? আবসার হাসান এ পর্যায়ে বুঝে ফেলেন যে কাজেম আলীর বলা গল্পে হয়তো তেমন জোর নাই, যেমন প্রতিটি মানুষই মনে করে তার কাছে সবার সেরা গল্পটি রয়েছে কেবল দরকার একজন লেখকের যিনি গুছিয়ে গাছিয়ে এমন ভাবে লিখবেন যে রাজ্যের লোকজন সেই কাহিনী লয়ে হাসবেন ও কাঁদবেন, কাঁদবেন ও হাসবেন। আবসার হাসানের আগ্রহের টান পড়লেও তিনি কাজেম আলীকে তা বুঝতে দেন না। কাজেম আলী বলে যেতে থাকে, খবির মেয়া ঢাহায় থাহে, মোস্ত বড় চারহি হরে। কিন্তু স্ত্রী 'সোন্তান সোম্বাবা' বলে রহম মিস্ত্রি ও তার স্ত্রী ঢাকায় আসতে চায়, কিন্তু খবির মেয়া চাকরি রেখে যেতে পারে না, কিন্তু বাবা মাকে খবর পাঠায় বৈশাখে তার স্ত্রীর সন্তান হবে, তারা যেন ঢাকায় চলে আসে। এখন তারা ঢাকায় কিভাবে আসবে এর আগে তো কোনদিন ঢাকা আসেনি। বন্যার বছর পৌষ মাসের ধানের মৌসুম শেষে কোন কাজ করা যায় কিনা এই মনোভাব নিয়ে কাজেম আলী একবার ঢাকায় এসেছিল। দেশি দু'একজনের মাধমে তার কাজ জোটে খিলগাঁও বাজারে তরিতরকারী বিক্রেতাদের ফুট ফরমায়েশ খাটা, তখন তার বয়স কম অনেক পুরানা কথা। কিন্তু বেশি দিন কাজেমর ওই কাজ ভাল লাগে না সে আবার গ্রামের দেশে চলে যায়। হয়তো তারই কিছুদিন পর খবির মেয়ার স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনার কথা থাকলেও খবির মিয়ার বাবা-মার ঢাকায় আসার দরকার পড়লে পাশের গ্রামের খবির মিয়ার খোজ পরে, যদি সে খবির মিয়ার বাবা মা রহম মিস্ত্রি ও তার স্ত্রীকে ঢাকা নিয়ে আসতে পারে কারণ তখনকার দিনে কাজেম আলীদের সব গ্রাম থেকে কোন মানুষ জন ঢাকার শহরে আসে না বা ঢাকার শহর চেনে না কেবল কাজেম আলী বাদে, কাজেম আলী রাজি হয় কেননা খরচ পাতি যাওয়া-আসা খাওয়া-দাওয়া বাবদ সব খরাচাদি ওই রহম মিস্ত্রির।

বন্যার আগের কি পরের বছর তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে বলে মনে হয় না লেখক আবসার হাসানের। কেনোনা কাজেম আলী এমন কিছুই বলছেন না যাতে সন তারিখের আদৌ কোন দরকার আছে। তারপরও কেনো যেন কাজেম আলী সন তারিখের সঙ্গে এক যোগ স্থাপনের চেষ্টা করে যায়। আবসার হাসান কাজেম আলীর কোন কিছুতেই আপত্তি করে না। তিনি লেখক, অন্যের গল্প শুনতে তার কোন আপত্তি নাই, অতএব তাকে কাজেম আলীর বর্ণনা শুনতে হয় কিভাবে এবং কেন মনে করে সেটা অর্থাৎ যে সময়ের কথা বলতে চায় তা বছরের কোন সময়। চৈত্র মাস হবে, ভীষণ গরমের রাত, পরের দিন ঢাকা যাবে বলে তেমন ঘুম হয় নি। সকালে উঠে পাতি গাব খাওয়ার লোভ সমালাতে পারে না। সে যখন লুঙ্গী কাছা দিয়ে গাব গাছে উঠছিল তখনও গাব গাছে বসে থাকা কোকিল শেষ ডাকটি দিয়ে উড়ে গিয়েছিল এর সব কিছুই তার মনে থাকত না বলে কাজেম আলী লেখককে জানায়, যদি না তাড়া হুড়ায় সে একাধিক গাবের বিচি গিলে ফেলতো। গাবের বিচি গিলে ফেলা যে কোন ঘটনা নয় বা ঘটনা হতোনা যদি না ওই গাবের বিচি তার পেট শক্ত করে না ফেলত এবং ঢাকায় খিল গাওয়ে দেখা করতে

যাওয়া মেসের পায়খানায় ওই গাবের বিচি হেগে না দিত। কাজেম আলী তাই লেখককে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে যে সেটাই ভাগ্য যে সেদিন সে ঢাকা যাওয়ার আগে খুব সকালে তাড়াহুড়া করে অতগুলো গাবের বিচি না খেলে ঢাকায় গিয়ে পেট শক্তও হতোনা কষ্টও হতো না এবং খবির মিয়ার ঘটনার সময়টাও ধরিয়ে দিতে পারত না। লেখক আবসার হাসান কাজেম আলীর কথায় এমন ভাব করেন যেন সে খুবই ঠিক কথা বলেছে। বন্যা এবং কোকিল ও পাতি গাব পাকানোর সময় চিহ্নিত হলেও এই গল্পের কোন ভাবগতিক ঠাওর করতে পারে না লেখক আবসার হাসান।

বরগুনার লাইনের লঞ্চে করে সারা দিন লাগে তাদের বরিশাল আসতে। বরিশাল থেকে আর একটা বড় লঞ্চে তারা ঢাকায় রওনা দেয়, দুদিনের খাবার দাবার সঙ্গে নিয়ে আসে গ্রাম থেকে অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা ঢাকা রহম মিস্ত্রির ছেলের বাসায় আসবে, তার আগে তাদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা আছে। এই দীর্ঘ ভ্রমনের সময়ে নাকি রহম মিস্ত্রি ও তার স্ত্রী রাজ্যের সব কথা বলে কাজেম আলীর সঙ্গে। হেয়া কত্তা দরনের কতা সাইব, আর কমু কি, আবসার হাসান বোঝেন অর্থাৎ রহম মিস্ত্রি যত ধরনের কথা সে সময়ে কাজেম আলীকে বলেছে তার কিছু অংশ হলেও আবসার হাসানকে এখন শুনতে হবে।

এই পোলাতো আমার ঘরে জন্মানোর কতা না, ভাগ্যের কারবার, এমনভাবে বলেছে রহম মিস্ত্রি সেই লঞ্চ ভ্রমনের সময় কাজেম আলীকে। ছেলে সন্তান হলে ছাতি মিস্ত্রির যতসব কল্পনা থাকবার কথা তা তার ছিল কিন্তু সব উল্টা পাল্টা হয়ে যায় যখন আবিষ্কার করে তাদের ছেলে খবির মেয়া পড়াশুনায় ভাল, তুখ্খার ছাত্তর। রহম মিস্ত্রির স্ত্রী কদম বিবি সে সময় কাঁদে আনন্দ ও দুঃখে যে ছেলে তার লেখাপড়া করে বড় হয়েছে, আবার ছেলেকে মা হিসেবে কোনদিনই কাছে পায় নাই, ওই তার লেখা পড়া করবার জন্যে। রহম মিস্ত্রি সুখ দুঃখের অনেক কথার মধ্যে এ কথাও বলে যে সকলের মত তারও আশা ছিল ছেলেকে দেখে শুনে বিয়া করাবে, কিন্তু তাদের সব গাও গেরামে ওই ছেলের উপযুক্ত কইন্যা কোথায়। ছেলে তার পছন্দ মত বিয়ে করে, বউ অইলো যাইয়া সোনার নাহান টুকরা। কিন্তু তাতে কি তারা তো আর কাছে পায় না। খবির মিয়ার চাকরি হওয়ার পরে বাবাকে বলেছে ছাতি সারানোর কাজে যত টাকা আসে তার চেয়ে বেশি টাকা সে বাবাকে দেবে, তাতে যদি বাবা তার ছাতি সারানোর কাজ ছেড়ে দেয়, রহম মিস্ত্রি কথা বলবার সময় সেদিনের তরুন কাজেম মিস্ত্রির ডানায় হালকা চাপ দেয়, মুচকি হাসে, বলে, এইডা হের ইজ্জতের ব্যাপার, অমুকের বাবা হাট বন্দরে ছাতি মিস্ত্রির কাম করে। তবে ছেলে বলেছে চাইলে সে ছাতি সারানোর কাজ করতে পারে যদি একান্তই তার মন চায়। অতএব ছাতি মিস্ত্রি ছাতি সারানোর কাজ বন্ধ করে দেয়, কিন্তু ছাপড়া দেয়া জায়গাটা হাট কমিটির কাছ থেকে বায়না করে রাখে যদি সত্যই তার মনে হয় যে ছাতি সারানোর কাজ আবার তার করতে হবে, এই ধরনের কত সব কথা হয় তার শেষ নাই, এমনভাবে কাজেম আলী লেখক আবসার হাসানকে জানায়। কাজেম আলী অভ্যাস

বসত তার হাত দিয়ে কপালের ঘাম মোছবার চেষ্টা করে যদিও তার ঘামায় না, তার কাছে এটা তাজ্জব ব্যাপার মনে হয় এবং একবার ঘামহীন কপালে হাত দিয়ে মুছে লেখককে বলে ছার সাইবদের বাসা বাড়ির কারবারই অইল যাইয়া অন্য রহম, ভাদ্দর আশ্বীনের গরমেও কেমন ঠান্ডা, যেন পুহুইর পারের ঘন ক্যালার ঝাড়ের নীচে, হেও এত ঠান্ডা না। লেখক আবসার হাসান তাকে বলেন না যে তার বাড়িতে ঠান্ডার কারণ কি, বলেন না কারন তার মনে হয় তাতে হয়তো গল্পের স্রোত পরিবর্তন হয়ে যাবে। অতএব এ প্রসঙ্গে আবসার হাসানের কোন কিছু না বলা কাজেম আলীর সেই অভিমতই থেকে যায় যে সাহেবদের বাড়ি ঘরে অন্যরকম ব্যাপার, গরমের মধ্যেও ঠান্ডা। আবসার হাসান এ সময় বোধ করেন দুপুর হয়ে গেছে, কিছু খাওয়া দরকার। তাই এক ফাকে কাজেম আলীকে বলেন ভাই সাহেব আমাদের তো কিছু খাওয়া দরকার দুপুর হয়ে গেছে। এর উত্তরে কাজেম আলী বলে, ও মেলাক্ষণ কতা কইলাম, টেরই পাই নাই। তাছাড়া হুরুজ দেহন যায়না এহান দিয়া বুঝমু কেম্‌মে এহন কি বেলা। এ পর্যায়ে অবশ্য আবসার হাসানের নূতন সমস্যার কথা ভাবতে হয়। এ কথা সত্য গ্রামীণ এই কাজেম আলীকে নিয়ে তার ক'লাখ টাকা দামের ডাইনিং টেবিলে বসে খেতে আপত্তি নাই, কিন্তু তার পরিবার, তারা কি প্রস্তুত এর জন্যে এমনকি দেখতে এই দৃশ্য, কাজের লোকগুলোও তো আপত্তি করবে, মুখে না হোক অন্তরে। যে মানুষটির বর্ণিত কাহিণীর উপর তিনি হয়তো যে সফল উপন্যাসটি রচনা করবেন, যে উপন্যাসটি আবার তাকে দিতে পারে কত লাখ টাকা এবং অগণিত আরো, তা অনাগত সময়ের জন্যে, অথচ সেই মানুষটিকেই সঙ্গে করে এক বেলা খাবার খাওয়া যাবে না। এক বেলা মাত্র, অথচ কি অদ্ভত 'লেখক স্বাধীনতায়' কখনো তার কাগজ কি কলম,কোন কিছুতে বাধ সাধে না। আবসার হাসান কাজেম আলীকে বলেন একটু ভেতর থেকে আসি, তিনি ভেতরে যান। স্ত্রী ফোনে কথা বলছিলেন, সিঙ্গাপুর, হোটেল, শপিং মল এ সব শব্দ তিনি শোনেন, ফোন হাতে রেখে স্ত্রী জানতে চান লোকটি কে ? তুমিতো সকাল থেকে কিছু খাওনি, এক সঙ্গে দুপুরের খাবারটিই খেয়ে নাও। স্ত্রীর সামনে লেখক এমনভাবে দাড়িয়ে থাকেন যেন গ্লাডিয়েটর যুগের দাস, কিছু বলতে চান বলতে পারেন না। স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন কিছু বলবে বিশেষ? লেখক এক পা আগান দুহাত জড় করেন তার নাভী সমান্তরাল, জড় হাত উপরে উঠে আসে বুকের কাছে, বুকের নিচে, বলেন লোকটি বরিশালেরও একশ মাইল দক্ষিণ থেকে এসেছে। স্ত্রী বলেন তার হাতের ফোন একবার কানের কাছে নিয়ে আবার ফিরিয়ে এনে 'তো'। লেখক তো ধ্বনীর বিশ্লেষনাত্মক মমার্থ বোঝেন না তা নয় তারপরও জড় হাত আবার নিচে নাভী সমান্তরাল এনে বলেন, দুপুরের খাবার। লেখক স্ত্রী ফোন আবার কানের কাছে নিয়ে বলেন শোন্ পরে ফোন করবো। তিনি ফোন থেকে ফ্রি হলেন কারণ কোন রকম ঝামেলা মুক্ত এবারে স্বামী লেখকের সঙ্গে কথা বলবেন। লেখক জানেন আগ্রাসী মনোভাবপন্ন প্রতিবেশীর সঙ্গে বসবাসের কৌশল, তিনি বলেন ঠিক আছে, ঠিক আছে, দু'বার। যদিও এই 'ঠিক আছে'র ভেতর অঘোষিত যুদ্ধের শুরুতেই পরাজয় মেনে নেয়া। কিন্তু লেখক যখন বললেন মনে হলো- অতি সাচ্ছন্দে

তিনি পরাজয়ের কথা বললেন। স্ত্রী কিছু বলবার আগে তিনি ঠিক আছে বলে বেডরুমের বাথরুমে যেতে থাকলেন। নিয়ম ভাঙ্গলেন, বাথরুমের দরজা লাগালেন না, আধা খোলাই থাকল। কমোডে বসে তিনি পেশাব করেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলেন পুরো পাজামা খুলে তিনি কমোডে বসে পেশাব করবেন না বরং যিপার খুলে দাড়িয়ে পেশাব করবেন, তিনি তাই করতে গেলেন কিন্তু টের পেলেন অনেক্ষণ পেশাব করেননি, অধিক চাপে পেশাব আসতে সময় নিল। তখনই তার মনে হলো যে একইভাবে কাজেম আলীর পেশাব পাওয়ার কথা অথচ কাজেম আলী সে কথা বলেনি এখনো পর্যন্ত, খারাপ লাগে ভেবে সমাধান খুজতে যে কাজেম আলীর মত লোকের পেশাব বা পায়খানা করবার সেই ব্যবস্থা এ বাড়িতে আছে কিনা, পেশাবের অধিক চাপে লেখকের চোখে পানি এলো।

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক পাজামা কোমর থেকে নামিয়ে অঙ্গ কমোডের দিকে সুটার নিয়মে টার্গেট করে ঝড় ঝড় শব্দে সীমিত জলে ফানা তুলে হলুদাভ জলোচ্ছাসের তৈরী করলেন, তাতে যোগ হতে চাইল আরো ক'ফোটা জল, চোখ থেকে যার উৎস, অধিক পেশাবের চাপ ও অতপর একটি অজ্ঞাত কান্নার অনুভূতি। ভাবলেন বা মনে পড়লো লস এ্যাঞ্জেলেসের হলিউড ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে যেমন করে ছোট পুকুর খানিতে কেমন কৃত্রিম ঢেউ তুলে টাইটানিকের মত জাহাজ ডুবিয়ে ফেলা হয়। তখনই তার মনে হলো তিনি তার কোন এক উপন্যাসের নাম রাখবেন কমোডে ঝড়।

এই ঝড় থেমে যায় যখন কিনা স্ত্রী ছোট চিৎকারে বলেন তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে দাড়িয়ে পেশাব করছ। লেখক আবার বেরিয়ে তার লিভিং রুমে চলে যান, কাজেম আলীকে বলেন কিছু মনে নেবেন না দেরি হয়ে গেল একটু পেশাবের বেগ পেয়েছিল, আপনার পেশাব পেলে বলেন। তখনো একহাত পোটলার ভেতরে কাজেম আলীর, পোটলা থেকে কি যেন বের করতে করতে বলল, না ছার আমাগোর মতন লোকের সাইবদের বাড়িতে গু-মোতনের মতন কাম হরন ভাল না, হুরুজ উদয় অস্তান্দি একদিন না হরলে কিচু অইবে নানে। ঢাকায় আওনের আগে এই ব্যাপারে এটটু টেরনিং দিছি যাতে ওই কতা 'সাইবদের বাড়ি'। লেখক অবাক হন লোকটির জ্ঞান দেখে। কাপড়ের পোটলার ভেতর থেকে নতুন ছোট পোটলা সে বের করে। আবসার হাসান দেখতে থাকেন এ পোটলা থেকে কি বের হচ্ছে, কাগজে মোড়ানো দুটো পোটলা একটা আয়তনে অপরটির চেয়ে ছোট। কাজেম আলী প্রথমে বড় পোটলা খোলে, আবসার হাসান দেখতে থাকেন তার ভেতর থেকে চারটে আটার রুটি বের হয়। তখন অবশ্য লেখকের বুঝতে বাকি থাকে না যে অপর পোটলায় এমন কিছু যা দিয়ে সে তার ওই রুটি খাবে। আবসার হাসান তার আসনে ফিরে আগের মত বসেন, ছার পরিবার আডার রুটি বানাইয়া দেছে সব ব্যালার জইন্যে, আলেদা আলেদা পোটলা বানাইয়া, লগে মিডা দিয়া দেছে, খাজুরের মিডা, রওয়া পড়া চিনির লাহান দানা, ঝোলা মিডা না, নিজের গাছের, নিজেই গাছ কাটাছি নিজেই রশ লইছি, শ্যামেলা বিবি জাল দিয়া হেইয়ার মিডা

বানাইছে। আবসার হাসান জানেন এ প্রসঙ্গে কাজেম আলী কি বলবে, যে সাইবদের বাড়িতে তার মত হাইল্যা জাইল্যার খাওয়া উচিৎ নয় তাই স্ত্রী তার জন্যে রুটি বানিয়ে দিয়েছে। এবারে লেখক আবসার হাসানের সত্যি কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছে একটি মানুষের এমন সব অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দেখে। ঠিক সেই মুহূর্তে কাজেম আলী বলে, ছার কইতে অয় তাই কই, খায়েন আমার লগে ঝোলা মিডা আর রুডি, কিন্তু আহ্মনেদের মত বড় লোকরার এই সব জিনিস না খাওয়াই ভাল। এ সময় আর একটি অবাক কাণ্ড ঘটে তা হলো লেখক স্ত্রী নিজে একটি ট্রেতে কিছু খাবার নিয়ে আসেন কাজেম আলীর জন্যে। তার উদ্দেশ্য খাবার খেয়ে হয়তো লোকটি চলে যাবে। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন কাজেম আলী নামক লোকটি আটার রুটি ও গুর খাচ্ছে আর তার স্বামী তাকিয়ে থেকে তা দেখছে, তখন স্ত্রী অবাক হলেন, স্বামীকে বললেন সেকি আমিতো ওনার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি। লেখক স্বামী তখন বললেন, তোমার খাবারের অপেক্ষায় সারা পৃথিবী থেমে থাকে না তা এভাবে চোখের সামনে না দেখলে বোঝার উপায় থাকবে না। শুধু রাগ ও আশ্চর্য হওয়ার দৃষ্টি নিয়ে স্ত্রী স্বামীর দিকে তাকায়। হয়তো সে তাকানোয় প্রশ্ন ছিল কেনোনা লেখক তখন বলেন, জানিনা তবে মনে হয় উনি বলবেন যে, ওদের মত হাইল্যা-জাইল্যা লোকদের সাহেবদের বাড়িতে খেতে নেই। স্ত্রী কিছু বলেন না কারণ তার ধারণা হয় স্বামী নিজেও অজানা রাগের শিকার, তবুও স্বামীর পাশে বসেন। স্বামী টেবিলের উপরে রাখা কাজেম আলীর জন্য আনা খাবার থেকে খেতে শুরু করেন, তিনি জেনেই এ কাজ শুরু করেন ফলে স্ত্রী অধির প্রশ্নবোধক ও অর্থবহ চোখে স্বামীর চোখে দিকে তাকালে স্বামী তার উত্তরে স্ত্রীকে এমন ভাব দিলেন যে, তিনি জানেন এ খাবার গুলো পুরোনো, পতিত যা কাজেম আলীর জন্যে আনা হয়েছে এবং যা কোন ক্রমেই স্বামী আফসার হাসানের খাওয়া উচিৎ নয়। অতএব স্ত্রীও জেনে যান তার স্বামী ইচ্ছে করে ওই খাবার খাচ্ছে। এ রকম সময় স্ত্রীও অভিজ্ঞ হন যে কিভাবে কাজেম আলী নামক লোকটি ট্রেতে রাখা পানির গেলাস থেকে তার পেতলের গ্লাসে ঢেলে তার পরে পানি খাচ্ছেন। স্বামী জানে স্ত্রী এ দৃশ্য দেখে অবাক হচ্ছে তাই তার উদ্দেশ্যে স্বামী বলে, সাহেবদের গ্লাস নষ্ট হতে পারে বলে তার নিজস্ব গ্লাসে খাচ্ছে, যদিও এই গ্লাস নষ্ট হওয়ার কিছু নাই। শেষের অংশটা স্ত্রীকে লেখকের বলার কারণ তিনি জানেন যে কাজেম আলীর জন্যে যে গ্লাস আনা হয়েছে তাও পতিত ও নিম্ন বর্ণীয় মানুষের জন্যে। স্ত্রী বোধ হয় আর সহ্য করতে পারেন না, তিনি উঠে চলে যান। কাজেম আলীর আটার রুটি খাওয়া শেষ হয়, শেষ হয় লেখকেরও যা তিনি খাচ্ছিলেন সেই ট্রে থেকে। এরপর কাজেম আলী আবার শুরু করে, কত যে জিনিস পত্র রহম মিস্ত্রি ও তার স্ত্রী কদমবিবি সঙ্গে নিয়ে নেয় ঢাকায় ছেলের জন্যে। রস, রসের পিঠা, গুড়, নারকেল, তেল, আমের আচার, চিকন চাল, হেন কিছু নাই যা লওয়া হয় নাই। এমনকি নাতিনরে মাথায় রাইখ্যা তাবিজ তুমার মাদলি ও ত্যানা খাতা, হের কোন হিসাব নাই, বেহিসাব। লেখক আবসার হাসান এ কথা বুঝবার চেষ্টা করে যে, কত আবেগ সেই সব জিনিসপত্রের মধ্যে যা রহম মিস্ত্রি তার ছেলে, ছেলে বউ ও সম্ভাব্য নাতি বা

নাতনির জন্যে ঢাকা নিয়ে আসছেন।

কাজেম আলী আর একবার পানি খায়, পেতলের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে যেন এর আগে আর কখনো এমন গ্লাস সে দেখেনি যা অথচ নিজেরই। তুত দেয়া বেগুনি রঙ্গের পা থেকে ছোট গামছা খানা টেনে তুলে কপাল ও ঘারের ঘাম মোছে। যদিও যে ঘরটিতে সে বসে আছে এয়ার কন্ডিশনার চলছে বলে সেখানে কোনো গরম নাই । সে বিষয়টা কাজেম আলীর বোঝার কথা না, শুধু এক ফাঁকে বলে, বাইরের গরমডা আহমনাগো ঘরের মইদ্যে, হানতে পারে নায়।

আবসার হাসান অপেক্ষা করতে থাকে কাজেম আলী কখন তার গল্পের অবস্থান লঞ্চ থেকে ঢাকায় নিয়ে আসবে। তার এই অপেক্ষার পর-পরই কাজেম আলী যে কথাটি বলে, তা হলো তারা দু'খানা রিকশা নিয়ে অনেক 'মাল-সামানা' সহ সদরঘাট থেকে খবির মিয়ার বাসায় আসে। খবির মিয়ার বাসা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা দিতে কাজেম আলী ব্যর্থ হয় কিন্তু আবসার হাসান নানাভাবে প্রশ্ন করে যা ধারণা করতে সমর্থ হয় তাহলো খবির মিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ও ইকবাল হলের হাউস টিউটর ছিলেন। আর দিন ক্ষন ছিল ঊনিশ্‌শ একাত্তর সালের পচিশে মার্চের দু'একদিন আগে। খবিরের বাবা-মাকে ঢাকায় দিতে এসে কাজেম আলী পাশের গ্রামের কোন একজনের খিলগাওয়ের মেসে যায়। ধারনা করা যায় ওই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর কাজেম আলীর পরিস্কার কোন বোধ ছিলনা সেটা অবশ্য বোঝা যায় তার আগের একটি কথা থেকে। সেই কথাটা ছিল এই রকম যে, তারা গাও-গেরামের লোক 'দ্যাশ-ট্যাশ' কি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' কি এই সব অত কিছু তারা বোঝে না কেবল জয় বাংলা, নৌকা মার্কা ও শ্যাখ সাইব ছাড়া। কিন্তু যেই রাতে পাকিস্তানি মিলিটারিরা ঢাকায় 'লায়খে-লায়খে' লোক মেরে ফেলে ওই রাতগত দিনে বিকাল বেলায় সদর ঘাট থেকে তার লঞ্চ বরিশালের দিকে ছাড়বার কথা, সে গ্রামে ফিরে যাবে। কিন্তু অবস্থা যত খারাপই থাকুক খবির মেয়া, তার বাবা রহমমিস্ত্রি ও রহম মিস্ত্রির স্ত্রী কদমবিবিকে না বলে সে গ্রামের দেশে যায় কি করে।

আবসার হাসান তার উপন্যাসের উপাদান সমূহের এ পর্যায়ে উপলব্ধি করতে পারে যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন যন্ত্র চালিত এই ঘরে শরীরে ঘামের ভাপ অনুভূত হচ্ছে , অসম্ভব গরমে গায়ের ফতুয়া খুলে ফেলেন, ফতুয়া খুলবার আগে একবার মনে হয়েছিল কাজেম আলীকে অন্তত একটু বলে নেবেন। পরে মনে হলো এর কোন মানে দাড়াবে না অতএব কোন ভূমিকা ছাড়া আবসার হাসান তার গায়ের ফতুয়া খুলে দু'পা উঠিয়ে শক্ত হয়ে সোফার উপরে বসেন। যদিও ঐ রকম কথিত 'গ্রাম্য' নিয়মে বাসায় বসার ঘরের সোফার উপর তার বসবার অধিকার নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে কাজেম আলীর গল্পের মাত্রা এ পর্যায়ে পৌছাবার পর আর আবসার হাসানের সেই ভয় থাকে না।

কাজেম আলীর কণ্ঠ একটু একটু কাপে যখন সে বলতে থাকে, পাও থোয়ার জাগা নাই, লাশেরে লাশ, রক্তের বইন্যা, পরের দিন বিয়ান বেলা, খবির মিয়ার দুয়ারের

হোম্মে, সে থেমে আবার বলে, দুয়ারের হোবে অর্থাৎ দরজার সামনে বলবার পরে কাজেম আলীর থামবার কারন আবসার হাসান বোঝেন, সে কান্নার আবেক থামাতে চাওয়া। কিন্তু থামে কি, হাউ মাউ করে কাঁদে- ছার হে কতা কওনের না। মাথা নাড়ায়, আবসার হাসান সোফা থেকে উঠে কাছে গিয়ে কাজেম আলীর কাধে, পিঠের অংশের দিকে বাম হাত রাখে। সেই হাতে কাজেমের ঘামে ভেজা অমসৃন চামড়া অনুভূত হয়। লোনা কাদা মাখা ধরণের, তাতে কি, মানবিকতা পৃথিবী থেকে উঠে যায় নি, যাবেও না, আবসার হাসান বুঝে নেন- যেহেতু সে রাতে ইকবাল হলে কোন প্রাণই রক্ষা পায়নি অতএব কাজেম আলী দেখতে পেয়েছিল রহম মিস্ত্রি, খবির মিয়া ও তাদের স্ত্রীদ্বয় কদম বিবি ও ফৌজিয়া আক্তারের গুলিবিদ্ধ মৃত লাশ। অতএব আবসার হাসান কাজেম আলীর পিঠে হাত দিয়ে চাপর কাটেন আদর করে বলেন, ঠিক আছে আপনাকে আর বলতে হবে না, আমি বুঝে নেবো। আবসার হাসানের ওই কথা বলবার পরে কাজেম আলী স্ত্রীর চুল ঝাড়বার গামছাখানি মুখে চেপে ধরে মাথা নাড়াতে থাকে তা যেন আবসার হাসানের ওই কথার প্রেক্ষিতে অর্থাৎ লেখকের এই যে বুঝে নেবার প্রতিশ্রুতি সেই সীমানার পেছনেও যেন আরো কিছু থাকতে পারে আরো কিছু আছে যা হয়তো লেখক বুঝে নিতে পারবে না বলে কাজেম আলীর ধারনা।

ছার আহমনে যা মোনে হরছেন হেইডা না খালি। আবসার হাসান আর অন্য কিছুই ভাবতে পারে না, ভাববার কথাও নয়, দরকারও পরেনা কারণ কে না বোঝে যে সবাই নিহত। কাজেম আলী তার মুখমন্ডল থেকে গামছা সরিয়ে নাক টেনে পরিষ্কার করে, তখনও লেখক আবসার হাসানের আদরের হাতখানা কাজেমের কাধ নিব পিঠের উপর। অবাক করে দিয়ে অতি ঠান্ডা কণ্ঠে কাজেম আলী বলে ছার গুল্লি খাইয়া হেইয়ার ব্যাতায় মনে হয় খবির মেয়ার পরিবারের বাচ্চা অইয়া গ্যাছে। আবসার হাসানের অনিয়ন্ত্রণে কণ্ঠ থেকে শব্দ বেরিয়ে পড়লো 'কি' ? কাজেম আলীর পিঠ থেকে তার হাত সরে এলো, চুলসহ শরীরের লোমের উপর দিয়ে একটি ঝড় বয়ে যায়, সেই ঝড়ে লোমেরা যদি বৃক্ষ কি মাঠের ফসল হয় তা উপরে যায় ঝড়ের তীব্য বাতাসে, অজ্ঞাতেই লেখক আবসার হাসান নিয়ন্ত্রণহীন শব্দের কণ্ঠে আবার প্রশ্ন ,করেন কি বললেন ? কাজেম আলী আবার শ্বাসরুদ্ধকর হিক্কা তুলে বলল ছার একটা সোন্তানের জন্ম হইয়া ছিল, কইন্যা সোন্তান। আবসার হাসানের চিৎকার শুনে ভেতর থেকে স্ত্রী ও কাজের লোকেরা দৌড়ে এলে তিনি তাদের দিকে না তাকিয়েই সবাইকে ইশারায় চুপ থাকতে বলেন, দাড়ানো অবস্থা থেকে লেখক সোফায় এমন ভাবে ভেঙ্গে চুড়ে বসে পড়েন যেন সহসা লেখকের দেহ তরল হলে পরে তা গলে মাটিতে মিশে যেতে চায়। ছার কইন্যা সোন্তান, আমাগো গেরামের মাইয়া সোন্তান, হের ইজ্জত রাখতে নিজের গামছাহান দিয়া ঢাইক্যা দেলাম, মাইয়া জুহুততো। আবসার হাসানের কাঁদতে ইচ্ছে করছে উপন্যাসের নাটকীয় চরিত্রের মত। কাজেম আলী তার পোটলা গোছাতে গোছাতে অঝোরে কাঁদতে থাকে, ফোস ফোস শব্দে তা উপলদ্ধি করা যায়, পোটলার ভেতরে সেই পেতলের গেলাসও ঢুকায় বাইদানীর যাদুর পোটলা গোছাবার মত করে। ছার আহ্মনে মনে হরছেন কেস্সাহান শ্যাষ? সে লুঙ্গির পোটলায় চার কোনা মিলিয়ে গিট দিতে থাকে, না ছার আমাগো গেরামের মাইয়া হ্যার লাশ আমি হালাইয়া যাইতে পারিনা, গামছায় মোড়াইয়া হেই লাশ লইয়া সদর ঘাডের দিকে আডা দেই। লয়ক্ষে লয়ক্ষে মানু সদর ঘাডে, কয়জন কইলে, মেয়া তুমি পাগল তোমার বরিশাল যাইতে লাগবে হাতদিন, হের মইদ্যে লাশ পইচ্যা যাইবে, হের চাইতে বুড়িগঙ্গার নদীতে ভাসাইয়া দেও। মুই নিজে না, হেরাই ভাসাইয়া দেয়। ছার, ছার হে আমাগো কইন্যা সন্তান যার নাম রহম মিস্ত্রি রাখতে চাইল্হে সরোজীনী কদমবিবি। সরোজিনী অইল যাইয়া আবার ইন্দু দম্মেও মাইয়া, হের ছোট সময় যেই মাইয়ারে ভাল লাগজেলে। কাজেম আলী লেখক আবসার হাসানের বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে। আবসার হাসান জানে যে সে যেতে পারবে না লিফটে অতএব সেও পেছনে পেছনে বেরিয়ে পরে কিন্তু তার হাতে কাজেম আলীর প্লাস্টিকের জুতা জোড়া। তিনি বলেন আপনার জুতা ফেলে যাচ্ছেন। লিফটে উঠতে উঠতে কাজেম আলী বলে ছার জোতা মুই হালাইয় দিমু এহন, হেইদিন লাশ আর রক্তের মইদ্যে আটবার আগে জোতা হালাইয়া দেল্হাম। নীচের দারোয়ানদের মাথা খারাপ হওয়ার দশা এই দৃশ্য দেখে যে লেখক নিজে এই লোকটির পেছনে পেছনে তার জুতা হাতে গেটের কাছে চলে আসছে। গেটের কাছে দাড়িয়ে কাজেম আলী বলছে ছার মোরা গাও গেরামের মানু, মোগোর কান্দনডাও কুচ্ছিত, সে লেখকের হাত থেকে জুতাটা নিয়ে দেয়ালের পাশে ফেলে দেয়, তারপর ফুটপাতে বেরিয়ে পরে। লেখক অনুরোধ করতে থাকেন আপনি কি সদরঘাটে যাবেন আমার ড্রাইভার আপনাকে গাড়ি করে দিয়ে আসবে। কাজেম আলী কিছুই শোনেনা আবসার হাসান কি বলছে। ফুটপাত ধরে লেখক ওই কাজেম আলীর পেছনে হাটে, বাড়ির দারোয়ানরা তাজ্জব হয়ে তা দেখতে থাকে।

কাজেম আলী পেছনে না তাকিয়ে বলে ছার একটা কতা, সে ঘুরে দাড়ায়, বুড়িগঙ্গার গাংগে সরোজিনী কদমবিবির লাশ ভাসাইয়া দেওনের পর দ্যাশে যাইয়া ওই গামছা হানার কয়বর দেই, আমাগোর নোলকঝাড় গেরামে ওই কইন্যার কয়বর আছে। এটুকু বলে আবার কাজেম আলী হাটে, আচ্ছা বলে লেখক কাজেম আলীর পেছনে হাটা অব্যাহত রাখে, কেন যে লেখক তখন তার পেছনে হাটে তা সে জানেনা যেমন অনেক কিছুই সে জানেনা বলে তার বিভিন্ন উপন্যাসে লিখেছেন। কাজেম আলী আবার বলে ছার আছেন নাহি, আসল কতাডাই কওয়া অয় নায়, আবসার হাসান মুহূর্তে ভাবে এর মধ্যে কি আবার আসল কথা বাদ থাকতে পারে? কাজেম আলী তার হাটা না থামিয়ে পেছনে না ফিরে বলে ছার ওই কইন্যা সন্তান কিন্তু জেবন্ত জোন্মাইছিল, হের আঙ্গুল মুখের ভেতরে আছেল যহন আমি হ্যারে পাই, কিন্তু মিরতো, মরা, পরান নাই। আবসার হাসান শোনে কিন্তু যা শোনে তা বিশ্বাস করতে পারে কিনা বোঝা যায়না; আর কাজেম আলী মিরতো কথাটার বলার পর থামে ও দাড়ায়, ঘুরে সোজা লেখকের দিকে তাকায়, লেখক উপলদ্ধি করেন এই দীর্ঘ আলোচনায় কাজেম আলী কখনো তার চোখের দিকে

তাকায়নি, এই প্রথম, সেই চোখ এখন এক অদ্ভুত গভীরতায় পতিত চোখ, পলকহীন সেই চোখের গভীরতা নিয়ে কাজেম আলী আবার বলে, মরা, পরান নাই।

লেখক আর কাজেম আলীর পেছনে হাটতে পারে না। দারোয়ানরা দ্যাখে লেখক আবসার হাসান রাস্তায় আলগা পায়ের উপর, দু'হাটুতে কনুইয়ের পেছনে ভর রেখে কনুই ভাঙ্গা হাত দু'টো মাথার দু'পাশ ধরে বসে পরে, লোকটি হেটে সামনে যায়, স্বভাবতই কিছুক্ষনের মধ্যে হেড দারোয়ান এসে বলে ছার আপনার শরীর খারাপ ? বাসায় চলেন।

কাজেম আলীকে নিয়ে এরপরও লেখকের দিক থেকে অনেক কিছুই আছে। কিন্তু প্রধান কথা হচ্ছে আমেরিকাতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের ভেতরে এমন একটি মৌখিক গল্প লেখক বলেছিলেন নিউইর্কে আর এক মফস্বলীয় কলাম ল্যাখকের দোতালা বাসভবনের উচু সোফায় বসে ইলিশ মাছ, মাগুর মাছ, কৈ, গরুর মাংশ, খাশী, হালাল চিকেন, ঘন ডাল, গুড়া মাছ ও ইত্যাদি সব দিয়ে খেতে-খেতে। কথিত আছে খাবার শেষে কলাম ল্যাখক তিন ধরনের জুস- আপেল, কমলা ও আঙ্গুর রস পরিবেশন করেছিল কেননা গর্বিত "বাঙ্গালী ধর্মপ্রান অসাম্প্রদায়িক মুসলমান" হিসেবে সেখানে অন্যকোনো ধরনের বেহেস্তী রস নিষিদ্ধ বা নাজায়েজ ছিল। আরো শোনা যায় কেউ একজন নাকি 'লেখক' আবসার হাসানের কাছে কাজেম আলীর পরিনতির কথা জিজ্ঞেসও করেছিলো কিন্তু 'লেখক' মানুষ গল্পের পরে অন্য কিছুর প্রতি আগ্রহ থাকা লেখক প্রথা বিরোধী এমন ইঙ্গিত করা হয় তার পক্ষ থেকে, তাছাড়া যে মফস্বলীয় লেখক এই খানা-পিনার আয়োজন করেছে তার কলামেও নাকি লেখকের খাদ্য তালিকা ও অন্যান্য সব এমনকি 'কবি গুরু'র থেকে পঠিত 'আমাদের ছোটো নদী' ' দ্যাশ মিস্ করার গানা বাদ্য' যাকে তারা 'দ্যাশপ্রেম' বলে তার সব কিছুই স্থান পেলেও ঢাকায় ছাপা হওয়া ওই কলাম ল্যাখক কাজেম আলীর গল্প বা নাম স্থান দেয়নি, ব্যাখ্যায় এই বিষয়েও কলাম ল্যাখক নাকি তার গোট বন্ধু পারিষদদের বলেন হেলে-চাষার কথা নিয়ে লেখালেখি করলে বাংলা সাহিত্যে এমন কোন লাভ নেই, তাতে বিউটিটা নষ্ট হয়ে যায়, ইত্যাদি এই জাতীয় কথা-বার্তা তাদের মধ্যে চলতে থাকে যা সাধারনতঃ প্রবাসী বিজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী সমাজে হয়ে থাকে।

ফুলের নাম কারনেজ

আবদুন নূর

মেয়েটি শুধু খিলিখিলিয়ে হাসতেই জানে।

অভিনয় শেখেনি। অথচ অভিনয়ে নেমেছে। সারাটা সেট বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। এক গোছা কারনেশন হাতের মাঝে সুন্দর করে ধরবে। তাই পারছে না। সকাল থেকে চেষ্টা চলছে। বারে বারে ক্যামেরা রোল করছে। চক্কর চক্কর আওয়াজ ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিককে ছেপে উঠছে।

কয়েকটি মুখ উন্মুখ হয়ে আশা করছে। এবারের টেক শেষ টেক হবে। ঠিক তখুনি ফিল্ম ডাইরেক্টর মাইকেল ওয়ার্ডসেরের বিরক্তি ভরা গলা।

'কাট। কাট। লেটস ট্রাই এ্যাগেইন, সুসানা। ফুলগুলো তুমি মোটেই সুন্দর করে ধরতে পারছো না। মোটেই গ্রেস নেই। কাল রাতে ডেটে গিয়ে সব গ্রেস কী ওঁকেই সঁপে দিয়ে এলে?'

অনাবিল হাসিতে ঝালমলিয়ে উঠে সুসানা।

'আই এ্যাম স্যরি মাইকেল। বারে বারে আমি তোমাকে ফেইল করছি। এটা আমাকে পারতেই হবে।'

'মাগী আর পারবে?' রাশেদ মনে মনে বলে। 'সেই ভোর থেকেই তো চেষ্টা করে চলছে। বার সাতেক তো হলো? ওকে কী কেউ কখনো ফুল উপহার দেয়নি। শুধু স্কার্ট ছোট করে হাঁটুর উপরে পড়তেই শিখেছো'।

ন্যুয়র্কে বিকেলে ক্লাস রয়েছে। সন্ধ্যা থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত গ্রোসারী তুলতে হবে জ্যাকসনে হরদয়ালের দোকানে। নিউজার্সী থেকে ন্যুয়র্কে ফিরতে ট্রেনে কমপক্ষে দু'ঘন্টা লাগবে। দুপুর বারোটায় শেষ হয়ে যাওয়ার কথা শ্যুটিং। এখন দেড়টা বাজছে। ক্লাস মিস হবে। সেটা না হয় প্রফেসর হ্যারিসন ফোর্ডকে বোঝানো যাবে। তার কথাতেই তো শ্যুটিংয়ে এসেছে। কিন্তু মুদী দোকানের চাকুরিটা? ভাত খাবে কি করে? পকেটে মাত্র রয়েছে পঞ্চাশ ডলার। আজ যদি কিছু ডলার কামানো যায়। দশ পনেরো ডলার পাবার কথা। দিন চুক্তি না হয়ে ঘন্টাচুক্তি হলে ভালো ছিলো। কিন্তু প্রফেসার ফোর্ডের ওপরে কথা বলা যায় না। ও যা বলবে তা-ই শুনতে হবে।

সেই কাকডাকা ভোরে এ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়েছে রাশেদ, এক কাপ চা খেয়ে। সকালে কিছু মুখে দিতে পারে না রাশেদ। পেট গুলিয়ে ওঠে। সেই নিয়ে মায়ের কত

অনুযোগ। কত অভিমান। মা আজ কোথায়। সাঁইত্রিশ দিন হয়ে গেলো মায়ের চিঠি পায়নি। আজ ঘরে ফিরে পাবে কি?

'লেন্স ঘোলটে হয়েছে রাশেদ। দেখতো ক্লিন করা যায় কিনা।' ক্যামেরায় চোখ রেখে মাইকেল ওয়ার্ডস অনুরোধ করে। 'পারবে কি?'

বিনয়ের অবতার যেন সে। পারবে না কেন রাশেদ। ওর ফাইফরমাস খাটতেই তো এসেছে সে। এতো বড়ো নাম করা ডাইরেক্টর। দুনিয়া জোরা নাম। ওর সাথে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে, শিখতে পারছে, এটাই কি কম বড়ো কথা। প্রফেসার ফোর্ডের বন্ধু বলেই তো জুটলো সুযোগ।

'অবশ্যই পারবো।' রাশেদ বলে। 'বাইরে বেশ কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। হয়তো বালু পড়েছে।'

'আমি এর মাঝে দেখি সুসানার কি হলো। মেয়েটি কেন মোটেই ধরতে পারছে না। এতো সহজ সীন টা। বারে বারে ফেইল করছে।'

আর পারবে! মনে মনে বলে রাশেদ। কত কথা বলতে হবে। অতো নরোম নরোম কথায় ভাত ভেজে না।

উঁচু টুলে উঠে ক্যামেরায় চোখ রাখে রাশেদ। সত্যি ধোঁয়াটে লাগছে। মনে হয় যেন আগুন জ্বলছে কোথাও। সে ধোঁয়া লেন্সে লেপ্টে রয়েছে।

'কফি দেবো তোমাকে রাশেদ?' ক্যামেরাম্যান কার্ক জিজ্ঞেস করে।

'নো থ্যাঙ্কস। সকাল থেকেই কয়েক কাপ খেয়েছি। পেট গুলিয়ে উঠছে।'

'মনে হয় লাঞ্চ ব্রেক আর হবে না। ভুল হয়েছে। কিছু ডোনাট নিয়ে এলে হতো। এই বাগান বাড়ির ধারে কাছে কোন রেঁস্তোরা নেই যে চট করে কিছু খাবার খেয়ে আসবো। এমন কিছু আহামরি বাগানবাড়ি নয় যে ন্যুয়র্ক থেকে একশো মাইল ড্রাইভ করে আসতে হবে।' কার্ক ক্ষোভের সাথে বলে।

'রোদ চড়া হয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে গলে পড়েছে। সে জন্য আবছা মনে হয়। ফিল্টার দিয়ে দিই তবে।' রাশেদ বলে।

'তামাটে দেখাবে সুসানাকে।' কার্ক হাসে। 'টেক ঠিকমতো না হওয়া পর্যন্ত ব্রেক নেবে না মাইবেল। ভারী খুঁত খুঁতে ও। দশ বছর ধরে কাজ করছি আমি ওর সাথে। এক নাগাড়ে কাজ করে যাবে। খিদে টিদে পায় না মাইকেলের।'

দেশে থাকতে রাশেদেরও কি খিদে পেতো? ক্যানভাসে আঁকা নিয়ে রাতের পর রাত পরে থাকতো। সেই নিয়ে মার কতো অনুযোগ। কতো কান্না। অভিমান। মা এখন কোথায়? এবারে চিঠি লিখতে এতো দেরি হচ্ছে কেন? প্রতি শুক্রবার নামাজের পরে চিঠি লিখতে বসেন মা। আজকেও কি এমন বসছেন চিঠি লিখতে।

শেষ চিঠিতে ভারী চিন্তা ছিলো মায়ের। আব্বার শরীর বেশি ভালো নয়। পুরোন

কাশিটা আবার ধরেছে। প্রায়ই খক্ খক্ করে কাশেন। আজকাল মেজাজও করেন বেশ। কণাকে নিয়ে ভারী দুশ্চিন্তা তাঁর। পাঁচ মাস ধরে কলেজ বন্ধ। ঘরে রয়েছে। পাড়া যেন দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে। বাড়ির সামনে দিয়ে বাজে ছেলেদের আনাগোনা বেড়েছে। ফিল্মী গান গেয়ে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বেপরোয়া ঘুরে বেড়ায়। সেদিন একটি চিঠিও দলা পাকিয়ে ছুঁড়েছিলো। কণার হাতে পড়েনি। সেই চিঠি পড়ে আরো রাগ বাবার। ছোট ভাই পটল নাইনে উঠেছে। তারও ক্লাস বন্ধ। সেও নাকি ওই দলে মাঝে মাঝে যায় সিগারেট খেতে। মা লিখেছেন।

'খোকন, তুই যাওয়ার পর থেকে ঘর থেকে যেন শান্তি উড়ে গেছে। কবে তুই আবার মায়ের কোলে ফিরে আসবি খোকন।'

কত দিন হলো দেশ ছেড়েছে রাশেদ। লম্বা ছয়মাস। আরো কতোদিন থাকতে হবে এদেশে কে জানে।

'নাহ রাশেদ। আরো লাইট ফিল্টার দাও। নয় বেশ ডার্ক দেখাবে সুসানকে।' কার্ক ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে পরখ করে।

ফিদেল ক্রাস্তোর দেশ কিউবার মেয়ে সুসানা। মিশ্র রক্তের। গায়ের রং ধবধবে শাদা নয়। বরং হলুদ সোনার মিশ্র রং। চুল কালো নয়। ফিকে হলদে। মুলাতো ডাকে ওদের। ল্যাটিন সমাজের সাংস্কৃতিক গণ্ডিতে ওদেরই প্রাধান্য। হাবানায় নাকি থিয়েটারে অভিনয় করতো। একটা ট্যুর গ্রুপের সাথে ন্যুয়র্কে নাটক করতে এসে থেকেই গেছে। ফিল্মে প্রথম সুযোগ দিলো মাইবেল ওয়ার্ডস। সামান্য সহনায়িকার রোল। সেটিই মেয়েটি ফেলছে গুলিয়ে।

সীনটি অতি সাধারণ, আউটডোর শ্যুটিংয়ের জন্যে। বড়ো লোকের বাগান বাড়ি। ফুলের সমারোহ। ফুল কেটে আনমনে পেভ্ড পথে ধীর পায়ে ফিরবে সুসানা। পিছন থেকে লুকিয়ে এসে একগোছা রক্তলাল কারনেশন ওকে এগিয়ে দেবে নায়ক জ্যাকসন। ক্ষণিকের জন্য বিব্রত হবে সুসানা। দ্বিধা আসবে। জ্যাকসন যে ধনী মালিকের বড়ো ছেলে। সুসানা ওদের বাগানবাড়ির হাউস মেইড। অবশেষে মৃদু হেসে ফুলের গোছাটি বুকের কাছে ধরে নিয়ে, ধীর পায়েই ফিরে যাবে সুসানা ওর ঘরে। কিন্তু সুসানা না পারছে বিব্রত হতে, না পারছে হাসতে, না পারছে সযতনে ফুলের গোছা ধরতে। একটি হলে আরেকটি হয় না। এমনি অকর্মা মেয়ে সে।

'ফিল্টার এনেছি মাত্র দুটো। অন্যটি এর চেয়ে বেশি ডার্ক।' রাশেদ বলে। 'দেবো বদলে?'

'মাইকেল দেখে নিক। ওর নায়িকা। ওই বুঝুক।' কার্ক বলে। 'মাইকেল ল্যুক থ্রু হিয়ার।'

মাইকেল চোখ রাখে ক্যামেরায়।

'স্পেলনডিড। ইউ হ্যাভ এ গ্রেট সেন্স অব স্পেস এ্যান্ড টাইম। চমৎকার ফ্রেম

কেরেছো সীনটি।' খুশী হয়ে বলে মাইকেল।

কথাটি আরেকজনও বলেছিলো। রাশেদের জীবনে মোড় ঘুরে গেলো সেই কথাতেই।

দশ দিনের জন্যে ঢাকায় এসেছিলেন প্রফেসর হ্যারিসন ফোর্ড। মার্কিন সরকারের অনুরোধে। দেখতে সিনেমাটোগ্রাফীর কোর্স খোলা যায় কি না আর্ট ইনস্টিটিউটে। প্রমিজ থাকলেও ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ পিছিয়ে রয়েছে।

সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছিলেন ফোর্ড আর্ট ইনস্টিটিউটে। কী সুন্দর তাঁর কথা বলার ধরণ। ধীরে স্পষ্ট উচ্চারিত তাঁর প্রতিটি কথা। কী উজ্জ্বল তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গি। মুগ্ধ রাশেদ পটাপট ছবি তুলেছে। বংশালের কাছে ডডসে গিয়ে এনলার্জ করিয়েছে। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে।

এনেছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ওকে উপহার দেবে বলে। কিন্তু ডাকতে হলো না। লবিতেই দেখা হয়ে গেলো প্রফেসরের সাথে। সে তখন এয়ারপোর্টে যাওয়ার মুখে। গাড়ি এসে গেছে। বেলবয় সুটকেস তুলছে। কি বলবে সে? রাশেদের দ্বিধা হলো। থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু প্রফেসর ফোর্ড যেনো চিনতে পারলেন তাকে।

'তুমি কি আমার কাছেই এসেছো?'

'তোমার কয়েকটি ছবি আমি এনেছি।' রাশেদ দুর্বল গলায় বলেছে 'যদি দেখতে চাও।'

'অবশ্যই।' হাত তুলে ঘড়ির দিকে দ্যাখে ফোর্ড। 'এখনো দশ মিনিট সময় আমার আছে।'

খয়েরী রংয়ের বড়ো ছবির এনভেলাপ এগিয়ে দেয় রাশেদ।

ফোর্ড একটির পর একটি বের করে দেখে। কোন কথা বলে না। অদম্য আগ্রহে তাকিয়ে থাকে রাশেদ। অবশেষে অতি ধীরে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই যেন বলে ফোর্ড।

'স্পেলনডিড। হোয়াট এ গ্রেট সেন্স অব টাইম এন্ড স্পেস। দিজ বয় হ্যাজ প্রমিজ।'

হেসে তাকায় রাশেদের দিকে।

'কি করো তুমি? জার্নালিস্ট। সাংবাদিক? সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার?'

'কিছুই না। দেশে এখন ছয়দফার আন্দোলন। সব বন্ধ। গ্রাফিকসে মাস্টার্স করেছি। কিন্তু দেশে না আছে ব্যবসা, না আছে বিজ্ঞাপন। না আছে চাকুরি। বেকার ঘুরে বেড়াই। পোস্টার আঁকি। মিছিল করি।'

'আর ছবি তোল?'

'সেটা শুধু সখ। তোমাদের মতো নামী দামী কেউ এলে। ফিল্মের যা দাম।'

'ক্যামেরাটি তোমার?'

'না বাবার ছিলো। আরগাস। দেখো। আমি যখন খুব ছোট, ছয় কী সাত বছরের তখন বাবা গিয়েছিলো তোমাদের দেশে। ভিজিটর হয়ে। নাইন্টিন ফিফটিসিক্স হবে। সেই সময়ের কেনা। এ্যাদ্দিন মা লুকিয়ে রেখেছিলেন স্টীলের আলমারিতে। আমি খোঁজ পেয়ে বের করে আনলাম। উনি কি দেবেন বাবার জিনিস। আর বাবাতো সব ভুলেই বসে আছেন। আমার জন্যে নাকি কিনেছিলেন। আমায় বড়ো হলে দেবেন। যাক অবশেষে পেলাম।'

'আমি কি নিতে পারি? আমার যাবার সময় হয়ে এলো।'

'পুরনো এই ক্যামেরা নিয়ে তুমি কি করবে?' রাশেদের অবাক প্রশ্ন।

'না না আমার ছবিগুলো। কী সুন্দর হয়েছে। আসছে মাসে আমাদের বিয়ের এ্যানিভার্সারী। পঁচিশতম। ডিসেম্বর থার্টি/নাইন্টিন সেভেন্টি। ভাবছিলাম কি দেবো ওকে। একটি সোনার নেকলেস কিনেছি। এখন তার থেকে দামী হবে তোমার এই পোর্ট্রেট। মে আই হ্যাভ দোজ?'

'তোমার জন্যই তো তুলেছি। নিয়ে যাও।'

'কিন্তু কত টাকা দেবো তোমাকে? ইউর এক্সপেন্সেস।'

'না না মোটেই নয়।' রাশেদ বলে। 'আমি সখে তুলেছি। খরচ পেতে নয়। তোমাকে প্রেজেন্ট করতে।'

'তুমি কি আমেরিকায় বেড়াতে আসবে?' হঠাৎ প্রশ্ন করে অধ্যাপক।

হকচকিয়ে যায় রাশেদ।

'বেড়াতে যাওয়ার ক্ষমতা কোথায় আমাদের। পড়ার সুযোগ পেলে, স্কলারশীপ হলে, তবেই না যেতে পারি।'

'আমি চেষ্টা করবো। তোমার ঠিকানাটা দাও। তোমার বাবা কি তোমার যাওয়ার টিকেট কেটে দিতে পারবেন?' পকেট হাতড়ায় প্রফেসার ফোর্ড। 'নাও হোটেলের ন্যাপকিনটার ওপরই লেখো।'

সযতনে ঠিকানাটা লিখে দিয়েছে রাশেদ।

'ইউ উউল হিয়ার ফ্রম মি রাশেদ।' হেসে হোটেলের লবির বাইরে এসে গাড়িতে চড়েছে ফোর্ড।

'বাইই।'

রাস্তায় তখন মিছিল নেমেছে। এবারের সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ইয়াহিয়া খান, নিপাত যাও, নিপাত যাও।

ঝোলা ব্যাগের মাঝ থেকে ক্যামেরা বের করে রাশেদ। মিছিলে সামিল হয়ে যায়। এখন সময়ের স্বাক্ষর তুলবে রাশেদ।

‘এবারে তুমি নিশ্চয়ই পারবে সুসানা। জাস্ট হ্যাভ কনফিডেন্স।’ মাইকেল অনুনয় করে।

হেসে ভেঙ্গে পড়ে সুসানা।

‘আমার বাবা বলতেন সেটিই আমার সবচেয়ে বেশী।’

রাশেদ স্ক্রীপটি এগিয়ে নেয়। সে জন্যই শিখতে পারছো না। গোঁ ধরে বসে আছো।

‘তোমাকে ডায়লগ কি আবার শেনাবো?’ রাশেদ সুসানকে জিজ্ঞেস করে।

‘নো নো। সীনটি আগে তোমাদের মনের মতো শেষ করে নিই।’ মাথা বাঁকিয়ে নরোম গলায় বলে সুসানা। ‘একটু দাঁড়াও।’

চুলগুলো ব্রাশ করে সুসানা। মাথা নিচে হেলিয়ে দেয় সুসানা। বেশ লম্বা কোমর ছুঁয়ে নেমেছে সোনা হলুদ রঙের চুল।

সে সময়ে আর ঘরে ফেরা হয়ে উঠে না। খাওয়া দাওয়ার পাটও সে সময়ে যেন চুকে গেছে। সারাদিন ধরে মিছিল করো। সারারাত ধরে পোস্টার আঁকো। সময় এসেছে। ছিনিয়ে আনতে হবে প্রতিটি বাঙালির অধিকার। সহযোগ নয়। সময় এসেছে অসহযোগের। রাশেদ কি আর ঘরে ফিরতে পারে?

শাহানার সাথে হঠাৎ করেই দেখা। নিউ মার্কেটে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। মিরপুরে পল্লবীতে যাবে। ডাবল ডেকার। গুলিস্তান থেকে আসে। প্রায় সময়ই ভর্তি থাকে। রাশেদ ধানমণ্ডি বত্রিশ নম্বর থেকে ফিরছিলো ইকবাল হলে। তিনজনে এক রিকশায়। শাহানাকে দেখতে পেয়ে নেমে এলো।

‘বাসায় যাবেন নাকি রাশেদ ভাই?’ খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করে শাহানা। ‘একসাথে না হয় বাসে দাঁড়াবো।’

‘না তোমায় দেখতে পেয়ে নেমে এলাম।’ রাশেদ বলে। ‘ভালো আছো তুমি?’

‘আছি।’ শাহানা বলে। ‘কিন্তু বাবা ভালো নেই। পেটের ব্যথা বেড়েছে। ডাক্তার বলেছে পেপটিক আলসার। ওষুধ নিতে এলাম নিউমার্কেটে। ভালোই হলো। দেখা হয়ে গেলো আপনার সাথে।’

‘তুমি একা এলে এতো দূরে? জানো না দিনকাল ভালো নয়। পাকিস্তানী সোলজারগুলো সব যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ওদের ব্যবহার ভালো নয়।’

‘মা তো আসতে দিতে চায়নি। কিন্তু কি করবো। ওষুধ তো আনতে হবে।’

‘বাবলু পারলো না আনতে? ও কোথায়?’

‘ওকে কি আপনি জানেন না রাশেদ ভাই?’ অসহায় কণ্ঠে শাহানা বলে।

সত্যি বখাটে হয়ে গেছে শাহানার ভাইটি। বাবা স্কুলের হেড মাস্টার। কী নামডাক তাঁর। অথচ ওর ছেলে বছরের পর বছর ক্লাসে ফেল মারছে। পাড়ায় গেঞ্জী গায়ে ঘুরে বেড়ায়। মাস্তান হয়েছে। গুন্ডামী করে। একদিন ওদের দু'জনকে পাশাপাশি মিরপুরের বাস থেকে ফিরতে দেখতে পেয়ে সরাসরি সামনে এসেছে।

‘আপা কিন্তু খুব সহজ সরল মেয়ে। ওকে কিন্তু কখনো ভুল আশা দেবেন না রাশেদ ভাই।’

লজ্জায় কোন কথা বলতে পারেনি শাহানা। ছুটে ঘরে ফিরে গেছে।

‘খালাম্মার সাথে কথা হলো।’ শাহানা কথা ঘুরিয়ে বলে। ‘আপনি নাকি মাসের পর মাস ঘরে ফিরছেন না।’

‘মার কথা ওরকমই।’ রাশেদ বলে। কাজ নেই আমার? দিন পনেরো হয়তো বাসায় যাওয়া হয়নি।’

‘আন্দোলন সেতো চলবেই। তাই বলে কি ঘরে একেবারেই যাবেন না? মিরপুর আর কতদূর আপনার হল থেকে। চলুন এখন।’

কথাটা ফেলতে পারেনি শাহানার। বাসে দুজনে চড়ে বসেছিলো। সেই কি শেষ দেখা শাহানার সাথে? না। শেষ কথা দুজনের মাঝে। শাহানা আজ এখন কোথায় কে জানে।

চিংড়ী মাছ আর লাউ দিয়ে গরোম ভাত বেড়ে দিয়েছিলো মা।

‘ভীষণ শুকিয়ে গেছিস খোকন। সবাই তো মাঝে মাঝে হল থেকে এসে খেয়ে যায়। তুই আসিস না কেন?’

কণা আসে।

‘ভাইয়া তুমি নাকি দেয়ালের সব পোস্টারগুলো আঁকছো। আমার বন্ধুরা বলছিলো ভারী সুন্দর হয়েছে। কি বলিষ্ঠ তোমার কথাগুলো, কি উজ্জ্বল তোমার ব্রাশের আঁচর।’

‘দেখেছিস তুই?’ খুশীতে জানতে চায় রাশেদ। ‘আমার একুশের পোস্টার?’

‘সুযোগ হলো কই? অভিমানে গলা ফুলোয় কণা।’ মা আমায় ঘর থেকে বেরুতেই দেয় না। কালকের মিছিলে আমি যাবোই।’

‘কোন দরকার নেই।’ ক্ষোভে মা বলে। ‘এক ছেলে দেশের আন্দোলন করছে এই যথেষ্ট। মুজিবের ডাকে কি সারা সংসার আমরা ভাসিয়ে দেবো।’

‘দরকার হলে দেবে মা।’ কঠোর গলায় বলেছে রাশেদ। ‘সময় এসেছে। সময়ের সুযোগ নিতে হবে। কণা, তুই আজ আমার সাথে যাবি।’

‘কোন দরকার নেই। মা নিষেধ করে দিয়েছে।’ তুই দুপুরে ঘুমিয়ে বিকেলে ফিরবি। কণাকে যেতে হবে না।’

সেই বিকেলেই এলো চিঠি।

'আই এ্যাম রেডি। ডায়ালগটি আমাকে আবার বলবে রাশেদ।' সুসানা মিষ্টি গলায় বলে।

'নো। নো। আগে সীন শেষ করো। পরে ডায়ালগ থ্রো করবে।' মাইকেল বলে 'দরকার হলে ডাব্ করে নেবো। রোল দ্য ক্যামেরা।'

কার্ক টুলে উঠে পড়ে। রাশেদ পিছু হয়ে দেখে। না এবারেও পারবে না মেয়েটি। হয়েছে কি? কাল রাতে কী খুব ড্রিংক করেছে?

বাবাই খুলেছিলেন চিঠিটি। অফিস থেকে ফিরছিলেন। পিয়ন তাঁর হাতেই দিলো। বিদেশের চিঠি।

আমন্ত্রণ জানিয়েছেন হ্যারিসন ফোর্ড। ওর কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা পাকা হয়েছে। কোন টিউশন ফি দিতে হবে না। খাওয়া দাওয়ার খরচের জন্যে এ্যাসিসটেন্টশীপ এখনো পাওয়া যায়নি। তবে খুচরো কাজের সুযোগ প্রচুর হবে এখানে। এগারোই জানুয়ারি ১৯৭১ সময়সীমা। তার আগেই ভর্তি হতে হবে ওকে।

ক্যালেন্ডারে তাকালেন বাবা। ষোলই ডিসেম্বর ১৯৭০।

'সুযোগ জীবনে সেধে আসে একবারই রাশেদ। ইউ মাস্ট গো।' ধীরে ধীরে বললেন বাবা।

রাতে শুনেছিলো মায়ের কান্নাভেজা অনুযোগ বাবার কাছে।

'চিনি না, জানিনা, এক হুজুগে চিঠিতে ছেলেকে কেন বিদেশে পাঠিয়ে দেবে? ঘর ছাড়া করবে।'

'জোহারা, দেশে সময় এসেছে ছেলে হারাবার।' বেদনা মিশিয়ে আব্বা বলেছেন। 'বিদেশে গেলে তো তবু কোনদিন না কোনদিন তোমার ছেলে ঘরে ফিরবে। হারাবে না।'

এরপর মাত্র এগারোদিন দেশে ছিলো। ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ সাল দেশের মাটি ছাড়লো রাশেদ। সে সময় যে কোথায় দিয়ে চলে গেলো। শাহানার সাথে কথা বলার সুযোগ হলো না। সন্ধ্যায় বিদায় নেয়ার সময় ওর মায়ের সাথে এসেছিলো। লম্বা কালো চুলে বারে বারে অস্থির আঙ্গুল দিয়ে বিলি করছিলো। যাওয়ার বেলা শুধু একবার চোখ তুলে তাকিয়েছিলো। ওর চোখে কি তখন লুকিয়েছিলো কান্না?

শাহানা এখন কোথায়? ওকে চিঠি লিখতেও পারেনি। ঠিকানা ওর রাশেদ নিয়ে আসেনি। লিখলেও কি পেতো শাহানা? বাবলু কি সেই চিঠি দিতো শাহানাকে? কি জানি।

'ক্যামেরাটা কি ধরবে রাশেদ?' মাইকেল জানতে চায়। 'কার্কের ভীষণ খিদে পেয়েছ। ও পিজ্জা খেতে যেতে চায়।'

'আজকে তুমি সন্ধ্যা কাবার করে দেবে।' কার্ক বলে। 'আমি সবার জন্যে পিজ্জা নিয়ে আসবো।'

'আমার খিদে পায়নি। তবে রাশেদ, তুমি হয়তো ক্ষুধার্ত। তোমাকে কি সন্ধ্যায় ফিরতেই হবে?' মাইকেল জানতে চায়। 'দরকার হলে রাতটা আমরা না হয় এ বাড়িতেই কাটিয়ে দেবো। দুদিনের জন্যে ভাড়া দেয়া আছে।'

'আমার নাইট শিফটে কাজ ছিলো' রাশেদ ধীরে বলে। 'ফোন করে জানালে ও শুনবে কিনা জানি না।'

'উই শ্যাল ট্রাই এগেইন। না পারলে সাতটার ট্রেনে তোমাকে তুলে দেবো। বাট ইউ মে নট নিড টু স্টে দ্যাট লংগ।'

ঘড়ি দেখে রাশেদ। আড়াইটা বাজে।

সময় বেঁধে দিয়েছিলেন হ্যারিসন ফোর্ড। দুটো বেজে তিরিশ মিনিটে। ওর কলেজে, প্রতি শুক্রবার দেখা করবে।

সেখানেই প্রথম খবর পেয়েছিলো। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানারে লেখা–জেনোসাইড। পাকিস্তান ও ইসলামের নামে শুরু হয়েছে জেনোসাইড। পঁচিশে মার্চে রাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাকিস্তানী সৈনিকরা পূর্ব পাকিস্তানে।

রি রি করে উঠেছে রাশেদের রক্ত। ক্ষোভে। দুঃখে। আতংকে। লজ্জায়।

সেই থেকে নিয়মিত দেশের খবর পায় রাশেদ প্রফেসর ফোর্ডের কাছে। সারা সপ্তাহের নিউজগুলো সযতনে ক্লিপ করে রাখেন তিনি। রাশেদকে দেয়ার জন্যে।

নিজেই খবর দিলেন আরেক দিন। তুমি এখন অন্য এক রাষ্ট্রের নাগরিক। সতেরোই এপ্রিল, একাত্তর। স্বাধীন বাংলার নাগরিক হয়েছো তুমি।

শিহরিত হয়েছে রাশেদ। আনন্দে। গর্বে।

আজকেও গেলে দেশের খবর পেতো। হলো না মাগীর জন্যে। দু'লাইনের ডায়ালগ। তাও শেষ করতে সারাদিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

'আমাদের সীনটা বদলে দিলে হয় না?' নায়কও ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছে। 'সুসানা বিব্রত হতে পারছে না। ওটা বাদ দিয়ে দাও। বরং দেখাও সুসানা বাগানে অপেক্ষা করছিলো। প্রতীক্ষা করছিলো। লেটস এ্যাডাপ্ট।'

'সেটা হতে পারে না। ফিকশনে নেই। আই মাস্ট বি ট্রু টু মাই রাইটার। সুসানাকে

পারতেই হবে। শী মাস্ট।' প্রচ্ছন্ন রয়েছে মাইকেলের গলায় বিরক্তি। সেও ধৈর্য হারিয়েছে।

মার্কিন সরকারের ধৈর্য্য হারানোর সময় কি এখনো হয়নি? সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেছিলো, একটি জাতির প্রতি, একটি দেশের প্রতি চলছে সিলেকটিভ জোনোসাইড। অথচ মার্কিন সরকার রয়েছে চুপ হয়ে। শুধু ধীর হয়ে দেখবে বিরতিহীন অত্যাচার।

আরো কয়েক সপ্তাহ পরে সম্পাদকীয় বেরিয়েছিলো কাগজে। যতনে রেখেছে রাশেদ। প্রতিহত করতে শিখেছে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনী। কামান আর বারুদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বর্শা আর দা নিয়ে।

বারে বারে খবরটি পড়েছে রাশেদ। দেশে থাকলে সেও কি বর্শা নিয়ে এগিয়ে যেতো? না কাপুরষের মতো ভয়ে লুকিয়ে থাকতো।

'লেটস টেক এ ব্রেক।' মাইকেল বলে। 'কার্ক ফিরে এসেছে। ওর পিজ্জাগুলো বেশ লোভনীয় মনে হচ্ছে।' ক্ষুধার্ত নিশ্চয়ই কার্ক। কয়েক বাক্স পিজ্জা নিয়ে এসেছে। আর কোক। সবাই গোল হয়ে বসে গেলো খেতে।

রাশেদের পাশেই কার্ক। জিজ্ঞেস করলো।

'তোমার দেশ ইস্ট পাকিস্তানে নয়? সুন্দর একটি নিউজ আছে কাগজে। পিজ্জার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে পড়ছিলাম। মনে হলো হয়তো তুমি ইন্টারেস্টেড হবে। নিয়ে এসেছি। তুমি দেখো।'

অসীম আগ্রহে পড়লো রাশেদ। ছোট একটি খবর। উনিশ বছরের একটি ছেলে পেটে ডিনামাইট বেঁধে ঢাকা চিটাগং রেলের ব্রীজ উড়িয়ে দিয়েছে। সেই ট্রেনে গোলা ছিলো। বারুদ ছিলো। আরো ছিলো অস্ত্র। সামরিক বাহিনীর জন্যে। ওয়াগনের পর ওয়াগন নদীতে ধ্বসে পড়েছে। সাংবাদিক আরো লিখেছে, অসীম সাহসী এই ছেলেটির নাম নাকি বাবলু। দেশের নামে একাই সে এগিয়ে গেছে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে, বন্ধুদের ক্যাম্পে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে। ঢাকার মিরপুরের ছেলে।

নাম পড়ে গা কেঁপে উঠেছে রাশেদের। ওকি শাহানার ভাই? তবে কি শাহানাও ওর সাথে ছিলো? কি জানি। ঢাকায় ঘরে ঘরে ছেলের নাম বাবলু।

বিকেলের রোদ হেলে পড়েছে বাগানে। মাইকেল উঠে দাঁড়ালো।

'দিজ শুড বি আওয়ার লাস্ট ট্রাই। সুসানা লক্ষীটি। ফেইল করোনা আমাকে।'

হাসতে থাকে সুসানা।

'আমাকে নিশ্চয়ই আজ জিংকস্ ধরেছে।'

ক্যামেরা আবার চলে। ভালোই করেছে সুসানা। চমৎকার ধরেছে এবারে ওর বিব্রতভাব।

'গ্রেট।' খুশীতে চিৎকার করে উঠেছে মাইকেল। 'এবারে হবেই তোমার।'

মৃদু লজ্জার হাসি হেসেছে সুসানা। ফুলের গোছার জন্যে হাত এগিয়ে দিয়েছে। সটান শক্ত হাত। পুরুষের মতো। লজ্জা কোথায়। গ্রেস কোথায় ওর।

'কাট কাট। সরবে চিৎকার করে উঠেছে মাইকেল। জীবনে তোমাকে কি কেউ কখনো ফুল দেয়নি সুসানা? পুরুষের কাছ থেকে কি কখনো ফুল নিতে শেখোনি।'

কেঁদে ফেলেছে সুসানা।

'আজ আমায় রেহাই দাও মাইবেল। আজ আমার মোটেই হবে না। ফুল যেন আজ আমার চোখের বিষ। আমি ধরতেই পারছি না।'

'নো। নট এ্যাট অল।' জিদ্দী কথা মাইকেলের। 'আই হ্যাভ এনাদ্যার আইডিয়া। আরেকবার চেষ্টা করবো। রাশেদ, তুমিতো আগে ভালো আঁকতে। পারবে ওকে স্কেচ করে দেখাতে কি করে ফুল ধরতে হবে?'

'নিশ্চয়ই। স্কেচ পেপার আছে আমার কাছেই।'

'তবে তুমি ঘরের ভিতরে যেয়ে আঁকো। ততক্ষণে আমরা একটা ড্রিংক নিই। কতোক্ষণ ব্রেক নেবো। একঘণ্টা?'

'চারকোণার স্কেচ হবে। ম্যাকসিমাম আমার পনেরো মিনিট লাগবে।' রাশেদ নিশ্চিত গলায় বলে।

নির্দ্বিধায় আঁকতে বসে যায় রাশেদ। বড়ো বড়ো লাইন টানে। সজোরে ব্রাশ করে। স্কেচ কাগজ যেনো ছিড়ে যাবে। স্থির দৃষ্টিতে দেখে, পাঁচ মিনিট।

নিয়ে আসে মাইকেলের কাছে। অবাক হয়ে দেখে মাইকেল।

'একি এঁকেছো তুমি রাশেদ? সুসানার চুল করেছো কালো লম্বা খোলা চুল। কোথায় ওর কারনেশন গুচ্ছ? বরং হাতে দিয়েছো রিভলবার।'

স্মিত বেদনায় বলে রাশেদ --

'দেশে চলছে কারনেজ। শাহানা এখন ধরবে অস্ত্র। কারনেশন নয় মাইবেল।'

শর্তহীন নীলাকাশ ও জমাট প্রতিশ্রুতি

কামরুন জিনিয়া

রুনু চাচীর হঠাৎ টেলিফোন ছুটির চমৎকার সকালটিকে একেবারেই সন্ধ্যা করে দিলো।

ছুটি তাকিয়ে ছিলো জানালার বাইরে। হাতে চায়ের কাপ। বাইরে হালকা বৃষ্টি। সেই সঙ্গে তুষার। স্মরণকালের তুষারপাতে ছেয়ে গেছে পুরো শিকাগো শহর। রুমি অফিসে চলে যাবার পর ভোরের এ সময়টিতে ছুটি চা নিয়ে জানালার পাশে এসে প্রায় প্রতিদিনই দাঁড়ায়। এ সময়টি তার খুব প্রিয়। একান্ত, নিজস্ব। চা খেতে খেতে সে নিজের মনে ভাবে, কথা বলে, আবৃত্তি করে, আকাশ দেখে। বিকেলেও জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে দেখতে সে কাটিয়ে দিতে পারে অনেকটা সময়। ছুটির ভেতর চপলতা এবং তন্ময়তা গলাগলি ধরে বসত করে। ছুটির তন্ময়তা তার ঋত্বিক সত্তা, তার শিল্পীমন। আর ওর চপলতা হলো আর্য রমণীর হাজার বছরের ঐতিহ্যের অনুরণন অথবা ছুটি নামের কোনো এক খুব সাধারণ নারীর আন্তর্বৈশিষ্ট্য। কেউ গোপনে বা লুকিয়ে ছুটির এই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে চা খাওয়ার এ সময়টুকু প্রত্যক্ষ করলে ওকে ভীষণ একা অথবা কিছুটা হলেও রহস্যময়ী মনে করবে। ছুটি চায়ের কাপে চমুক দিয়ে আবৃত্তি শুরু করে,

পরাজিত হতে ভালোবাসি, তার মানে এই নয়
জয়ের যোগ্যতা আমার নেই।
পুড়ে যেতে ভালো লাগে, তার মানে এই নয়
অন্যকে পোড়াতে পারি না।
পরাভূত হতে হতে, পুড়ে ছাই হতে হতে
আমাকে দেখতে হবে
জীবন কতটা শিল্প,
কতটুকু নিরুত্তেজ ছাই!

কবিতাটি খুব সম্ভবত: হাসান হাফিজ অথবা রফিক আজাদের লেখা। ছুটি ঠিকমতো মনে করতে পারে না। ছোট এ কবিতাটি ছুটির এতো প্রিয় যে ও মনে করে এটি আসলে ওর এপিটাফ। ছুটি খেয়াল করেছে আজকাল সে তার প্রিয় অনেক কবিতাই মনে করতে পারে না, অথচ প্রিয় প্রায় সবক'টি কবিতাই একসময় তার মুখস্ত ছিলো। তার সবচেয়ে প্রিয় কবিতা রবিঠাকুরের 'পৃথিবী', একশ' লাইনের পুরো এই কবিতাটি বছরখানেক আগেও মুখস্ত ছিলো, বাংলাদেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে পহেলা

বৈশাখের অনুষ্ঠানে বহুবার আবৃত্তিও করেছে, কিন্তু সেদিন দশ/বারো লাইন পরে কিছুতেই মনে করতে পারলো না পরের লাইনগুলো। এমন অবস্থা ছুটির এর আগে আর কখনোই হয়নি। 'মনে নেয়া' আর 'মেনে নেয়া' - এ দুটো ভিন্ন ব্যাপারের দ্বিতীয়টিই তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে সংসার জীবনের শুরু থেকে। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও সে মনে নিয়েছে অনেক কিছু শুধু সংসারের ভালোর জন্যে। সুন্দর আগামীর জন্যে। যা নিয়ে অবশ্য তার কোনো দুঃখ বা অনুযোগ নেই। কিন্তু তারপরেও কখনও কখনও এ জানালাটার পাশে এসে যখন ছুটি দাঁড়ায়, অদ্ভুতভাবে তার ভেতরের 'অন্য এক ছুটি' বেরিয়ে এসে তাকে তন্ময়তায় আবিষ্ট করে। বাস্তবের ছুটি যা ভাবতে পর্যন্ত পারে না, 'অন্য এক ছুটি' তাই ভাবে এবং সেই ভাবনাকে ভর করে একটা সময়ে বাস্তবের এই গৃহবধূ ছুটি হাঁটতে শুরু করে।

বাইরে অবিরাম তুষার ঝরছে। ছুটির চোখ তখনো জানালার বাইরে। দু'চোখ যতদূর যায় শুধু সাদা আর সাদা। ছুটি সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল। তখনই বেজে ওঠে ফোনটা।

রুনু চাচীর এই হঠাৎ টেলিফোন ছুটির চমৎকার সকালটিকে আসলেই সন্ধ্যা করে দিলো।

এ সন্ধ্যা কষ্টের, ভয়ের, আতঙ্কের। ঘটনার আকস্মিকতায় সে স্তব্ধ হয়ে থাকে বেশ খানিকটা সময়। সে কিছুই বুঝতে পারে না। তার চিন্তাশক্তি লোপ পায়। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর, বুকের ভেতর থেকে একটা মোচর দেওয়া যন্ত্রণা ছুটির গলা বেয়ে উপরে উঠে আসতে থাকে। ছুটি কাঁদতে শুরু করে। প্রথমে নিঃশব্দে, পরে শিশুর মতো শব্দ করে। অনেকক্ষণ কাঁদে। তার বিদীর্ণ করা কান্না কেউ শুনতে পায় না, পৌঁছায় না রুমির কানেও। তার স্বামী রুমি সেই ভোরে চলে গেছে অফিসে। ছুটি মূর্ছিত-প্রায় পড়ে থাকে লিভিং রুমের বড় সোফাটার ওপর।

ছুটির ছোট দু'টি স্যুটকেস ঘরের মেঝেতে মোটামুটি গোছানো। আগামীকাল দুপুরে ফ্লাইট তার, বাংলাদেশে মা-বাবার কাছে বেড়াতে যাচ্ছে সে। সেভাবেই প্লেনের টিকিট কেটে রেখেছে রুমি মাস দেড়েক আগেই। শিকাগো থেকে নন-স্টপ নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক থেকে বাংলাদেশ বিমানে করে সোজা ঢাকায়। মাঝখানে লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট থেকে জে.এফ. কে. এয়ারপোর্টে যেতে হবে বাংলাদেশ বিমান ধরার জন্যে, সেজন্যেও সময় আছে ঘণ্টা তিনেক। রুমিও যাবে তিন সপ্তাহ পর অফিসের কাজ আরেকটু গুছিয়ে। সব ঠিকঠাক।

কিন্তু রুনু চাচী এসব কি বললেন আজ ফোনে?

প্রচণ্ড ঝড়ের ভেতর নৌকা যেভাবে দুলতে থাকে, ছুটির চারপাশ অনেকটা সেরকম

দুলতে থাকে। আকাশ-পাতাল চিন্তায় তার মাথা ভারি হয়ে ওঠে। মন স্থিরতা হারায়। মৃতের মতো পড়ে থাকে সে। বাইরে অবিরাম তুষার পতনের মতো তার হৃদয়ের ভেতরেও কিছু একটা পতিত হচ্ছে অনুক্ষণ, স্পষ্ট টের পায় ছুটি, বুকের ভেতর কোথায় যেন, কি যেন স্তূপীকৃত হয়ে হয়ে ক্রমশঃ ভারি ও শক্ত হয়ে উঠছে।

ছুটির হঠাৎ মনে হয়, রুনু চাচী কি আসলেই তাকে একটু আগে ফোন করেছে? নাকি সে স্বপ্ন দেখেছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে?

– বোকা মেয়ে, তুমি যে যাচ্ছো স্বামী-সংসার ফেলে, আর তো এ জীবনে ফিরে আসা হবে না সেখানে তা কি জানো? রুমি তো ডিভোর্স ফাইল করছে। নিশ্চয়ই তোমাকে কিছুই বলেনি।

– এসব কী বলছেন চাচী? ছুটির গলা কেঁপে ওঠে।

– তুমি জানো আমি মিথ্যে বলি না। ওদের তুমি চেনো না। ওদের গোষ্ঠীকে আমি চিনি ত্রিশ বছর ধরে। ওরা তোমার সঙ্গে চালাকি করছে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে দেশে পাঠিয়ে সব সম্পর্ক শেষ করবে।

–আপনি এসব কেমন করে জানলেন চাচী?

– ওদের গোষ্ঠীর সবাই জানে ভেতরে ভেতরে, জানো না শুধু তুমি বোকা মেয়ে। এমন একটা কাপুরুষ, মেরুদণ্ডহীন ছেলের সঙ্গে কিভাবে তোমার মা-বাবা বিয়ে দিলেন, আমি তো ভেবে পাই না।

রুনু চাচী এক নিঃশ্বাসে বলে যাচ্ছিলেন আরও অনেক কথা। কী কী মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে ছুটির বিরুদ্ধে, দেশে পাঠিয়ে গোপনে ছাড়াছাড়ির ব্যাপারটি মিটমাট করানোর কথা, এখানে বাঙালী কমিউনিটিতে ওদের স্ট্যাটাস, মর্যাদা একটুও যেন ক্ষুণ্ন না হয়, সব দায়-দায়িত্ব যেন ছুটির ওপরেই বর্তায়, এমনকি ছুটির চরিত্রের দোষ... আরও কত কি! ছুটির মাথা কাজ করছিলো না আর। কিছু শুনতে পাচ্ছিলো না, দেখতেও না। কোনো রকমে রিসিভারটি রেখে মেঝেতে বসে পড়েছিলো। কতক্ষণ বসেছিল ওভাবে সে নিজেও জানে না।

রুনু চাচী রুমির বড় চাচার স্ত্রী। উনি মিথ্যে বলবেন না। উনি বরাবরই ছুটিকে স্নেহের চোখে দেখে এসেছেন।

ছুটি কি করবে, কি করা উচিত এ মুহূর্তে, কিছুই ভাবতে পারছে না। এখানে, এতোদূরে, এই প্রবাসে তার কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই, নেই বন্ধু-বান্ধবও। বাংলাদেশে মা-বাবাকে ফোন করবে? বড় ভাইকে? তার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। দেশে সবাই জানে ছুটি বেড়াতে আসছে, কত আয়োজন চলছে ওদের! মা-বাবা দু'জনই অসুস্থ, ফোন করে এসব জানালে খারাপ এমনকি ভয়াবহ কিছু ঘটে যেতে পারে। বড় ভাইকে বলা যায়, ওকে অনুরোধ করলে মা-বাবাকে জানাবে না আপাততঃ। কিন্তু পরক্ষণেই ছুটি ভাবে দেশে যাওয়ার একদিন আগে ফোন করে এসব জানালেই বা কি হবে? পৌঁছেও তো

ধীরে সুস্থে বলা যায়।

ছুটি আর ভাবতে পারে না, সে রুমির সঙ্গে কথা বলার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। অস্থির হয়ে ডায়াল করতে থাকে রুমির অফিসের নাম্বারে এবং সেলফোনে, যদিও ছুটি জানে অফিস আওয়ারে রুমি সেলফোন বন্ধ করে রাখে। কতবার ডায়াল করেছে ছুটি নিজেও জানে না। রুমি অফিসেও নেই। অস্থির মনকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করে ছুটি, ভাবে, হয়তো সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, একটু পরেই জেগে উঠে দেখবে রুনু চাচীর ফোনের ব্যাপারটার পুরোটাই স্বপ্ন ছিলো। কিন্তু সে ঘুম ছুটির ভাঙে না কিছুতেই।

তবে কি রুমির সবটাই অভিনয়? অনুক্ষণ মিথ্যে বলে যাচ্ছে তাকে? বিশেষ করে গত ক'মাস ধরে বাংলাদেশে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে রুমির নিপুণ অভিনয়, মিথ্যে বলা, সব-সবকিছু এক নিমিষে কুঁকড়ে দিলো ছুটিকে। ছুটির এতোদিনকার তিল তিল করে গড়া ভালোবাসার স্বপ্ন পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ায় ছুটি। অবশ লাগছে তার সারা শরীর। ধীর পায়ে এসে দাঁড়ায় তার প্রিয় জানালার পাশে।

খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায় ছুটি। চোখ ভরা টলটলে জল নিয়ে আকাশের কাছে উদারতা ভিক্ষা করে সে। সাদা কাফনের মতো ধবধবে তুষারের মধ্যে যেন ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী। ছুটিও। শূন্যের ভিতর অন্তহীন ঘুরপাক খেতে খেতে বাস্তবে ফিরে আসে ছুটি ফোন বাজার শব্দে। রুমি-ই হবে। ছুটি প্রায় দৌড়ে এসে ফোন ধরে।

– হ্যালো। ছুটির বুক দ্রুত ওঠা নামা করতে থাকে। তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

– ছুটি, শোন, জরুরী কাজে অফিস থেকে বাইরে যেতে হচ্ছে। আজ রাতে বাসায় ফিরতে পারবো না।

– কখন যাবে? ছুটি আস্তে করে বলে।

– এইতো কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হয়ে যেতে হবে। একটু থেমে, রুমি আবার বলে, চিন্তা কোরো না, তোমার ফ্লাইট তো কাল দুপুর ৩টায়, আমি সকালের দিকেই চলে আসবো। তোমারতো সবকিছু গোছানই আছে।

ছুটির চোখে জল চিকচিক করে ওঠে। কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে আসে। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়!

– রুমি, কেনো আমার কাছ থেকে এভাবে পালাচ্ছো? কোনো প্রয়োজন নেই তো! তুমি আমাকে আর চাও না, আর ভালোবাসো না বললেই তো হতো, আমি এমনিই চলে যেতাম।

– কে, তোমাকে কি সব বলেছে? চিৎকার করে উঠলো রুমি ফোনের অপর প্রান্তে।

– আমি সব জানি রুমি।

বাংলাদেশে মা-বাবার কাছ থেকে আমার আর তোমার সংসারে ফিরে আসা হবে না,

সেভাবেই সব কিছুর আয়োজন করছো তুমি। তোমার-আমার সংসার থাকবে না আর, সেটা শুধু স্বার্থপরের মতো তুমি একাই জানলে, একবারও ভাবলে না ছুটিরও জানা দরকার!

অপরপ্রান্তে রুমি একদম চুপ। অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে রুমি বেশ নরম ও স্বাভাবিক গলায় ধীরে ধীরে বলে,

– তুমি সময় হলেই জানতে।

ছুটির চোখ ভেসে যাচ্ছিলো জলে, ভালোবাসার অপরপ্রান্তে বসে রুমি তার কিছুই বুঝতে পারে না। ছুটি অস্ফুট গলায় কোনোরকমে বলে, সেটা কি আমি বাংলাদেশে চলে যাবার পর?

রুমি এরপর হঠাৎ করেই লাইনটা কেটে দেয়।

রুমির শেষ নিষ্ঠুর বাক্যটি ছুটি যেন শুনতে পেয়েছিলো তার ফোনের লাইন কেটে দেবারও অনেক পর। অনেকটা সময় পেরিয়ে যাবার পরেই ছুটি প্রথম বুঝতে পেরেছিলো, রুমি তাকে কখনোই আসলে ভালোবাসেনি!

ছুটির মনে হলো, ওর জীবনটা ফাঁকা, ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্য হিলিয়াম বেলুনের মতো। এই জীবন বয়ে বেড়ানোর কী কোনো অর্থ আছে? আছে কোনো আনন্দ? এর চেয়ে মৃত্যুই ভালো। সত্যি সত্যি ওর এ মুহূর্তে মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

রিসিভার রেখে জলভরা ঝাপসা চোখে ছুটি আবারও এসে দাঁড়ায় জানালার পাশে। বৃষ্টি, সেই সঙ্গে তুষার পড়ছে তখনও। তুলোর মতো ঝুলে আছে বরফ গাছের ডালে, বাড়ির ছাদে, আঙিনার, রাস্তার দু'পাশে। সর্বত্র সাদা আর সাদা। তার হৃদয়ের অনুক্ষণ রক্তক্ষরণের মতোই যেন প্রকৃতির অবস্থা। ছুটি বেদনায় ক্রমশ: নীল হচ্ছিল আর প্রকৃতি সাদা। জানালার ওপাশে রাখা বড় সোফাটার হাতলে মাথা রেখে এলিয়ে পড়ে ছুটি। দু'চোখের পাতা বুজে আসে। পুরো ব্যাপারটা সে প্রথম থেকে আর একবার ভাবে। এবং বোঝে রুমির সঙ্গে ছুটির সংসার জীবনের আজকেই বোধ হয় শেষ দিন। এটাই এখন বাস্তব। এটাই সত্যি। এটাই তার নিয়তি।

প্রবহমান সময় কখনও কখনও কারো কারো জীবনে থমকে যায়। ছুটির জীবনেও এই মুহূর্তে তা ঘটলো। ছুটি কোনোকিছুই শুনতে পাচ্ছিল না, দেখতে পাচ্ছিল না। জানালার পাশে থেকেও সে আসলে এখানে, এই ঘরে ছিলো না। এই অবচেতন ও চেতনার মাঝামাঝি অনেক কথা, স্মৃতি এলোমেলোভাবে তার সামনে ভেসে ওঠে।

চরিত্রগত দিক দিয়ে অনেক অমিল থাকা সত্ত্বেও রুমিকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগেছিলো ছুটির। ওদের বিয়ে হয়েছিলো দেশে, পারিবারিকভাবেই। বিয়ের দেড় বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ করে ছুটি আমেরিকাতে এসেছিলো স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে, পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে মাস্টার্স করতে। ভালো

একটি গ্র্যাজুয়েট এ্যাসিস্টেন্টশিপও পেয়েছিল। ছুটির পড়াশোনার জন্যে তাই বাড়তি কোনো খরচের দরকার পড়তো না। উল্টো এ্যাসিস্টেন্টশিপ থেকে প্রতিমাসে ছুটি ভালোই টাকা পেতো। তবুও পড়ালেখা চালিয়ে নেয়া গেলো না ছুটির ভীষণ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও। রুমির কিছুটা ইচ্ছে থাকলেও বাধা এলো ওর পরিবার থেকে। স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হলো এ বাড়ির বউরা চাকরি করে না কখনো, তাই পড়াশোনারও দরকার নেই। আর এ অযৌক্তিক দাবির প্রতিবাদও করেছিলো ছুটি সঙ্গে সঙ্গে। ছুটির প্রতিবাদে মুহূর্তেই যেন বিস্ফোরণ হয়েছিলো। সে প্রতিবাদ 'ধৃষ্টতা' হিসেবে পরিগণিত হয়ে রুমির আকস্মিক ছুটির গায়ে হাত তোলার ওপর দিয়ে যে শুধু শেষ হয়নি সেদিন, তা আজ সে বুঝতে পারছে। তবে সে এ সত্যটিও সেদিন অনুভব করেছিলো রুমির সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে নিতে হলে ছুটিকে তা চালাতে হবে রুমি এবং তার পরিবারের শর্ত অনুযায়ী – পারস্পরিক ভাব বিনিময় বা জীবনের স্বাভাবিক গতি দিয়ে তা নির্ধারিত হবে না কখনো। নিজের সংসারে ভালোবাসাহীন, ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিকৃতি হিসেবে সংসার যাপন অসম্মানের, কথাটা বহুবার ছুটির স্মরণে এলেও সংসার টিকিয়ে রাখাকেই শোভন ও সম্মানের মনে করে ছুটি মা-খালাদের মতো, অথবা অন্য আট দশটা মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালী পরিবারের সাধারণ মেয়েদের মতো, অন্ততঃ এতোদিন তাই ভেবে এসেছে। তাই রুমি ও তার পরিবারের সমস্ত সিদ্ধান্ত অকপটে মাথা পেতে নিয়েছিলো। দুর্ভাগ্য বুঝি ভর করেছিলো সেদিনই তার কাঁধে। সেদিন থেকেই তার সর্বনাশের শুরু। 'মেনে নেয়া'র শুরু। মেনে নিয়েছে একের পর এক ওদের সিদ্ধান্ত ও ভালোলাগা। পড়ালেখা বন্ধ করে পুরোপুরি গৃহবধূ হয়েছিলো। সংসারের তেল, নুনের হিসাব থেকে শুরু করে এক গণ্ডা ছেলে-মেয়ের সার্থক জননী হয়ে বাকি জীবনটা পার করে দেবারও প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে।

এ নিয়ে অবশ্য ছুটির কোনো দুঃখ নেই, কোনো অভিযোগ নেই। সে বোঝে, সবাই জীবনে সবকিছু পায় না। তবুও প্রবাসের এই যান্ত্রিক জীবনে, অনবরত পথ চলায় হঠাৎ কখনো কোনো দমকা বা উদাসী হাওয়া ছুটির হৃদয়ে চঞ্চলতা জাগাতো! কখনো বা মনে করিয়ে দিতো–জীবনের কাছে অনেক পাওনা ছিলো– আরও অনেক কিছু করার ছিলো! মনে হতো, জীবনতো একটাই, আর এই এক জীবনে লোক দেখানো সুখী না হয়ে সত্যিকারের সুখী হতে চেয়েছিলো ছুটি। সে ধরনেরই একটি আবেগ, বোধ বা ইচ্ছাকে সামনে রেখে ছুটির ভেতরের অন্য এক ছুটি যেনো ঠিক তার সমান্তরালে পথ চলছিলো। এ সত্যটা মোটামুটি ছুটিও জানতো।

অন্য সবার মতো ছুটিরও স্বপ্ন ছিলো। কিন্তু ভণ্ডামি ছিলো না, মিথ্যাচার ছিলো না, অসৎ চিন্তা ছিলো না। ছিলো নীলাকাশ, দিগন্ত বিস্তৃত সরষে ক্ষেত, কবিতার খাতা, দুপুরের রোদে চাঁপা ফুলের মমতা, কৃষ্ণচূড়া, রুদ্র বৈশাখ, একুশ-এর বইমেলা, শহীদ মিনার, মুক্তিযুদ্ধ। আর ছিলো আত্মবিশ্বাস ও সৎসাহস। তাহলে কেনো জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো? পরাজয় মেনে নেয়া? মাঝে মাঝেই ভাবতো সে।

ছুটির বাবা-মাও স্বাভাবিকভাবেই চেয়েছিলেন ছুটি জীবনে কিছু একটা হবে, ভালো কিছু করবে। অনেক স্বপ্ন ছিলো তাদের ছুটিকে ঘিরে। সে স্বপ্নটি কি, তা স্পষ্ট করে জানা না থাকলেও, মা-বাবাকে নিয়ে তাদের স্পেশাল গর্বিত স্বপ্নটি সব সময়ই ছুটির ভেতরে ছিলো। এ এক আশ্চর্য উপলব্ধি! তাদের সহযোগিতা, আন্তরিকতা, উৎসাহ ও ঔদার্য ছুটিকে অনুক্ষণ আশাবাদী রেখেছিলো – স্বপ্ন দেখাতে সাহায্য করেছিলো, ছুটিও ততখানি একাগ্রতা নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে এগুচ্ছিলো। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে, অনেক কষ্টের পথ অতিক্রম করে ছুটিও তো এখানে পৌঁছেছে। যা সত্য বলে জেনেছে তা শুধু আবেগ নির্ভর নয়, যুক্তিনির্ভরও। কিন্তু পড়াশোনাই যখন বন্ধ করে দেয়া হলো সারাজীবনের জন্যে, এক ধরনের বিদ্বেষ, অভিমান যে ছুটির মধ্যে কাজ করেনি তা নয়। বাংলাদেশে মা-বাবার সাথে ছুটির জীবন আর বিয়ের পর আমেরিকায় স্বামীর কাছে আসার পরের বদ্ধ জীবন, এই দুই জীবনের বিশাল ব্যবধান একদিকে যেমন সবার মাঝে থেকেও ছুটির নৈঃসঙ্গকে বাড়িয়ে তুলেছিলো, পাশাপাশি তার উপলব্ধিকে, চেতনাকেও তেমনি দীপ্ত করে তুলেছিলো কিছু প্রশ্ন অপ্রতিহতভাবে–ছুটি এড়াতে পারছিলো না কিছুতেই।

সবকিছুর পরেও 'না' শব্দটি ছুটি সহসা কখনোই বলতে পারেনি। আর বলতে পারেনি বলেই তার সত্যিকার মুক্তি আজও মেলেনি, নিজের অধিকারকে এতোদিন কেবল ছোট ও খর্ব করে এসেছে সংসারের সুখ ও শান্তির নামে, সমাজের ভয়ে, লোকচক্ষুর ভয়ে - যার আসলেই কোনো মানে হয় না, ছুটি ভাবে।

বৃষ্টি ও তুষারপাতের ভেতর বাইরে সন্ধ্যা ফুরিয়ে তখন রাত্রি নেমেছে। ছুটি ঘুমিয়ে পড়েছিলো সোফার হাতলে মাথা রেখেই। যখন চোখ মেললো পুরো ঘর অন্ধকার। ছুটি উঠে রান্নাঘরের বাতিটি জ্বালালো শুধু। সারাদিন না খাওয়ায় শরীর অবশ ও দুর্বল লাগছে এখন। তবুও কিছু খেতে রুচি হলো না তার। ছুটি চায়ের পানি চাপালো চুলায়। বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এলো সে। কাপে চিনি নিতে যেয়ে ক্যাবিনেটে সাজানো চিনির বয়াম, মশলার ছোট ছোট কৌটা, তেলের শিশি, ময়দার প্যাকেট, রান্নার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ছোটখাটো প্যাকেট, যা তার নিজের হাতে লেবেল করা ও থরে থরে সাজানো, চোখ পড়তেই ছুটির মন হু হু করে উঠলো। তার পুরো শরীর কাঁপতে লাগলো, সে আর্তনাদ করে উঠলো। সংসারের ছোটখাটো জিনিসপত্র, এমনকি ছোট একটি চিনির বয়ামের জন্যে এতো মায়া তার কবে, কেমন করে জন্মালো! কোনরকমে চা বানিয়ে হাতে কাপ নিয়ে ছুটি জানালার পাশে এসে অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

বাইরে রাত গাঢ় হয়ে আসে। চারদিক নিস্তব্ধ। কোনো সাড়াশব্দ নেই। না পাখির ডাক, না বাতাসের, না বৃষ্টির, না তুষার পতনের শব্দ। শুধু অনেকক্ষণ পর পর দ্রুত বিলীন হয়ে যাওয়া গাড়ির শব্দ ছাড়া। ছুটি বাইরে চোখ নিবিষ্ট করে। দূরে, অনেক দূরে পথের ওপাশে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালার অন্ধকারের ভেতর ছোট্ট একটি আলোর

কণা চোখে পড়ে ছুটির। অন্ধকারে ওই এক টুকরো আলো যেনো সবকিছু ছাপিয়ে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। অন্ধকারে ওই এক টুকরো আলোর কণাই হঠাৎ ছুটির সামনে সাহসের ও প্রতিবাদের প্রতীকী রূপ হয়ে দাঁড়ালো। অদ্ভুত এক চেতনা হলো তার। ছুটির দৃষ্টি তখন আলোর কণার দিকে স্থির–সে অনিমেষ চেয়ে থাকে। বুকভরা বেদনার সুরগুলো আর বিরক্ত করে না। তারপর একসময় মেঝেতে আছড়ে পড়ে– ছুটির ঘোর কেটে যায় বর্ণচোরা চোখের জলে। ছুটি ভাবে, সত্যিই কি চোখের জলের কোন রঙ হয় না?

চোখ জলে ভেসে গেলে ছুটি যখন আর বাইরের কিছুই দেখতে পারছিলো না তখন তুষারের কাছে, বৃষ্টির কাছে, আকাশের কাছে, সাদার বন্যায় ভেসে যাওয়া পৃথিবীর কাছে ছুটি নিজের কথা, উপলব্ধির কথা, যা হয়তো কিছুটা শপথ অথবা প্রতিশ্রুতি তা শোনাতে চাইলো। ছুটি আশ্চর্য হয়ে স্পষ্ট দেখলো তার প্রতিশ্রুতিগুলো মুহূর্তেই আলোর কণা হয়ে জানালায় এসে আলোকিত করছে তার অন্ধকার, নিকষ কালো চারপাশ! ছুটির চোখের সামনে যেনো হাজারো সূর্য ঝলসে ওঠে, লোহিত কণিকাগুলো আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে। তবুও প্রতিশ্রুতিগুলো তার কেবলই জমাট বেঁধে বেঁধে শক্ত হতে শুরু করে বুকের ঠিক মধ্যখানে, একের পর এক। তারপর ছুটি আর কিছুই জানে না।

পরদিন সকালের দিকেই বাসায় আসে রুমি। সঙ্গে তার দূরসম্পর্কের এক চাচা যিনি এ শহরেই থাকেন, কিন্তু যার সাথে রুমি ছুটিকে কখনোই পরিচয় করিয়ে দেয়নি আগে এবং একজন সাদা পুলিশ অফিসার। ছুটি তখন সবেমাত্র গোসল সেরে বেরিয়েছে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় অনুক্ষণ মানসিক টানাপোড়েন, না-ঘুমানো, আকাশ-পাতাল চিন্তা, সব মিলিয়ে ছুটিকে ভীষণ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিলো। ছুটি ঘাবড়ে গিয়েছিলো প্রথমে। ভাবলো, রুমি কি এখন ওকে জেলে পাঠাবে? কিন্তু না, রুমি একটি কাগজ এগিয়ে দিলো ছুটির সামনে, সই করার জন্যে। ছুটি অবাক হয়ে দেখলো যাবতীয় জিনিসপত্রের তালিকাসমৃদ্ধ একটি লিস্ট সেটি, ছুটি যে সকল জিনিসপত্র স্যুটকেসে করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলোর একটি সত্য-মিথ্যা তালিকা। এগুলোতে কেনো ছুটির সই লাগবে তা মাথায় আসবার আগেই, একটুও দেরি না করে ছোট ডাইনিং টেবিলের ওপর কাগজটি রেখে ছুটি চেয়ার টেনে বসলো। সই করলো। তারপর রুমিকে কাগজটি ফিরিয়ে দিলো।

পুলিশ অফিসারকে বাইরে এগিয়ে দিতে গিয়ে তখনই ফিরে এলো না রুমি। ছুটি স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলো। ছুটি আজ হঠাৎ করেই যেন আবিষ্কার করলো, সে প্রকৃত অর্থেই একা। প্রতিদিন, অনুক্ষণ, দৈনন্দিন জীবনে যার সঙ্গে থাকছে, ওঠা-বসা করছে, যে তার নিত্য সহচর বলে সে এতোদিন ভেবে এসেছে, বিশ্বাস করেছে–সেই রুমি কেবলই তার পরিচিত, আত্মার কাছাকাছি কেউ নয়। ছুটি ঠিক করে, আজকের এই কুৎসিত ব্যাপারটি সে কোনোদিন কারও কাছে বলবে না।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো– রুমি বেশ স্বাভাবিক গলায় বললো, একদম রেডি হয়ে থেকো, আমি ঘণ্টা দুয়েক পর তোমাকে পিক করে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবো।

ইতিবাচক কিছু বলার আগেই রুমি ফোন ছেড়ে দিলো। একটু আগে যা ঘটে গেলো, বলা যায়, রুমি যা ঘটালো, তার কথায় বিন্দুমাত্রও ছাপ ফুটে উঠলো না। সে যা করলো ছুটির যাওয়ার আগ মুহূর্তে তা ছুটির বুঝতে আরও হয়তো সময় লাগবে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। এটুকু শুধু বুঝতে পারছে, প্লেনে ওঠার আগে রুমি ছুটির সাথে কোনো ধরনের কথা বলতে চাচ্ছে না, সামনেও আসতে চাচ্ছে না। ছুটির কোনো ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন সে হবে না। ছুটির সেই দলা পাকানো কষ্টটা আবারও মোচর দিয়ে উঠলো। সে যাকে এতো ভালোবেসেছে সেই রুমি কি করে তাকে এতো কষ্ট দিতে পারে প্ল্যান করে করে তার চলে যাওয়ার এ শেষ দিনটিতে! মানুষ পারে মানুষকে এভাবে দুঃখ দিতে! অবাক লাগে ছুটির। দু'চোখ আবারও ভরে ওঠে জলে। ছুটির এবার রাগ লাগে নিজের ওপর, সে সত্যি চায় না আর এভাবে কাঁদতে। সে বোঝে এ কান্না অপারগতার, দুর্বলতার, অসহায়ত্বের। সে এখানে একা, তাকে সাহায্য করবার কেউ নেই, কষ্টের কথা শোনারও কেউ নেই–তাইতো এতো কান্না, এতো চোখের জল। ছুটি ঠিক করে সে আর অর্থহীন কাঁদবে না। তার টিকেট কাটা হয়ে আছে মাসদেড়েক আগে থেকেই, মা-বাবা জানেন বেড়াতে আসছে ছুটি, কত সুখী তাদের মেয়ে, সার্থক তারা এতো ভালো প্রবাসী স্বামীর কাছে মেয়েকে তুলে দিয়ে। ক'দিন আগে মা-বাবা দু'জনেই যখন কাঁদছিলেন ফোনে, রুমি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলো, এতো মন খারাপ করবেন না আপনারা, ছুটি প্রতিবছরই বেড়াতে যাবে দেশে আমি যাই বা না যাই।

কিন্তু এখন কী হবে? যখন মা-বাবা সব জানবে? ছুটি আঁৎকে ওঠে। দু'জনই ভীষণ অসুস্থ। তারা কি সহ্য করতে পারবে ছুটির জীবনের এ পরিণতি? ছুটির ছোট দু'বোনেরই বা কি হবে? বড় বোনের এ ঘটনা জানার পর ওদের ভালো বিয়ে হওয়া নিয়ে সমস্যা হবেই। ব্যাপারটি অযৌক্তিক, কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিম্ন মধ্যবিত্ত একটি পরিবারে ব্যাপারটি ভীষণ সত্য। আছে পাড়া-প্রতিবেশী, আছে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দেখা যাবে ছুটি এবং ছুটির পরিবার ব্যাপারটি ভুলতে চাইলেও অন্যরা ভুলবে না। অনুক্ষণ স্মরণ করিয়ে দেবে। ছুটির সামনে নিজের কষ্টের চেয়ে পরিবারের কষ্টটি বড় হয়ে দেখা দিলো।

ছুটি নিউইয়র্কে এসে পৌঁছায় সন্ধ্যা ছ'টায়।

রুমি ও তার দূরসম্পর্কের সেই চাচা ছুটিকে পৌঁছে দিয়েছিলো এয়ারপোর্টে। গাড়ির পেছনের সিটে চুপচাপ বসেছিলো ছুটি। টুকটাক কথা বলছিলো সামনে ওরা দু'জন। মাঝে মাঝে পাথুরে নীরবতা। ছুটি দেখছিলো বাইরে দ্রুত সরে যাওয়া রাস্তার দু'পাশের গাছপালা, বিলবোর্ড, ওর মনে হলো সবকিছু ছাড়িয়ে দ্রুত ও কোথায় যেনো হারিয়ে যাচ্ছে, গত রাতের আলোর কণার কথা মনে হয় ওর।

যদিও গত ক'দিনের টানা তুষারপাতের কারণে ফ্লাইট ডিলে বা বাতিল হবার একটি সম্ভাবনার আশংকা করছিলো ছুটি, কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। প্লেন সময়মতোই উড়েছিলো শিকাগো থেকে।

গত তিন ঘণ্টার নন-স্টপ জার্নিতে সে সারাক্ষণই শুধু ভেবেছে। নিজের মুখোমুখি হয়ে যুক্তিতর্ক করেছে অনুক্ষণ। সে কি সঠিক কাজটি করছে? কি আর করতে পারতো সে একা, এতো দূরে?

বাংলাদেশ বিমানে ছুটি চেক ইন করতে ঢোকে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। সব লাউঞ্জেই ঝুলন্ত প্লাজমা স্ক্রীনে ডিপারচার টাইম বারবার দেখানো হচ্ছে। যাত্রীরা সব সময়েই জানছেন কোন ফ্লাইট ক'টায় ছাড়বে, কোন বোর্ডিং গেটে যেতে হবে, কোন ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে ইত্যাদি। প্লেন টেক অফ করার টাইম ছিলো রাত সাড়ে ন'টায়। ছুটি ইমিগ্রেশন এরিয়া পেরিয়ে বেছে নিলো ডিপারচার লাউঞ্জের নির্জনতম স্থানটি।

ছুটির মনে হয় রুমিকে নিয়ে তার অসামান্য কল্পনা, স্বপ্ন তার সর্বনাশের কারণ। সে রুমিকে যেমনটি ভেবেছিলো রুমি আসলে তেমন নয়। তবে এটা সত্যি ছুটি তার কল্পনায় অনুক্ষণ যে রুমিকে একটু একটু করে নির্মাণ করেছে তার নাম রুমি হলেও সে আসলে রুমি নয়। কল্পনার রুমির কাছে সে ভালোবাসা শিখেছে, আর বাস্তবের রুমি ভালোবাসতে জানে না। রুমি স্বার্থপরের মতো কেবলই ভেবেছে তার কথা এবং তার পরিবারের কথা, একটি বারের জন্যেও ভাবেনি ছুটির কি হবে!

ছুটি কি মাঘ শেষের নদীর মতো তরঙ্গহীন থেকে যাবে, আগের মতো এখনও? নাকি তার নিজের জীবনের দায়িত্ব সে নিজেই নেবে? এখানে থেকে? কিন্তু কেমন করে সেটা সম্ভব! ছুটির স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। রুমিকে নিয়ে তার সমস্ত কল্পনা ধ্বংস হয়ে গেছে। ছুটির স্বপ্ন এখন ভস্ম ছাড়া আর কি? তবুও কি সে তার চারপাশের নিয়ন্ত্রণহীন ঘটনা প্রবাহের কাছে পরাধীন রক্তমাংশের শুধু সাদামাটা কাঠামোই থেকে যাবে এখনও? তার কি কিছুই করার নেই? যা ঘটার তা ঘটবেই, ছুটি জানে। তাই বলে থেমে থাকা কেনো?

এসব ভাবতে ভাবতে এক devastating বিদ্রোহী চেতনা জেগে ওঠে ছুটির ভেতরে। ওর মনে হলো রুমি যা করছে তা অন্যায়। রুমি যদি সিদ্ধান্ত নেয় ছুটির সাথে একসঙ্গে একই ছাদের তলায় আর জীবন না কাটানোর তাতে ছুটির দুঃখ নেই, কিন্তু সে যে কপটতার, চালাকির, মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে গোপনে ছুটিকে দেশে পাঠিয়ে, সেটা ছুটি মানতে পারে না। সে রুমিকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, কিন্তু সেই ভালোবাসাকে ছুটির দুর্বলতা মনে করে ছুটিকে দুঃখ দেবার, ওর প্রতি অন্যায় করার রুমি কেউ নয়! এ অন্যায় মেনে নেয়া উচিতও নয়। ছুটি সহসাই আবিষ্কার করে তার ভেতরে অন্য 'এক ছুটি'-কে, অবশ্য অপরিচিত লাগে না তার তাকে। সে তাকে চেনে!

ছুটি কি তাহলে 'অন্য এক' ছুটিকে সযতনে ভেতরে লালন করেছে এতোকাল। এ সময়টির অপেক্ষায়ই কি ছিলো সে এতোকাল? তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন, পরিপূর্ণতা, তার মুক্তি কি তবে 'অন্য এক' ছুটিতে? যা সে এতোকাল চেয়ে এসেছে এবং অপেক্ষা

করেছে। হয়তো, হয়তো না। ছুটি জানে না। শুধু জানে, এ মুহূর্তে তার চলে যাওয়া চলবে না। টিকতে পারবে কি পারবে না সেটি পরের ব্যাপার, আগেতো নিজের অস্তিত্বের ঘোষণা দিতে হবে, বলতে হবে বোঝাতে হবে সে মৃত নয়! সে নারী, একজন মানুষ, যে তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারে। নিজের ইচ্ছানুযায়ী পথ চলতে পারে, ভাবতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে এখানে থেকে যাবে। এখানে সে থেকে যাবে রুমির কাছে ফিরে যাবার জন্যে নয়, তার ও তার পরিবারের কাছে করুণা ভিক্ষার জন্যেও নয়। নিজেকে জানার জন্যে। আবিষ্কার করার জন্যে। এবং সেজন্যে ছুটিকে এবার দায়িত্ব নিতে হবে। নিজের প্রতি দায়িত্ব। অন্যের ইচ্ছানুযায়ী নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত সে নেবে না আর। তার যা ভালো ও সুন্দর মনে হয়, সে এখন থেকে তাই করবে। সে আবার পড়াশোনা শুরু করবে। ছুটি সবকিছুর জন্যে নিজেকেই দায়ী করে। সব ভুল, সব অপরাধ তার। সব সর্বনাশের জন্যে সেই দায়ী। কাউকে দোষ দেবে না সে।

এ জীবন একটি রেখার মতো নয়। এসব ভেবে ভেবে ছুটি আসলে কষ্টেরই বয়স বাড়িয়েছে, বাড়াচ্ছে এখনও। হ্যান্ডব্যাগ থেকে ছোট নোটবুকটা বের করে কয়েকটি নামের ওপর চোখ বুলায় ছুটি। সবাই বড় ভাইয়ের বন্ধু। এদের মধ্যে দু'জনের নিউইয়র্কের নাম্বার। আজিম ও শফি ভাই। দু'জনকেই সে দেখেছে বাংলাদেশে। যদিও তেমন আলাপ পরিচয় নেই। ভাইয়ার কাছেই শুনেছিলো আজিম ভাই ডিভি লটারি পেয়ে স্ত্রী ও দু'সন্তান নিয়ে আমেরিকায় সেটেলড করেছেন। আর শফি ভাই স্প্যানিশ একটি মেয়েকে বিয়ে করে রিয়েল এ্যাসটেট বিজনেসে আছেন। ছুটি একটুক্ষণ ভেবে আজিম ভাইকে ফোন করলো। না, কেউ ধরছে না। শুধু রিং বেজে যাচ্ছে একটানা। ছুটির মন খারাপ হয়ে গেলো। সে আরও কয়েকবার চেষ্টা করলো। কিন্তু প্রতিবারই একই অবস্থা। এরপর ডায়াল করলো শফি ভাইয়ের নম্বরে, দু'বার বাজতেই অপরপ্রান্ত থেকে পুরুষকণ্ঠ ভেসে এলো।

– হ্যালো?

– আসসালামু আলাইকুম। এটা কি শফি সাহেবের বাসা? আমি কি তার সাথে একটু কথা বলতে পারি?

– জ্বি বলছি।

– শফি ভাই, আমি রাসেলের ছোট বোন ছুটি। চিনতে পারছেন?

– কোন রাসেল? একটু থেমে, ওঃ আচ্ছা, চিনতে পেরেছি। শুধু রাসেলের বোন বললে হয়তো চিনতাম না। আমাদের বন্ধুমহলে তো রাসেল চারজন। তোমার ছুটি নামটিই মনে করিয়ে দিলো তুমি কোন রাসেলের বোন। এ্যানি ওয়ে, তুমিতো খুব সম্ভবত স্বামী-সংসার নিয়ে শিকাগো তো আছো? রাসেল তাই তো বলেছিলো।

–জ্বি, আপনি ঠিকই শুনেছেন। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি নিউইয়র্কের জে.এফ. কে এয়ারপোর্টে আছি। একটু বিপদে পড়েছি।

-প্লিজ, খুলে বলো। অপরপ্রান্ত থেকে আন্তরিক উত্তর এলো।

– আমাকে শুধু আজকের রাতে কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আপনি ও শফি ভাই ছাড়া আমারতো পরিচিত কেউ নেই নিউইয়র্কে। খুলে সব পরে বলবো।

– ওকে, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি।

গত একদিনে রুমির স্বরূপ, রুমির আশ্চর্য ব্যবহার, আচরণ ও কথায় সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়ে গিয়েছিলো ছুটির।

এমন একটা সময়ের জন্যে যেনো ছুটি অপেক্ষা করছিলো বহু বছর। সময় এসেছে এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার। ছুটি সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশে মা-বাবার কাছে এভাবে ফিরে না যাবার। সে অবশ্যই যাবে তার জন্মভূমিতে, মা-বাবার কাছে, কিন্তু আজকে, এ মুহূর্তে, নিজেকে ছোট করে, অপমানিত করে সে যাবে না। তাহলে সে নিজের কাছেই হেরে থাকবে বাকি পুরোটা জীবন।

ফোন রাখার পর ছুটির মনে হলো ছুটি ছাড়া ছুটির বিকল্প ছিলো না ছুটির কাছে। জীবনকে মেনে নেবার চেষ্টা করাইতো বুদ্ধিমানের কাজ। আফসোস করে লাভ কি? বরং ছুটির মনে হয় এ ঘটনাটির ভীষণ প্রয়োজন ছিলো তার জীবনে। শুধুই যাপন করা জীবন তার জন্যে নয়। সে আবিষ্কার করতে চায় নিজেকে, আবিষ্কার করতে চায় আসলেই কোন সত্যটি বাস্তব, কোনটি নয়।

ওর মাথাটা হঠাৎ করেই যেনো হালকা হয়ে গেছে। ভালো লাগছে খুব। রুমির জন্যে ভালোবাসার জায়গাটুকুতে একরাশ করুণা এসে ভিড় জমালো। ছুটির মনে হলো, নতুন একটি শতাব্দী এসে গেলো, তবুও মুক্তবুদ্ধির উদয় হলো না এখনও অনেকের। ছুটি পরাজয় নয়, পশ্চাদপসরণ নয়– জয়ের কথাই ভাবতে চায়। সামনে হাঁটতে চায়।

ছুটি এও জানে ওর সামনে ভবিষ্যত অন্ধকার, বর্তমান বিধ্বস্ত, পাশে নেই কেউ–তবুও সিদ্ধান্ত নেয় কিছুতেই ফিরে যাবে না অতীতে আর। তার চোখ টলটলে জলে আবারও ভিজে ভরে উঠলো। কিন্তু আশ্চর্য, এবার ছুটি অসহায় বোধ করলো না, দুর্বলও মনে হলো না নিজেকে, বরং একটি সাহসী চেতনা তাকে উদ্দীপিত করলো যেনো–জীবনে এই প্রথম সে চোখের জল মুছে ফেললো না, স্বতঃস্ফূর্ত গড়াতে দিলো দু'গাল বেয়ে নিচের দিকে। কারণ সে একটি সত্য খুব ভালো করে উপলব্ধি করছে এ মুহূর্তে, আর তা হলো– যে কান্নায় চোখ ভিজেছে তার, সে কান্না কোনোভাবেই দূর্বলতার নয়, অপারগতার নয়, অসহায়ত্বেরও নয়--এ কান্না অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হবার, নিজের পায়ে শক্তভাবে দাঁড়াবার, নিজেকে জানবার এবং হীনম্মন্যতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেগে উঠবার এক আশ্চর্য জমাট প্রতিশ্রুতি!

(একটি সত্যি ঘটনার ছায়া অবলম্বনে রচিত)

জীবন বারেবারে আসে

জসিম মল্লিক

জগন্নাথ কলেজের কাছে এসে গাড়ি আটকে গেল। প্রচণ্ড ভিড়। অনড় পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন সব। একচুলও আর নড়ছে না যেন কিছু। এমনটা হবে বলেই আশা করা গিয়েছিল। শ্যামলী থেকে এ পর্যন্ত আসতে পাক্কা দেড় ঘণ্টা লেগেছে, গুলিস্তান পার হতে লেগেছে আধা ঘণ্টার ওপরে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে টিকটিক করে উঠল বুকের ভেতরে। পাঁচটা ছয় মিনিট। ছয়টায় স্টিমার ছেড়ে দেবে। সদরঘাট পর্যন্ত পৌঁছাতে কতক্ষণ যে লাগবে কে জানে! গত ছয়-সাত বছর ধরে একই রকম দেখে আসছে। কোনো পরিবর্তন নেই।

গাড়িতে ওরা পাঁচজন। রুবিনা, ওর স্বামী আকবর, পাঁচ ও তিন বছরের দুই ছেলেমেয়ে এবং রুবিনার বোন জলি। প্রতি বছর ঈদের সময় রুবিনার শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া চাই-ই চাই। এত ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে এরকম ভিড় ঠেলে কোথাও যাওয়া চাট্টিখানি কথা! আকবর একদমই পছন্দ করে না এত ঝামেলা করে কোথাও যেতে। কিন্তু রুবিনার একগুঁয়েমির কাছে হার মানতেই হয়। আগে-পিছে যাওয়া নয়, যেতে হবে ঈদের আগে এবং এরকম সময়েই। এটাতেই নাকি মজা। কত লোকজনই তো যাচ্ছে। শ্বশুরবাড়িতে সবাই একসঙ্গে ঈদ করার মজাই আলাদা। বিয়ে হওয়ার পর এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।

গত বছরের আগের বছরের কথা মনে হলে এখনো বুক কেঁপে ওঠে। তখন ওদের গাড়িও ছিল না। ওরা চারজন। ঠিক এই জায়গায়ই বেবিট্যাক্সি আটকে গিয়েছিল। হাতে সময়ও নেই। ছেলের বয়স তখন তিন আর মেয়েটার মাত্র এক বছর। ছেলে তো স্কুটারের ধোঁয়ায় বমিটমি করে মাখামাখি। বাক্স-পোটলাও কম নয়। জ্যাম কিছুতেই ছুটছে না দেখে নেমে দুটো রিকশায় উঠে বসল ওরা ভাগাভাগি করে। বাংলা বাজারের ভেতর দিয়ে কোনো রকম গিয়ে পৌঁছাল সদরঘাট। ভিড় সামাল দিতে না পেরে লঞ্চ ততক্ষণে ঘাট ছেড়ে মাঝনদীতে গিয়ে থেমে রয়েছে। এত ছোট বাচ্চা নিয়ে এখন কীভাবে অই লঞ্চে উঠবে! এদিকে ঘাটের কুলিদের টানাটানিতে একটা বাক্সের হ্যান্ডেল খুলে কাপড়চোপড় সব রাস্তায় গড়াগড়ি। কোনো রকম গুছিয়ে নিল। আকবর বলল, চল ফিরে যাই। এভাবে যাওয়া যায় না।

এতদূর এসে ফিরে যাব!

দেখছ তো অবস্থা। মানুষ কেমন ক্ষেপে আছে বাড়ি যাওয়ার জন্য।

দ্যাখ না একটু চেষ্টা করে।

কী চেষ্টা করব! দেখছ না লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে!

টিকেটের কী হবে?

বাদ দাও তোমার টিকেট।

কিন্তু রুবিনার পীড়াপীড়িতে একটা নৌকা ঠিক করে উঠে বসল। ছোট্ট ডিঙি নৌকা। ভয়ে টেনশনে ঘেমে উঠল আকবর। নির্ঘাৎ আজ সলিলসমাধি হবে বুড়িগঙ্গায়। ছোট নৌকাটার মধ্যে আরও কয়েকজন জোর করে উঠে বসেছে। এক যুবক উপযাচক হয়ে বাক্স-পোটলা তুলে দিতে সাহায্য করছে। এক পর্যায়ে নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হলো। রুবিনা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। ইঞ্জিনবোট নিয়ে নৌ-পুলিশ টহল দিচ্ছিল। তাদেরই একজন দয়ালু অফিসার সেদিন যদি ওদের উদ্ধার করে লঞ্চে তুলে না দিত, তাহলে কী হতো কে জানে! সেদিন থেকেই লঞ্চে যাওয়া বাদ দিয়ে রকেট স্টিমারে যাওয়া সাব্যস্ত হলো। আর রকেটের টিকেট কি অত সহজে পাওয়া যায়! আর তা যদি হয় প্রথম শ্রেণীর! এবারও প্রথম রোজার দিনই টিকেট বুকিং দিয়েছে আকবর। বুকিং দিলেই তো হবে না! এজন্য দরকার হয় তদবির। এমনকি মন্ত্রী-এমপি বা আর্মির বড় অফিসার পর্যন্ত ধরতে হয়। আকবরকেও এসব করতে হয়েছে স্ত্রীকে খুশি করার জন্য। অতঃপর ঈদের দুই দিন আগে টিকেটের দাম ছাড়াও কিছু ঘুষ দিয়ে টিকেট হাতে পেয়েছে। গত বছরই প্রথম অস্ট্রিচ নামক রকেটে জার্নি করে রুবিনা এতটাই আপ্লুত হয়েছিল যে, সে প্রতিজ্ঞা করেছে এরপর থেকে সে এই রকেটেই শ্বশুরবাড়িতে যাবে। একবার রকেটে উঠতে পারলে আর কোনো ভয় নেই। পথের যাবতীয় কষ্ট রকেটের আরামদায়ক পরিবেশ লাঘব করে দেয়। দারুণ রোমান্টিক জার্নি মনে হয়েছে রুবিনার কাছে। এবারও সেই আশায়ই বুক বেঁধে আছে।

কিন্তু গাড়ি যে এখনো আটকে আছে জ্যামে! কিছুদূর মাত্র এগিয়েছে। আকবর ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। হাতে আছে মাত্র বত্রিশ মিনিট। সদরঘাট পৌঁছাতে পারলেও ভিড় ঠেলে রকেটে উঠতে কতৰণ লাগবে কে জানে। এত মানষ যে কোথা থেকে আসে! পিঁপড়ের মতো মানুষ বাক্স-পোটলা নিয়ে ছুটছে। সদরঘাট পৌঁছে দেখা যাবে সারি সারি লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। লঞ্চের ছাদ গিজগিজ করছে মানুষে। শুধু মানুষই দেখা যাবে, আর কিছু না। আপনজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এই তাড়না পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না জানা নেই আকবরের।

ওরা যখন রকেটে উঠতে পারল, তখন হাতে আছে মাত্র ছয় মিনিট। একটু কষ্ট হলেও ওরা ঠিকঠাকমতোই উঠে গেছে। প্রথম শ্রেণীর কেবিনে পা দিয়েই জলি উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

দারুণ তো আকবর ভাই, থ্যাঙ্কস!

রুবিনা বলল, তোকে বলেছি না, দেখবি কী দারুণ ব্যাপার!

থ্যাংকস আপু।

কেবিনে ঢুকে দেখল এয়ারকন্ডিশনার চলছে। বেসিনে লাক্স সাবান, ধবধবে সাদা তোয়ালে। জলি ঝাঁপিয়ে পড়লো খাটে। আকবরের গালে একটা চুমু দিয়ে বললো, পুরস্কার।

আকবর জানে ও একটা পাগল। যখন-তখন জড়িয়ে ধরে রুবিনার সামনেই। আকবর একদম পাত্তা দেয় না।

যা ব্যালকনিতে গিয়ে বস গিয়ে। ফিস কাটলেট আর চা পাঠাচ্ছি।

যাচ্ছি বাবা!

জার্নিতে দু-একটা হ্যান্ডসাম যুবকের দেখা পাওয়া গেলেও যেতে পারে। গুডলাক।

একটা ছোট ভেংচি দিয়ে জলি বাইরে বেরিয়ে গেল। রুবিনা ওর দুই বাচ্চাকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

২.

পাঁচ বছরের অন্তু আর তিন বছরের অর্নি রকেটের সেলুনে মনের আনন্দে অনেকক্ষন ছোটাছুটি করে এখন ক্লান্ত। সময় রাত আটটা। রুবিনা ওদের খাইয়ে-দাইয়ে শুইয়ে দিয়েছে। রুবিনা জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। চাঁদের ক্ষীণ আলো বিশাল নদীর ওপর পড়ে এক অতিপ্রাকৃত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যেন কেউ একটি অদৃশ্য চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। ঢেউয়ের মাথায় হালকা চাঁদের আলো পড়ে এক অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

আজ থেকে দশ বছর আগের কথা। রুবিনা ওর বাবার সঙ্গে খুলনা যাচ্ছিল। রুবিনার বাবা আনোয়ার সাহেব কাস্টমসের কর্মকর্তা। বদলির চাকরি। তখন রকেট স্টিমার চলত দিনের বেলা। বাদামতলী ঘাট থেকে সকাল ১১টায় ছাড়ত। রুবিনার তখন মাত্র অনার্স পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সুন্দরবন দেখার জন্য বাবার সঙ্গে যাচ্ছিল বেড়াতে। তখন 'গাজী' নামে একটি রকেট স্টিমার চলত এ লাইনে। গাজীও খুব বিশাল ও লাক্সারিয়াস রকেট ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, দিনের বেলা স্টিমার জার্নির কোনো তুলনাই হয় না। দিনভর রকেটের সামনের খোলা জায়গায় চেয়ার পেতে প্রকৃতি দেখার যে কী মজা, তা বর্ণনা করা কঠিন। রুবিনারা দুই বোনই, কোনো ভাই নেই। জলি ওর চেয়ে কমপক্ষে ছয়-সাত বছরের ছোট। দুজনের বয়সের এত গ্যাপ হওয়ার কারণ রুবিনার জানা নেই। ওর বাবা আনোয়ার সাহেবের বয়স আটচল্লিশ কি পঞ্চাশ। এখনো বলতে গেলে তরুণ। মজবুত স্বাস্থ্য, প্রাণবন্ত এবং সাহসী। বাবার সঙ্গে রুবিনা যখন কোথাও যায়, তখন দারুণ একটা ভরসা পায়। মনে হয় সমস্ত পৃথিবীটা হাতের মুঠোয়। কোথাও কোনো ভয়ের কারণ নেই।

কেবিন থেকে বাইরে এসে রুবিনার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। আজকে রকেটে যথেষ্ট ভিড় দেখা গেল। বেশ কয়েকজন বিদেশী ট্যুরিস্ট চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দূরে প্রকৃতি দেখছে। এক কোনায় কয়েকটি যুবক জটলা করে বসে কোরাস গাইছে। রুবিনা গ্রিলে কুনুইয়ে ভর দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওরা দুই বোনই দেখতে দারুন সুন্দর, চেহারায়ও খুব মিল। জলিও আসতে চেয়েছিল কিন্তু সামনেই ওর এসএসসি ফাইনাল পরীক্ষা বলে আসতে পারেনি। এজন্য জলির খুব মন খারাপ। রুবিনার স্লিম ফিগার, মাথাভরা লম্বা চুল বাতাসে উড়ছে, সুতির মেরুন রঙের চেক চুড়িদার ও চুন্দ্রির ওড়না পরেছে আজ। ওর ফর্সা রঙের সঙ্গে দরুণ মানিয়ে গেছে। রুবিনা দেখতে বোম্বের সিনেমার নায়িকাদের মতো।

আনোয়ার সাহেব তার পরিচিত কয়েকজন লোক পেয়ে আড্ডায় জমে গেছেন। এ আড্ডা কতক্ষনে শেষ হবে কে জানে। ওদের লম্বা জার্নি। সেই কাল সকালে খুলনা পৌছাবে। মাঝখানে চাঁদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠিসহ বেশকিছু স্টেশনে থামবে। ওদের স্টিমার এখন মেঘনায় পড়েছে। মেঘনার বড় বড় ঢেউ একটু একটু দুলিয়ে দিচ্ছে স্টিমারটিকে। রুবিনা একদৃষ্টে ভেঙে পড়া ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর অদ্ভুত ভালো লাগে এই ছুটে চলা এবং অছড়ে পড়া জলরাশি দেখতে। বাইরে চোখ ঝলসানো রোদ আর মেঘহীন নীলাকাশ। ছোট ছোট জেলে নৌকাগুলো কেমন মাঝ দরিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেঘনার এ-কূল ও-কূল কিছুই দেখা যায় না। ওদের কি ভয় করে না! জেলেদের ধরা রুপালি ইলিশে সূর্যের আলো পড়ে কেমন ঝিকমিকিয়ে ওঠে। কয়েকটা আছাড় খেয়েই মাছগুলো কেমন নিঃসাড় হয়ে যায়। ইলিশ মাছ ডাঙায় কয়েক সেকেন্ড মাত্র বেঁচে থাকতে পারে। খুবই আনমনা হয়ে রুবিনা এসব দেখছিল। হঠাৎ কেউ একজন পেছন থেকে 'এক্সকিউজ মি' বলে উঠল। রুবিনা ঘুরে তাকাল। দেখল এক যুবক, বয়স সাতাশ-আটাশ হবে। লম্বা প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। শ্যামলার মধ্যে মিষ্টি চেহারা। ছেলেটার আকর্ষণীয় যেটা, সেটা হচ্ছে তার চোখ দুটো এবং একহারা গড়ন। রুবিনা মুহূর্তে একসঙ্গে অনেক কিছু দেখে নিল। মেয়েদের চোখে কোনো কিছুই এড়ায় না। এই ছেলেটিকেই আজ একবার কোথায় যেন দেখেছে না! কোথায় যেন দেখেছে! ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। স্টিমারে ওঠার সময় একঝলক দেখেছে। চোখ দুটো সত্যি সুন্দর। অন্তর্ভেদী এবং মায়াভরা। একসঙ্গে দুটোর সমন্বয় সাধারণত ঘটে না, এর বেলায় ঘটেছে। রুবিনার সঙ্গে কেউ যেচে আলাপ করতে চাইছে, এতে রুবিনা অবাক হয় না। এটাই স্বাভাবিক, এটাই তো হয়ে আসছে ইউনিভার্সিটিতে, কলেজে সর্বত্র। রুবিনা ঘুরে মিষ্টি একটু হেসে বলল, কিছু বলবেন? এসব কৌশল রুবিনার জানা। আর আজকের এই সুন্দর পরিবেশে মুখ গোমড়া করে থাকতে নেই এটা জানে রুবিনা।

হ্যাঁ।

বলুন।

আপনি কি জানেন যে আপনি অনেক সুন্দর!

প্রথম আলাপেই কেউ সরাসরি এভাবে কথা বলতে পারে ভাবেনি রুবিনা। ও একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। যুবকটি আবার বলল, আপনি অনেকক্ষন দূরের দিকে তাকিয়ে আছেন; আমি আপনাকে পেছন থেকে দেখছিলাম। আমার কাছে এই দৃশ্যকল্পটা দারুন লাগছিল, গল্প লেখার জন্য খুবই উপযোগী।

রুবিনা এবার বলল, এভাবে লুকিয়ে কাউকে দেখতে নেই, এটা অভদ্রতা।

ছেলেটা শ্রাগ করে একটু হেসে বলল, জানি, এজন্যে সরি বলতেও আপত্তি নেই। বাই দ্য ওয়ে, আমি কি আপনাকে এককাপ চা অফার করতে পারি?

কেন?

কারণ হচ্ছে, চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

আমি যে আপনার সঙ্গে গল্প করতে চই, তা কে বললো?

আপনি কি এতটাই বেরসিক যে বোবা হয়ে সারাক্ষন এখানে দাঁড়িয়ে তাকবেন! গল্প করলে দেখবেন সময় দ্রুত কেটে যাবে।

ও আচ্ছা।

তাহলে রাজি। ওকে দাঁড়ান, চায়ের অর্ডার দিয়ে আসি। সঙ্গে আর কিছু? যুবকটি চায়ের অর্ডার দিয়ে ফিরে এল। আপনার জন্য একটা সিটও রিজার্ভ করে রেখেছি, দেখুন। আসুন বসা যাক। না বসলে অন্য কেউ দখল নেবে।

রুবিনা অগত্যা বসল। ছেলেটি বলল, আমি আবুল কালাম, আপনি?

রুবিনা।

নাইস টু মিট ইউ! আপনার সঙ্গের হ্যান্ডসাম ভদ্রলোক কে!

দেখেছেন নাকি?

হ্যাঁ। লেখকের চোখ তো!

আপনি লেখেন নাকি!

হ্যাঁ।

কী লেখেন?

এই নানা বিষয় নিয়ে।

আপনি কোথায় লেখেন? কখনো নাম শুনেছি বলে তো মনে হয় না। সরি কিছু মনে করবেন না!

কিছু মনে করিনি। আমি তেমন চেনা কেউ না। সঙ্গের ভদ্রলোক কে বললেন না তো?

উনি আমার বাবা।

ওহ্! চেহারায় খুব মিল।

আমাকে দেখে যে কেউ বলতে পারে আমি কার মেয়ে।

পড়ছেন?

হুঁ।

কী?

অনার্স ফাইনাল দিলাম।

কী বিষয়?

ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স।

প্রসপেক্ট কেমন?

জানি না।

আমি আসলে ছদ্মনামে লিখি।

কী সেটা?

না থাক, জেনে দরকার নেই।

বলতে চান না কেন?

যদি না চেনেন?

আসলে আমি বেশি লেখাটেখা পড়ি না। কবিতা তো একদমই না। অসহ্য লাগে।

আবুল কালাম আর বলল না যে সে কবিতাই লেখে। সে বেশ ভালো কবিতাই লেখে। অনেকেই তার কবিতা ছাপে। সে গল্প-উন্যাসও লেখার চেষ্টা করছে। কবিদের কদর কি কমে যাচ্ছে!

৩.

রকেট ইতিমধ্যে চাঁদপুর ছেড়ে এসেছে। আনোয়ার সাহেব রুবিনাকে ডেকে নিয়ে গেলেন দুপুরের খাবার খেতে। দারুন সব খাবার। খিচুড়ি, চিকেন কারি, ডিম, আচার, ইলশ মাছের দোপেঁয়াজি, ডালের চর্চরি, সবজি। রকেটের অন্যতম আকর্ষণ এর খাবার। ব্রিটিশ কায়দায় ওয়েটাররা ইউনিফর্ম পরে খাবার পরিবেশন করে।

লাঞ্চের পরে আনোয়ার সাহেব আবার আড্ডায় বসলেন। রুবিনা কী করবে এখন? সে কি আবার লেখকের সঙ্গে গিয়ে গল্প করবে? নাকি তার কেবিনে গিয়ে শুয়ে থাকবে? এটা কি শুয়ে থাকার সময়? আবুল কালাম মানুষটাকে খারাপ লাগছে না। বেশ সহজাত একটা ব্যাপার আছে। তেমন কোনো ভনিতা নেই। বেশির ভাগ ছেলেই সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নানা ভনিতা করে, গালগল্প বানায়। অই লোকের মধ্যে ওসব চোখে পড়েনি। ওরা যাবে খুলনা, আবুল কালাম সাহেব কোথায় যাবে তা তো জানা হলো না। রুবিনার মন চাইছিল আবার গিয়ে আবুল কালামের সঙ্গে গল্প করে।

সময় কাটানোও তো একটা ফ্যাক্টর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রুবিনা গেল না। সে তার খাটে শুয়ে পড়ল এবং আশ্চর্য সে ঘুমিয়ে গেল।

দরজায় টোকা পড়ার শব্দে ঘুম ভাঙল। দরজা খুলে দেখল বাবা।

ঘুমাচ্ছিলে?

হ্যাঁ বাবা।

কিছু খাবে মা?

না বাবা, দুপুরে বেশি খাওয়া হয়ে গেছে।

বরিশাল আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

ও!

অই ছেলেটার সঙ্গে আলাপ হলো।

কোন ছেলেটা?

ওই যে তুমি গল্প করছিলে!

ও আচ্ছা।

দারুণ ছেলে। অনেক বিষয় নিয়ে কথা হলো। পলিটিক্স সে ভালোই বোঝে, বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স।

সে নাকি লেখক!

তাই! আমাকে বলেনি তো! বলেছে ইঞ্জিনিয়ার।

ছদ্মনামে লেখে। আমাকেও নাম বলেনি।

বাইরে গিয়ে বসো। আমি চা পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।

রুবিনা চোখেমুখে পানি দিয়ে বাইরে এসে দেখল, আবুল কালাম এখনো বসে আছে।

আসুন রুবিনা। আপনার বাবার সঙ্গে কথা হলো। আমিই যেচে আলাপ করলাম।

আপনি তো বেশ যেচে আলাপ করতে পারেন! বাঙালিদের এই একটা বদঅভ্যাস।

কমিউনিকেশনটাই হচ্ছে আসল। দেখছেন, সূর্যটা ডুবছে, দারুণ সুন্দর না!

হ্যাঁ।

খুব রোমান্টিক না!

কী!

সবকিছু! পরিবেশ একটা বড় ফ্যাক্টর।

কি জানি।

চা এল, সঙ্গে ফিস কাটলেট, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর সস।

আপনি কি চায়ের অর্ডর দিয়ে তারপর এসেছেন?

বাবা পাঠিয়েছেন। আপনার তো খুব প্রশংসা করল। নিশ্চয়ই বাবার কাছে নিজের সম্পর্কে অনেক বানিয়ে বলেছেন?

কালাম হেসে বলল, আরে না। বানিয়ে বলব কেন। এমনি রাজনীতি নিয়ে কথা হচ্ছিল। উনি খুব রাজনীতি সচেতন মানুষ। নাইস পারসন। খুবই প্রগতিশীল।

আপনিও খুলনায় যাচ্ছেন?

আমি! না!

আপনি সুন্দরবন দেখতে যাচ্ছেন তো!

হ্যাঁ।

আমি একটু পরই নেমে যাব।

ও।

আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালো লাগল, রুবিনা। ইউ আর সো নাইস।

রুবিনা একটু হাসল শুধু। আবুল কালাম বরিশাল ঘাটে নেমে যাচ্ছে শুনে ওর কি একটু খারাপ লাগছে! তাও তো কথা বলার একজন লোক পাওয়া গিয়েছিল।

আজকের দিনটা স্মরণীয় আমার কাছে। কেন জানেন? আপনি এভারেজ মেয়েদের মতো না, সহজাত এবং সাবলীল। ব্যাপারটা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনাকে অনেক্ষন দেখার পর আমি নিজের সঙ্গে নিজে বাজি ধরেছিলাম। বাজিতে আমি জিতেছি। আমি জানতাম আপনি কথা বলবেন।

রুবিনা মনে মনে চাইছিল, আবুল কালাম বরিশাল না নেমে যাক। সে থাকুক। খুলনা পর্যন্ত সে যাক। রুবিনার বিশ্বাস, সে বললে আবুল কালাম থাকবে। আবুল কালাম নেমে যাবে না। স্টিমার মন খারাপ করা ভোঁ হুঁইসেল বাজিয়ে বরিশাল ঘাটে এসে থামল। এক ঘণ্টার স্টপওভার। যেন আবুল কালাম টেরই পায়নি তার গন্তব্যে এসে গেছে। এমনিভাবে সে গল্পে বিভোর হয়ে থাকল।

আপনি কি শুধু লেখালেখিই করেন, না আর কিছু করেন?

আরে না। লেখালেখি আমার শখ। আমি বেসিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার। মেকানিক্যাল। একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি। বরিশাল একটা নতুন টেক্সটাইল মিল হচ্ছে। ওটার ইনচার্জ আমি।

ও।

আপনার প্ল্যান কী?

আমার কোনো প্ল্যান নেই। মাস্টার্স করে চাকরি করতে চাই।

মেয়েদের চাকরি করা আমি পছন্দ করি। ইনডিপেনডেন্ট হওয়া দরকার।

একটা প্রশ্ন করি?

সিওর!

আনি কি ম্যারেড?

আবুল কালাম হো হো করে হেসে বলল, আমাকে দেখে কি মনে হয় ম্যারেড?

তা না।

না। তবে বিয়ের কথা ভাবছি। সময় পাচ্ছি না। চাকরি নিয়ে খুব পেরেশান অবস্থা। চাকরি হচ্ছে এক ধরনের স্লেভারি।

আপনার বয়স তো বেশি না বোধহয়।

কমও না, সাতাশ-আটাশ।

ওটা এমন কোনো বয়সই না।

আবুল কালাম উঠল। বলল, রুবিনা আপনি সত্যি খুব সুন্দর।

রুবিনি একটু লাল হয়ে বলল, এ নিয়ে দুবার বলেছেন কথাটা।

সময় থাকলে আরও কতবার যে বলতাম! বাই রুবিনা, ভালো থাকবেন।

আপনিও।

আবুল কালাম চলে যাওয়ার পর রুবিনার মনে হলো তার কনট্রাক্ট নম্বরটা রাখলে ভালো হতো। আবুল কালামও রুবিনার ফোন নম্বর চাইল না। আর কখনো ওই যুবকের সঙ্গে দেখা হবে না এটা মনে করে রুবিনার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কেন যেন এপর রুবিনার খুলনা যাওয়া এবং সুন্দরবন ভ্রমণ কোনোটাই আনন্দময় হয়নি। কোথায় যেন একটা সুর কেটে গেছে। রুবিনা জানে না সেটা কী।

এখনো দশ বছর আগের সেই ঘটনা মনে পড়লে রুবিনার মনটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। গত বছর যখন ও স্টিমারে বরিশাল আসছিল, তখনো আবুল কালামের কথা মনে পড়েছে। আশ্চর্য! এই দশ বছরে আর কোথাও আবুল কালামকে দেখতে পায়নি। এমনকি যদি জানত আবুল কালাম কী নামে লেখে, তাহলেও একটা কথা ছিল। সেদিন সে তার নামটা বলেনি।

কাকতালীয়ভাবে রুবিনার বিয়েটা বরিশালেই হয়। গত দশ বছরে রুবিনা খুব একটা বদলায়নি। সেই আগের মতোই সুন্দরটি রয়ে গেছে। দুটো সন্তান হওয়ার পরও এমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। এই যে প্রতি বছর ঈদের সময়টাতে বরিশাল ছুটে আসে এটার পেছনে কি কোনো কারণ আছে? ওর অবচেতন মনে কি কিছু খুঁজে বেড়ায়?

জার্নিতে আকবরের একমাত্র নেশা হচ্ছে কার্ড খেলা। রুবিনা মাস্টার্স পাস করার পর একটা ভালো চাকরিতে ঢুকেছিল। বছরখানেক চাকরিও করে। তারপর দুম করেই বিয়েটা হয়ে যায়। বিয়ের ব্যাপারে ওর মধ্যে একটা বৈরাগ্য এসে গিয়েছিল। চাকরি

করছে, ভালোই তো চলছিল। কিন্তু বাবা-মায়ের পীড়াপীড়িতে বিয়েতে রাজি হয়। আকবর বিশ্ববিদ্যালয়ের খুবই ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। অল থ্রু ফার্স্ট ক্লাস। বিশ্ববিদ্যালয়েও তার চাকরি হয়েছিল। কিন্তু কে জানে কেন সে কাস্টমসে চাকরি নেয়। আনোয়ার সাহেব ওখান থেকেই আকবর হোসেনকে পিক করে। আকবরও একনজর দেখে রুবিনাকে পছন্দ করে ফেলে। রুবিনার মতো মেয়েদের বিয়ে হওয়াটা কোনো কঠিন কাজ নয়।

৪.

বাইরে ফকফকা চাঁদের আলো। যেন চাঁদের আলোয় সবকিছু ধুয়ে মুছে যাবে। এক অপার্থিব দৃশ্যাবলী দৃশ্যাবলী। আকবর হোসেন তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে অন্যরুমে বসে কার্ড খেলছে। রুবিনা অন্তু আর অর্নিকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে। গত কয়েক বছর ধরে স্টিমার নাইট সার্ভিস হয়েছে। দিনের আলোয় জার্নির যে মজা সেটা রাতের আলোয় পাওয়া যায় না। তবে আজকের রাতটা একদম অন্যরকম। অতিরিক্ত রকমের সুন্দর আজকের রাত। ও বার বার পর্দা সরিয়ে বাইরেটা দেখছে। দূরে আধো আলোয় গাছপালাগুলো সরে সরে যাচ্ছে। নিভৃত পল্লীর কোনো এক কৃষকের ঘরে কুপিরে আলো টিমটিম করে জ্বলছে। সেখানে হয়তো কৃষকের স্ত্রী তার স্বামীকে ভাত বেড়ে দিচ্ছে আর পাশে বসে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছে। অন্যঘরে অর্নির মতো তিন বছরের ছেলেটা মাটির মেঝেতে গড়াগড়ি করে ঘুমাচ্ছে নিশ্চিন্তে।

এই মেয়ে শোন!

জলি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে বলছেন!

হ্যাঁ।

বলুন।

তোমাকে কোথায় দেখেছি বলতো!

কোথাও দেখেননি।

চেনা চেনা লাগছে খুব।

চাপা মারছেন। খাতির জমাতে চাচ্ছেন।

ঠিক ধরেছো। তুমি তো খুবই স্ট্রেইট কথা বল! আমার বয়স জান, আটত্রিশ।

তাতে কি। পুরুষদের বয়স কোনো ফ্যাক্টর না।

তুমি তো বেশ সুন্দও! যেন সেই মুখ, সেই আদল। আশ্চর্য! মানুষে মানুষে এত মিল হয়।

পটানোর চেষ্টা করছেন না!

ভদ্রলোক হেসে দিয়ে বলল, আরে না। তুমি খুব সুন্দর তাই কথা বলার লোভ

সামলাতে পারলাম না। আর তুমি করে বলছি বলে মাইন্ড করনি তো।

মেয়েদের সঙ্গে প্রথম আলাপে তুমি বলাটা অভদ্রতা। সেই গলা, সেই বাচনভঙ্গী। গলার স্বরটাও হুবহু একই রকম।

তুমি কে বলতো!

আমি ভুত। বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল জলি।

লোকটা চমকে উঠলো। সেই হাসি। অবিকল সেই হাসি।

এই মেয়ে, তোমার নাম কি?

ধমক দিয়ে কথা বলছেন কেন!

ও সরি। তোমার নাম কি!

জলি।

চা খাবে। চা খাও।

আমি চা খাই না।

চা খাও না! কেন! সে তো চা খেত!

কার কথা বলছেন!

না, না ও কিছু না।

আপনার মাথা ঠিক আছে তো! আপনি কি করেন!

আমি কবি।

ও, এজন্যেই।

কি!

কবিরা নাকি একটু...।

খবরদার কবিদের নিয়ে ঠাট্টা করবে না! যাচ্ছো কোথায়!

বরিশাল। আপুর শশুড় বাড়ি ঈদ করতে।

ইন্টারেস্টিং তো!

৫.

অন্তু আর অর্নিকে ঘুম পাড়িয়ে রুবিনা বাইরে এলো জলির খোঁজে। অনেক্ষন জলির খোঁজ নেয়নি। দেখলো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত নেড়ে খুব জমিয়ে গল্প করছে। ভদ্রলোককে দেখে চমকে উঠল! এতো সেই লোক! আবুল কালাম।

আপু এই ভদ্রলোক বলছে আমাকে নাকি তার চেনা চেনা লাগে।

আবুল কালাম রুবিনাকে দেখে ভুত দেখার মতো চমকে উঠলো। এই চেহারা কখনো ভোলার মতো নয়। কখনও না।

আপনি রুবিনা না!

হ্যাঁ।

জলি বলল, আপনি চেনেন আপুকে!

এজন্যেই তোমাকে দেখে এত চেনা চেনা লাগছিল। দুজনই দেখতে একইরকমতো।

ওকে, আপনারা গল্প করুন। আমি আকবর ভাইয়ের খবর নিয়ে আসি।

কি আশ্চর্য না! আবার দেখা হবে ভাবিনি।

রুবিনা চুপ করে থাকলো। হঠাৎ কেন যেন একটু অভিমান হলো ওর। কোনো কারণ ছাড়াই। চোখটাও কি একটু ভিজে উঠল না!

সেদিন যদি আপনার ফোন নাম্বারটা রাখতাম!

কি হতো রাখলে!

আবার কথা হতে পারতো। হয়তো দেখাও।

আপনি ইচ্ছে করেই ফোন নম্বর দিয়ে যাননি বা নেননি। সেদিন আপনি বরিশাল না নেমে গেলেও পারতেন।

আমারও তাই মনে হয়েছে পরে। আপনি যদি বলতেন তাহলে আমি থেকে যেতাম। আমি ইচ্ছে করে কিভাবে থাকি বলুন! আপনি ভাবতেন না লোকটা কেমন!

কি করছেন!

ওই গোলাম। চাকরি আর কি! আই হেট ইট!

লেখালেখি!

সেটাও আছে। শখ তো!

নামটা বলেননি সেদিন। ছদ্মনামটা।

বলব, একদিন বলব।

বিয়ে করেছেন!

বিয়ে! নাহ। সময়ই পাইনি। একদম সময় পাই না।

ভিন্ন নদী একই স্রোত

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

কখনো না কখনো এই প্রসঙ্গ তুলতেই হবে। যদিও মনে হয় সময় এখনও আসেনি প্রবাসী সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের দিকনির্দেশনার। পায়ের নিচে মাটি এখনো দুলছে – যেকোন মুহূর্তে ভূমিহীন হতে পারি, যা ধরতে পারা যাচ্ছে তাই আঁকড়ে ধরি না কেন? ফলে সংঘ, সংগঠন, বিচিত্রানুষ্ঠান, নাটক, বিএনপি, আওয়ামী লীগ, সাতকড়া, পুঁইশাক, জামদানী, পাঞ্জাবী, ক্যাসেট, ভিডিও, বাংলা কাগজ ইত্যাকার আভরণে সাজিয়ে নিজের যে-চেহারাটি ক্রমে স্পষ্ট করে তুলছি তা আয়নায় দেখবার সময় আসেনি, এমন ভাবাই চলে। কিন্তু পায়ের মাটি তো সত্যি দুলছে না, দুলছি আমরা। সেটি ভালো নয়। স্থির পায়ে শক্ত জমির ওপরে দাঁড়ানো দরকার।

কথাটা সহজ করে বললে এইরকম দাঁড়ায় : আমরা যারা দীর্ঘকাল ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছি এবং আরো দীর্ঘকাল থাকবো, যারা অল্পকাল ধরে এখানে এসেছি দীর্ঘকাল থাকার নিরূপায় বাসনা নিয়ে, যারা সামান্য সময় কাটাতে এসে দীর্ঘকাল রয়ে গেছি এবং আরো দীর্ঘকাল থাকবো, এবং এই আমরা যারা সকলেই সন্তানসন্ততিসহ কোন এক সময়ে এই দেশেরেই লোকজন হয়ে যাবো, তাদের জীবনাচরণ পদ্ধতি, জীবনচর্চা কোনমতেই সেই দুরদেশে আত্মার আত্মীয় যারা আছে তাদের মতো হবে না। কেমন হবে তা আমরা জানি না, কিন্তু কেমন হওয়া চাই সে ধারণা আছে রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুল সম্মেলন, হ্যামারশোল্ড প্লাজায় বিক্ষোভ, ঈদের জামাত, সার্বজনীন দুর্গোৎসব, বৌদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন, শামসুর রাহমানের সংবর্ধনা, আবদুর রহমান বয়াতীর জারীগান, সনজীদা খাতুনের রবীন্দ্রসংগীত এই সবের অনুষ্ঠান করে ক্রমাগত আমরা সেই বাসনার আভাসও দিয়ে চলেছি। আমরা চাইছি সন্তান আমাদের বাংলা বলুক, বাংলা শিখুক, রবি-নজরুলের গান শিখুক, বুলবুল-আফরোজার মতো নাচতে শিখুক; সেই জলদমন্দ্রস্বর 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম' উচ্চারণ করে যেমন কোটি মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ প্রজ্বলিত করে দিয়েছিল তেমনি করে দিক আবার আমাদের সন্তানের স্বর। আমরা চাইছি থাকুক তেমনি আমাদের ধর্মবিশ্বাস, থাকুক গুরুজনে অবিচলিত শ্রদ্ধা, থাকুক আপনজনের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা, থাকুক পরজনের প্রতি সহমর্মিতা এবং সম্ভবত এটাও চাইছি যে একত্রিত হলেই যেন একটি দল করতে পারি, কোনমতে অক্ষর মুদ্রণের ব্যবস্থা হলেই যেন একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে পারি, মতানৈক্য ঘটলে প্রতিপক্ষের মুণ্ডপাত করতে পারি, চাই কি দু'ঘা বসিয়েও দিতে পারি এবং যেমন করে পারি চাই নিজের আখের গুছিয়ে নিতে। অর্থাৎ আমরা চাইছি খাওয়া পরা, নিদ্রাভ্যাস, শিক্ষাচার,

জীবিকা-সংস্থান, সন্তানপালন, অবসর বিনোদন, শিল্পচর্চা অথবা শিল্পচর্চাহীনতা, সাহিত্যপাঠ অথবা সাজানো ঘরে একটিও বইপত্র না রাখা, ইত্যাদি যেমন ফেলে আসা জন্মভূমিতে ছিল, তেমনি থাকুক। অন্যকথায় এই সমস্ত জীবনধারণ সম্পর্কিত ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমাদের যে-চেহারা ফুটে বেরুচ্ছে, যাকে সম্ভবত আমাদের সাংস্কৃতিক চেহারা বলা যায়, যে-চেহারার আদল ধরে রাখার অবয়বকে বলা যায় বাঙালী, সে-চেহারা ফেলে আসা জনপদের বাঙালীদের মতোই হোক। অবশ্যই এই চেহারার মধ্যে হেরফের অনেক থাকবে, সেখানেও আছে। যেমন, গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় শিল্পচর্চা মাথায় উঠবে, পরকালই সব এই চিন্তায় ধর্মানুষ্ঠান জীবনের মুখ্য অবলম্বন হয়ে দাঁড়াবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু অমন হবার সম্ভাবনা কতটা?

দীর্ঘকাল এদেশে আছেন এমন দু'একজন বাঙালীর জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। আমি এমন এক দম্পতিকে জানি তেইশ বছর হলো যাঁরা এদেশেই আছেন পাকাপাকিভাবে। দেশে যতটা লেখাপড়া-ডিগ্রী অর্জন করা সম্ভব করেছিলেন তাঁরা, তারপর এদেশে এসেও আরও ছ'বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘানি টেনে যত বড় ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব করেছেন। এখন নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী কর্মে নিয়োজিত। দেশ থেকে প্রথম এসে যে ছোট শহরে উঠেছিলেন সেখানে একটি বাঙালীরও মুখ দেখা যেতো না। ফলে দ্রুত সেই শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে গেছিলেন। অবশ্য সেই শহরেও যে এমন কিছু বাঙালী ছিল তা নয়, প্রকৃতপক্ষে একাত্তরের ঐ সময়টুকু বাদ দিলে বাঙালী জীবনচর্চার যে-বিবরণ এই রচনার অন্যত্র দেয়া আছে তার কিছুই পাওয়া যেতো না তাদের জীবনে। অবসর কাটানোর জন্য বিভিন্ন রাজ্যে বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে ঘুরে বেড়ানো ছাড়াও তাঁরা নিয়মিত নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত খেলাধূলার দর্শক ছিলেন, ব্রডওয়ে থেকে যে সব নাটক যেতো শহরে তারও দর্শক ছিলেন, বড় বড় যত গাইয়ে আসতো শহরে, যত বড় বড় ব্যালে বা কনসার্ট হতো, সে-সবে যেতেন, বিদেশী ছবির যে সমস্ত প্রদর্শনী হতো তার উৎসাহী দর্শকও ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সত্যজিৎ রায়ের অধিকাংশ ছবিই ঐভাবে দেখা হয়েছে তাঁদের। লেখাপড়ার শেষে ঐ শহর ছেড়ে এ-শহর সে-শহর ঘুরে এখন তাঁরা নিউইয়র্কে। ব্রডওয়ে, কার্নেগি হলে মাঝে মাঝে এখনও যান, নতুন মুক্তি পাওয়া হলিউডের নামকরা ছবিও দেখেন কখনো কখনো, ভিডিও ক্যাসেটে বিদেশী ছবি দেখার এখনও উৎসাহ আছে তাঁদের। কিন্তু নিউইয়র্ক আসবার পরে দিনরাত্রির সমস্ত অবসর জুড়ে এখন তাঁদের বাংলাদেশ। বাংলা বই, পত্রপত্রিকা যথাসাধ্য সংগ্রহ করেন। বাঙালী ক্রিয়াকাণ্ড, রাজনীতি, সভা-সমিতি, আচার-অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। দেশে ফিরে যাওয়ার চিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন দীর্ঘকাল।

আরও একটি দম্পতিকে জানি। তাঁরাও এদেশে আছেন প্রায় আঠারো বছর ধরে। নানা দুঃসময় পার করে এদেশে দু'জনেই নতুন করে নিজেদের কর্মোপযোগী করে তুলেছেন স্কুল-কলেজে গিয়ে। দু'জনেই এখন পেশাজীবী। দিব্যি সাজানো ছিমছাম সংসার এখন তাঁদের কিন্তু ভিডিও ক্যাসেটে দু'একটি বাংলা ছবি দেখা ছাড়া আর

কোনরকম বঙ্গীয় সংস্কৃতির চর্চা নেই। তবে আছে ধর্মচর্চা। সৎ ধার্মিকের পালনীয় ধর্মীয় সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে পরম যত্নশীল তাঁরা।

অন্য একটি দম্পতিকে জানি। এই ভূমিতে স্থির যাঁরা ত্রিশ বছরের বেশি সময়। বিখ্যাত শিল্প-সাহিত্যিকের পরিবার তাঁদের দেশে। উভয়েই প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরি করেছেন। ঘরে জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তীর ছবি আছে। স্থানীয় পেশাদারী খেলাধুলায় প্রবল উৎসাহ তাঁদের। ইংরেজির সঙ্গে বাংলা গান শোনেন প্রচুর, কিন্তু তাঁরা যে শহরে থাকেন সেই শহরের দূরত্ব নিউইয়র্ক থেকে অনেক। ফলে রাজনীতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দলাদলি মিলিয়ে নিউ ইয়র্কবাসী বাঙালীর মতো জীবন তাঁদের নয়।

ঐ তিনটি পরিবারের মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র আছে। তাঁদের সন্তানেরা প্রায় কেউই বাংলা বলে না। বুঝতে পারে সকলেই হয়তো, বলেও কিছু কিছু, কিন্তু তার বেশি নয়। প্রথম দু'টি পরিবারের সন্তান-সন্ততি এখনো বিদ্যাভাসে ব্যস্ত। কিন্তু শেষোক্ত পরিবারের সব ক'টি কন্যাই এদেশীয় ভিন্ন গাত্রবর্ণের পাত্রের সঙ্গে বিবাহিতা, এবং একাধিকবার। বাংলাদেশ, বাংলার রাজনীতি, ধর্মচর্চা, খাদ্যভ্যাস সব কিছুর সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে কিছু কিছু। কিন্তু কেবল বর্জিত ভাষা ও পোশাক। তাহলেও কি তারা বাংলার সংস্কৃতি-আশ্রয়ী?

গত এক দশক ধরে যাঁরা এদেশে এসেছেন, বিশেষত শেষের পাঁচ বছরেই যাঁরা এসেছেন বেশি, তাঁদের জীবনের চেহারা এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তাঁরা এসেছেন অপেক্ষাকৃত দুঃসময় মাথায় নিয়ে, পেশাগত যোগ্যতা এখনও অর্জিত হয়নি, জীবনধারণের চিন্তায়ই অধিকাংশ সময় কাটে তাঁদের। তাই প্রচলিত অর্থে সংস্কৃতিসেবক তাঁরা নন। কিন্তু মূল সংস্কৃতিপ্রবাহে তাঁরাও যা অবদান রাখবার রেখে চলেছেন। অঞ্চলভিত্তিক সংগঠন, ধর্মীয় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ, ব্রুকলিনের বাঙালী দোকানে কচুশাক, এস্টোরিয়ায় পুঁইশাক ঐ প্রবাহের উপাত্ত। আজ থেকে দশ বছর পরে তাঁদের জীবন কী চেহারা নেবে, পনেরো বিশ বছর পরে তাঁদের সন্তানদের মনোজগতে কোন সংস্কৃতি আধিপত্য পাবে তা আমরা জানি না, তবে অনুমান করি ঐসব পরিবারের সন্তানদের চাইতে এমন কিছু আলাদা হবে না।

কঠিন সত্য এটিই। কারণ হচ্ছে, মানুষ ছাড়া সংস্কৃতি নেই এবং সে মানুষ একক ব্যক্তি নয়, জনগোষ্ঠী। আর জনগোষ্ঠী বাঁচে তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন তথা ভূসংস্থান, জলবায়ু ও নিসর্গকে কেন্দ্র করে। মানুষ হিসেবে ভৌগোলিক পরিচয়ও তাই প্রতিবিম্বিত হয় সংস্কৃতিতে। কিন্তু বারো হাজার মাইল দূরে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু নিসর্গকে কেন্দ্র করে বাঁচার পরেও 'আমি বাঙালী' এই ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক পরিচয় যথার্থ মনে না-ও হতে পারে।

সংস্কৃতি তো তা-ই যা একটি জনগোষ্ঠী তার ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে, সামাজিক আচার ও অভ্যাসে, ধর্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশগত অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মে, তার যাবতীয় সংস্কার ও কুসংস্কারে প্রমূর্ত করে তোলে। বাঙালীর সংস্কৃতি সেইটুকুই যতটুকু তার জীবনচর্চার সর্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত ও প্রকাশিত।

প্রবাসী বাঙালীর এই জীবনচর্চার সার্বিক রূপ কী রকম তার মোটামুটি ধারণা আমাদের আছে। সমস্তটা শীতকাল ঘরে কাটিয়ে গ্রীষ্মের উন্মুক্ত হওয়ার, হালকা পোশাকে ছুটে বেড়ানো, কি সমুদ্রস্নানে আনন্দের ফোয়ারা বইয়ে দেয়া হয়তো সব প্রবাসী বাঙালীর কর্মসূচিতে নেই এখনও, কিন্তু থাকলে দোষের কিছু নেই। বরং ভূসংস্থান, জলবায়ু, নিসর্গ ঐ রকমভাবে জীবন কাটানো অনিবার্য করে তোলে। ঘরের মধ্যে ঢুকে ছুরি দেখিয়ে নেশাখোর যখন সর্বস্ব নিয়ে যায়, নিজের ঘরের পাশে অর্থলোভী ব্যবসায়ী যখন বেআইনী ব্যবসা শুরু করে, সন্তানটির চাকরির জন্যে যখন সুপারিশের প্রয়োজন হয়, তখন সাহায্য চাইতে হয় তাঁদের কাছে যারা অঞ্চলের মুরুব্বি, নেতা, স্থানীয় রাজনীতির কর্ণধার। এই দেশের রাজনীতিতে, সমাজে সম্পৃক্ত না হলে সেই সাহায্য পাওয়ার আশা কোথায়? স্কুলে-কলেজে যে ভাষায় কথা বলা, বিদ্যাভাস হচ্ছে, যে-ভাষায় সম্পূর্ণ দক্ষতা ছাড়া জীবনধারণের উপযুক্ত কর্মসংস্থান সম্ভব নয়, সেই ভাষার তুল্য অধিকার যদি আমার সন্তানের বাংলা ভাষায় না থাকে তার জন্য আমাকে দায়ী করা যুক্তিসম্মত নয়। রবীন্দ্র-নজরুলের সুরধারায় আমি যতই নিষিক্ত হই না কেন, এমটিভি'র জন্য খানিকটা জায়গা তাই আমায় ছেড়ে দিতেই হচ্ছে।

ফলে, অনেকে চাইলেও এই দেশে বসবাসকারী বাঙালীর সাংস্কৃতিক অবয়ব সেই গাঙ্গেয় ভূমির বাঙালীর মতো থাকবে না, তার জীবনচর্চাও অনুরূপ হবে না। তবে সম্পূর্ণ যে পরিবর্তিত হবে এমনও নয়। এবং অতি দ্রুত তো নয়ই। আমাদের আশা এই পরিবর্তন যেন জীবনমুখী, প্রগতিপন্থী, কল্যাণকর হয়। সেই পরিবর্তিত চোহারায় যেন বাঙালীর মূল আত্মপরিচয় থাকে, যে আত্মপরিচয় এইভাবে সনাক্ত করা যায়:

'বাংলার অধিবাসী বাঙালী। এই আমাদের চিরন্তন ভৌগোলিক আত্মপরিচয়। এবং এই পরিচয় সংগ্রামী ও সর্বাত্মক। কিন্তু এর বাইরে এই বাঙালীরই একাধিক খন্ডিত ও আংশিক পরিচয় বর্তমান। সে মুসলমান, সে হিন্দু, সে বৌদ্ধ এবং সে খ্রিস্টান। সে কোটিপতি ব্যবসায়ী এবং নিরন্ন কৃষক। সে উচ্চশিক্ষিত এবং সে অক্ষর পরিচয়হীন। সে ব্রাহ্মণ বা নমশূদ্র এবং সে সৈয়দ বা জোলা-জেলে। এই সমস্ত কিছুর জঙ্গমতা ও বৈচিত্র্য নিয়েই সে বাঙালী। এভাবেই যুগ থেকে যুগে তার জাতিসত্তা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বাঙালী মানে তাই এই সব খন্ডিত বহুর সমাহারে তার সমন্বিত অবয়ব। বাঙালী সংস্কৃতি বললেও বুঝি ইত্যাকার খণ্ডাংশের সংস্কৃতিরূপের মিলিত ঐকতান। সে কারণে বাঙালী সংস্কৃতির অর্থ বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতি ও একাধিক সমাজস্তরের সংস্কৃতির জটিল বুনন। তার ভিতর থেকে আমাদের জাতিসত্তার যে মৌলিক স্বভাব বেরিয়ে আসে তা হলো সামঞ্জস্যনীতি ও সহাবস্থান, ভিন্ন ধর্ম ও মতসহিষ্ণুতা এবং পারিস্পরিক সম্প্রীতি ও বিনিময়ধর্মিতা।' (হায়াৎ মামুদ, সংস্কৃতির অসুখবিসুখ)। বাঙালী সংস্কৃতির উপাদান ও চারিত্র্য খুঁজে নিতে হবে এরই নিরিখে।

এতদবর্ণিত ঐ নিরিখে কি প্রবাসী বাঙালীর সাংস্কৃতিক উপাদান ও চারিত্র্য খুঁজে নেয়া সম্ভব নয়? ঐ জলবায়ু, নিসর্গ, জনগোষ্ঠীর ব্যাপারটি না–থাকলে নির্দ্বিধায় বলা যেতো-- অবশ্যই সম্ভব। তবুও মূল নিরিখ সম্ভবত এটিই। তাই বাংলা ভাষায় সন্তানকে যদি পারঙ্গম না-ও করে তুলতে পারি, যেন পারি বাংলা ভাষার প্রতি তার শ্রদ্ধাকে অবিচল রাখতে; বাংলা গানের আসরে তাকে যদি সঙ্গে না-ও নিয়ে যেতে পারি, যেন পারি বাংলা গান যে মোৎসার্ট-বেটোফেন বা জ্যাজ-পপের চাইতে কোন অংশে হেয় নয় তার এই বোধকে জাগ্রত রাখতে; খালেদা-হাসিনার কর্তব্য-অকর্তব্যের তর্কে যদি তাদের শামিল নাও করতে পারি, যেন পারি, বুশ-ক্লিনটন-ব্রাউনের মতোই ঐ দুই নেত্রীও যে এক বিশাল জনগোষ্ঠীর শুভাশুভের দায়িত্বে নিয়োজিত, তার মধ্যে এই বিশ্বাসের জন্ম দিতে। একুশে ফেব্রুয়ারির সব কথা না–বুঝলেও সে যেন বোঝে যে অধিকার রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ এক জনগোষ্ঠীর মহত্ত্বেরই পরিচায়ক; ছাব্বিশে মার্চের সম্পূর্ণ তাৎপর্য তার অজ্ঞাত থাকলেও সে যেন জানে যে ঐ দিনকে অর্জন করার জন্য লক্ষপ্রাণ বিসর্জিত হয়েছিল কেবল একটি আদর্শকেই সামনে রেখে। পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ, এগারোই জ্যৈষ্ঠ, বারোই ভাদ্র, পয়লা বৈশাখ কেবল কয়েকটি দিনই নয়, বাঙালীর জন্য চিরস্মরণীয়–এও তারা শিখুক। এবং এমনি করেই বাঙালী প্রাণের মূল সূত্রটি তাদের হাতে ধরা থাকে।

কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অনেক সময়ের ও চেষ্টার। তার জন্য প্রয়োজন আছে বাংলা শেখানোর স্কুলের, রবি-নজরুলের গান শেখানোর ক্লাসের, সভা-সমিতির, বিক্ষোভ-মিছিলের। এবং সেইজন্যই নববর্ষ উৎসবে আসুন শামসুর রাহমান, নজরুল সম্মেলনে আসুন ফিরোজা বেগম, রবীন্দ্রজন্মতিথিতে আসুন ওয়াহিদুল হক, একুশে ফেব্রুয়ারিতে আসুন গাজীউল হক। হোক খালেদা-হাসিনার সংবর্ধনা সভা, সুরঞ্জিত-মান্না-ইনু-মেননের অনলবর্ষী বক্তৃতা, একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল করার বিক্ষোভ-মিছিল। পান-পুঁই-ইলিশে এমনি করেই বাঙালী রেখে যাক তার বাঙালীত্ব সন্তানের মধ্যে।

দিনরাত্রির ছায়াঘর

পূরবী বসু

গতকালই প্রথম নয়। বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছে সোমা, সারা মুখ জুড়ে কেমন যেন একটা ভাঙচুর ঘটছে তার। হাসলে পরে ঠোঁটের ডাইনে-বাঁয়ে দু'পাশে আধভাঙা চাঁদের মতো রেখা বরাবরই পড়তো তার। এখন যেন তা আরো স্পষ্ট হয়েছে। গলার ওপর থেকে একপ্রস্থ মেদ আর মাংস কেউ যেন চেঁছে নিয়ে গেছে। গলাটা আগের চেয়ে সরু ও লম্বা দেখায় তাই। কাল রাতেই প্রথম চোখে পড়ল, গালের নিচে কানের দুপাশ থেকে চিবুক পর্যন্ত সোজা নেমে আসা কোনাকুনি লম্বা যে হাড়দুটো রয়েছে, তার ঠিক মাঝখানটিতে সামান্য ঝুলে পড়েছে একখণ্ড মাংসপিণ্ড। এ-ভাঙনের মধ্যেও প্রকৃতির কী অদ্ভুত সামঞ্জস্য! চিবুকের দু'ধারে একই জায়গায় একই রকম এই ঝুলে পড়া। সোমার টানটান মুখটাতে এ-শিথিল মাংসপেশি যেন মানায় না। একে মেনে নেওয়া কষ্টকর। প্রথমে সোমার মনে হয়েছিল, যা দেখছে তা ঠিক নয়।

ভেবেছিল, উঁচু সিলিং থেকে বিচ্ছুরিত আলোর প্রতিফলন ঠিকমতো পড়েনি বলেই এমন দেখাচ্ছে। কিন্তু বাথরুমে গিয়ে আয়নার সামনে উজ্জ্বল আলোতে এসে সোমা নিশ্চিত হয়, যা দেখছে তা দৃষ্টিভ্রম নয়। এটাই তার পরিচিত মুখের আসল চেহারা আজ। দু'গালের নিচে দু'পাশে ছোট্ট মাংসপেশি যেখানে ঝুলে আছে, তার ঠিক ওপরে দুইদিকেই মৃদু গর্তের মতো আবছা কালচে একটা আভাস। অর্থাৎ মাংসখণ্ডটি সেখান থেকেই সরে এসেছে নিচে – নিজের জায়গা ছেড়ে। ডিম্পল বলে একে চালিয়ে দেওয়ার যো নেই। ডিম্পল গালের যেখানে টোল ফেলে, সেখান থেকে এর দূরত্ব বেশ খানিকটা।

অবিনাশ ঘরে ছিল না। অন্যান্য অনেক বুধবারের মতো কাল রাতেও ছিল তার অফিসের ডিনার। অবসর গ্রহণ করার পর আবার চুক্তিভিত্তিক কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে অফিসের বাইরে অফিস সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে অনেক বেশি এখন সময় কাটে অবিনাশের। আগের চেয়ে আগ্রহ ও মনোযোগও বেশি সেখানে। এমিলি বলে ইঞ্জিনিয়ার মেয়েটিও নিশ্চয়ই আছে সেখানে, মানে সেই ডিনারে। মাত্র বছরখানেক আগে কাজে যোগ দিয়েছে মেয়েটি। দারুণ কাজপাগল। শুধু লেখাপড়ায় ভালো আর চটপটে স্বভাবেরই নয়, খাটতেও পারে প্রচুর। তার তরুণ স্বামীটিও অত্যন্ত যত্নবান স্ত্রীর ক্যারিয়ারের

ব্যাপারে। দীর্ঘসময় অফিসের কাজে ব্যয় করতে তাই অসুবিধা হয় না এমিলির। ছেলেপুলে হলে তো আর পারবে না, তাই এখুনি খেটেখুটে যতোটা সম্ভব ক্যারিয়ারটা গুছিয়ে নিতে চায়। এমিলি নিজেই এসব কথা বলেছে সোমাকে এক দ্বিপ্রাহরিক খাবারের আয়োজনে। ভাগ্যবানরাই ওসব পারে।

ছেলেপুলে, ঘর-সংসার নিয়ে ক্যারিয়ারের কথা ভিন্নভাবে ভাবার সুযোগ তো হয়নি সোমার। এ-প্রসঙ্গে পাশের বাড়ির মেরির কথা মনে পড়ে। পড়াশোনা বেশি করেনি মেরি। চাকরিবাকরিও নয়। কিন্তু জীবন আহরিত প্রজ্ঞা দিয়ে যৌথজীবন সম্পর্কে অনেক সত্যই আবিষ্কার করেছে সে, যা সোমার কাছে সত্যি বিস্ময়।

আয়নায় নিজের চেহারা ভালো করে লক্ষ্য করার পর কাল সারারাত ভালোমতো ঘুম হয়নি সোমার। মাঝে মাঝেই জেগেছে। পড়ার ঘরে বসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত কী লিখছিল অবিনাশ। সোমা একবার মাত্র উঁকি দিয়েছিল সেখানে। গৌরব এখনো সিয়াটলেই আছে।

সামনের মাসে শিকাগোর এক আইটি ফার্মে যোগ দেবে। ওকে ফোন করার জন্যে এখনো বেশি রাত হয়নি। সোমা শুয়ে শুয়ে পুত্রের টেলিফোনের নম্বর টেপে। চার-পাঁচবার বাজার পর অ্যান্সারিং মেশিনে চলে যায় কল। বড় পরিচিত, বড় প্রিয় এ-গলার স্বর। কিন্তু এর সঙ্গে তো কথা বলা যায় না! এ যে যন্ত্র! গৌরবের বাসার ফোন নয় এটা, তার সেলুলার নম্বর। সঙ্গেই থাকার কথা। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, আবার সেই মায়ের কল, একই পুরনো বুলি, একই শোনা কথার পুনরাবৃত্তি।

নয়তো একই ধরনের সাবধানবাণী। এসব কথা বারবার আর কত শুনবে ওরা? অথচ আজ কিন্তু সোমা অন্যকথা বলতো। বলতো, ওর চাকরি বদলাবার আগেই ওর সঙ্গে এক উইকএন্ডে সিয়াটল, ভ্যানকুভার বেরিয়ে আসার কথা ভাবছে সোমা। গৌরবের জন্যে এটা কি ভালো সময়? এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব মেশিনে রাখতে ইচ্ছে হলো না সোমার। তাই কোনো কথা না বলেই রেখে দিলো রিসিভার।

দ্বিতীয়বার যখন বাথরুমে গেল, জল খেল, চোখেমুখে প্রচণ্ড গরম লাগা – জ্বালা করা চামড়ায় যখন ঠান্ডা জলের ছিটা দিল, তখনই হঠাৎ সোমা আবিষ্কার করলো, আগের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন খুশি নিশ্চিন্তে আর ঘুমুতেও পারে না সে আজকাল। রাতে হঠাৎ গরম লেগে যায়। কখনো আবার বেশ ঠান্ডা লাগে, বিশেষ করে হাতের আঙুলে, পায়ের পাতায়। অনেক বেশি স্বপ্ন দেখে আজকাল – বেশিরভাগই দুঃস্বপ্ন। মাস শেষে নির্ধারিত চার-পাঁচটি দিনের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য যখন থেকে শেষ হয়ে গেল, প্রায় তখন থেকেই অর্থাৎ এ বছরের গোড়া থেকেই শারীরিক অস্বস্তি আর টুকটাক ব্যথা-বেদনা নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে তার। কারণে-অকারণে দুশ্চিন্তা করার প্রবণতাও বেড়েছে অনেকখানি।

ঠান্ডা জলের ছিটা চোখেমুখে পড়ায় এখন অনেকটা ভালো লাগছে তার। রাত প্রায় দুটো বাজে। তিসাকে ফোন করার জন্যে এমন কিছু বেশি দেরি হয়নি। এখান থেকে দুঘণ্টা পিছিয়ে আছে ওর সময়। তাছাড়া বাবার মতোই ছেলেমেয়ে দু'জনেই রাতজাগা মানুষ। ওরা ঘুমোতে যায় ভোররাতে। তবু ভয়ে ভয়েই টেলিফোন নম্বরগুলো টেপে মেয়ের।

ভয়, কেননা মাত্র পরশুই কথা বলেছে। এতো তাড়াতাড়ি আবার ফোন করলে মেয়ে সাধারণত বিরক্ত হয়। ঘরেই ছিল তিসা। এ-কথা সে-কথার পর সোমা জানতে চায়, মেমোরিয়াল ডে উইকএন্ডে কোনো কিছু করার পরিকল্পনা আছে কিনা তার। তা নইলে মা-মেয়ে একসঙ্গে কিছু করার কথা ভাবা যেতে পারে। অনেকদিন কোথাও যায় না সোমা। মেয়ের কাছে যেতে পারে তখন। অথবা তিসা আসতে পারে এখানে। কিন্তু মায়ের প্রস্তাব শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিসা জানায়, এই

উইকএন্ডে নিউইয়র্ক থেকে তার বন্ধু সোনিয়া আর মারিয়া আসছে তার কাছে। ওরা ঠিক করেছে, সবাই মিলে পাশের স্টেটে ওয়াইনারি দেখতে যাবে। তিসা অবশ্যই কিছু করতে চায় মায়ের সঙ্গে। কিন্তু সেটা হতে হবে লেবার ডে অথবা থ্যাংকস গিভিং উইকএন্ডে। সোমা বোঝে, দেড় মাস সময় যথেষ্ট নয় ওদের সঙ্গে কোনো কিছু করার পরিকল্পনা মেলাবার জন্যে। তাছাড়া এ-বয়সে মা-বাবার চাইতে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতেই বেশি আগ্রহী থাকবে তারা, এটাই তো স্বাভাবিক। শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করে সোমা। আরো অনেকক্ষণ ঘুম আসে না। একবার মনে হয়, অতুলপ্রসাদের বা রজনীকান্তের গান ছেড়ে দেয় নিচু শব্দে। পরে ভাবে, থাক। আজকাল কী যেন হয়েছে।

ঘন ঘন আর গান শোনে না বলেই কিনা কে জানে? প্রিয় কোনো গান শুনলে, তার একটি কী দুটি কলি সারাক্ষণ কানে বাজতে থাকে একটানা। কিছুতেই থামে না। সোমা আবারও জল খায়। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে ঘুমের প্রত্যাশায়। এমন একটা সময় ছিল, যখন অবিনাশ শুতে না-এলে ঘুমুতে পারতো না সোমা। অবিনাশকে জড়িয়ে ধরে তার গলার কাছে মাথা গুঁজে না-দিলে ঘুম আসতো না। এ-পুরনো অভ্যেস কাটিয়ে উঠতে অনেকদিন লেগেছে। এখনো পুরোপুরি রেশ যায়নি তার। কোনো কোনো রাতে ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। অবিনাশ প্রতিরাতে একা একা বসে টেলিভিশনে পুরনো দিনের ছবি দেখে। দেখতে দেখতে কখনো কখনো হাসে, অস্পষ্ট মন্তব্য করে বা কেবল আবিষ্ট হয়ে চুপচাপ কথা শোনে পাত্রপাত্রীর। এসময়টা তার একান্তই নিজের। অবিনাশ তখন অন্য আরেক জগতের বাসিন্দা যেখানে তার নিজস্ব অস্তিত্ব ছাড়া থাকে শুধু টিভির পর্দার চরিত্রগুলো।

ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে যায় আজ। অ্যালার্ম বেজেছে কী বাজেনি খেয়াল করতে পারে না সোমা। এরই মধ্যে কখন ঘুম থেকে উঠে অফিসে চলে গেছে অবিনাশ। রাতে কখন সে ঘুমুতে এসেছিল, কখনই-বা উঠল, কিছুই জানে না সোমা। সাধারণত সাড়ে নটা দশটার আগে কাজে যায় না অবিনাশ। কিন্তু আজ ব্যাংক থেকে কারা যেন আসবে। জরুরি মিটিং আছে তাদের সঙ্গে। কালরাতেই তাই ডিম সেদ্ধ করে, সিরিয়েলের বাটি ও একটি কলা টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল সোমা। শোবার ঘরের জানালার ব্লাইন্ডগুলো খুলে দেয় সোমা। পুবের দিকে মুখ করা এই ঘর। এক ঝাঁক রোদ্দুর এসে ঝিকমিক করতে থাকে ঘরের মেঝেতে পাতা ভারি কার্পেটের ওপর। এই

সাত সকালেই কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলা করছে সামনের গোলচত্বরে। সোমা নিচের তলায় রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের জল চাপায়। এমনিতে সকালবেলা কিছু মুখে না দিয়েই সে চলে যায় অফিসে। চা-কফি পর্যন্ত নয়। আজ হঠাৎ ইচ্ছা হলো অফিসে দেরি করে যাওয়ার। তাই নিজের জন্যে আজ ব্রেকফাস্ট বানাবার কথা ভাবছে সোমা। দাঁত মাজতে মাজতে বাথরুমের আয়নায় মুখের সেই অসঙ্গতি আবার খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করে। পরিবর্তনগুলো আজ সকালে তেমন প্রগাঢ় মনে হয় না আর। আশ্চর্য, এরই মধ্যে সব মেনে নিল সোমা? কানের দুপাশে জুলফিতে একটা দুটো রুপোলি চুল চিকচিক করছে। সোমা বোঝে বার্ধক্যের জয় বোধহয় এখানেই যে, তা হঠাৎ করে একদিন এসে ভর করে না শরীরে। আস্তে আস্তে একটু একটু করে তার লক্ষণগুলো প্রকাশিত হয় শরীরে, যাতে মানুষও ধীরে ধীরে তা সয়ে নিতে পারে। মেনে নিতেও কষ্ট হয় না তেমন।

সোমা ঠিক করে আজ বেশ দেরিতে কাজে যাবে। ফলে নিজের জন্যে ভালো করে ব্রেকফাস্ট বানায় সে। কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ দিয়ে বানানো অমলেট আর টোস্ট করা ইংলিশ মাফিনের সঙ্গে কড়া করে চা খায় সোমা। খেতে খেতে বাইরের দিকে তাকায়।

কালচে-কমলা রংয়ের ছোট ছোট দুটি রবিন পাখি কিচিরমিচির করছে ডেকের ওপর। অনেকদিন রবিন পাখি দেখে না সোমা। এ পাখিগুলো এতো কাছে তো কখনো আসে না! নাকি আসে এই সাতসকালে যখন তাড়াহুড়োয় বাইরের দিকে তাকাবার সুযোগ হয় না সোমার! রান্নাঘরের পেছনের দরজাটা অতি সন্তর্পণে খুলে মুখটা একটুখানি বার করতেই ফুরুৎ করে রবিন দুটো উড়ে গিয়ে পেছনের জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যায়। সোমা ততক্ষণে ঠিক করে ফেলেছে আজ আর কাজে যাবে না। অনেকগুলো ছুটির দিন জমা হয়ে আছে।

অবিনাশের যা ব্যস্ততা, এই গরমে কোথাও দূরে বেড়াতে যাওয়া হবে, মনে হচ্ছে না। আজ অফিসে যাওয়ার একটাই বড় তাড়া ছিল, আর তা হলো আজ ক্যারলের জন্মদিন। অফিসের মধ্যে এই একটি মেয়ের সঙ্গেই প্রকৃত অর্থে হৃদ্যতা রয়েছে সোমার। ওরা পরস্পরের জন্মদিন মনে রাখে। গত ডিসেম্বরে দেশ থেকে আসার সময় আড়ং থেকে ক্যারলের জন্যে রুপোর হার, কানের দুল ও ব্রেসলেট নিয়ে এসেছিল সোমা জন্মদিনে দেবে বলে। ছুটি নেওয়ার সিদ্ধান্তটা অফিসে ফোন করে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যারলকেও হ্যাপি বার্থডে জানাতে ভুললো না সোমা। সেই সঙ্গে ঠিক করল, দুজনে মিলে অলিভ গার্ডেনে লাঞ্চ খাবে আজ। ইতালিয়ান খাবার ক্যারলের বড়ই পছন্দ। ওর জন্মদিনে ওর পছন্দের খাবারই খাওয়াবে সোমা। ক্যারল যেন অফিস থেকে ঠিক পৌনে বারোটায় অলিভ গার্ডেনে চলে আসে। অফিসে আজ যাবে না এ-সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর হঠাৎ করেই কেমন যেন হালকা ফুরফুরে লাগতে থাকে তার। একবার মনে হলো অবিনাশকে ফোন করে জানায় সিদ্ধান্তটার কথা। পরক্ষণেই মনে হলো, দরকার নেই। শুধু শুধু এক গাদা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। শরীর খারাপ যে নয়, তাও বোঝাতে হবে।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরোয় সোমা। ডেকে পেতে রাখা চেয়ারে বসে সামনের গোলাকার কাচের টেবিলটির ওপরে রাখা অ্যাসপ্যারাগাস গাছটির দিকে তাকায়। প্রায় মরেই গিয়েছিল গাছটা। রোদ আর বৃষ্টির সঙ্গে উত্তাপ মিলে এ-কদিনেই গাছটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এই তো গত মাসেই ঘর থেকে বের করে এখানে এনে রেখেছিল গাছটা। সোমা কাঠির মতো একটা শুকনো ভাঙা ডাল যত্নের সঙ্গে ছোট্ট গাছটির গা থেকে সরিয়ে দেয়। চা খেতে খেতে চারদিকে তাকায় সোমা। পাশের বাড়ির কুকুরটা সোমাকে দেখে একবার ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

কাচের বড় জানালা দিয়ে ওদের পেছনের এই ঘরের ভেতরটা প্রায় সবটাই দেখা যায়। কুকুরটা বেশ বড়সড় হয়ে গেছে। এই তো গতবছরই এতটুকুন ঘরে এনেছিল। ওদের বিশাল টিয়া পাখিটা আজো একই লয়ে কী যেন বলে চলেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সোমা। পাখিটিকে আর্জেন্টিনা থেকে নিয়ে এসেছে ওরা। এ-বাড়ির কর্ত্রী সেখানকারই মানুষ। তার জন্মদিনে নাকি মায়ের উপহার ছিল সেটি। কতদিন হয়ে গেল পাশের বাড়ির ওদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হয়নি, কথা বলা তো দূরের কথা। ভোরবেলা ঊর্ধ্বশ্বাসে অফিসে যায়, সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। সপ্তাহান্তে হয় ঘরের কাজ, নয়তো শহরে যাওয়া বা কোথাও নেমন্তন্ন খাওয়া, এই তো জীবন। সোমা আজ মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করে পাখিটি কী বলছে। আর আশ্চর্য! একটু কান পাততেই সে স্পষ্ট শুনতে পায় টিয়াপাখিটি বারবার করে বলছে, হাউ আর ইউ? সোমা হাসে। ওদিকে ডেকের রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে পাখিটির দিকে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে হেসে বলে, 'আই অ্যাম ফাইন, হাউ ডু ইউ ডু?' টিয়া চুপ করে যায়। সোমা ডেক ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে ঘাসের ওপর নেমে আসে। হাঁটতে হাঁটতে সীমানা ঘেঁষে লাগানো স্টিলের বেড়ার কাছে চলে আসে। এই কয়েক সপ্তাহ আগেও ওদের বাগানের সীমানার ওপারের গাছগুলোতে একটিও পাতা ছিল না। লম্বা, কালো অথবা সাদা সাদা বিশাল কাণ্ড পাটখড়ির মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকত। পাতা না থাকায় ওপাশের বাড়িঘরগুলো স্পষ্ট দেখা যেত। কিন্তু এরই মধ্যে কলাপাতা রঙের হালকা সবুজপাতায় ঘন হয়ে এসেছে বন। বার্চ আর ম্যাপলের গাছগুলোর পাতা হাওয়ায় মৃদু শব্দ করছে। বেশ সতেজ ও সুস্থ দেখাচ্ছে গাছগুলোকে এখন। যেন হঠাৎ করেই সব গাছের শরীরে পাতা এসে জড়ো হয়েছে। গাছের ফাঁক দিয়ে বনের ঠিক মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট জলধারাটির দিকে তাকায় সোমা। সরু হলে হবে কি, কুলকুল শব্দ করে পাথরের কুচির মধ্য দিয়ে নিরন্তর বয়ে চলেছে ঝর্ণাটি। গত কয়েকদিন একটানা বৃষ্টি হবার জন্যেই বুঝি জলধারাটি অনেক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এখন। দুটো সাদা কাণ্ডের বিশাল লম্বা বার্চ গাছের মাঝখান দিয়ে নালাটির উলটোধারে পড়ে থাকা বিশাল বিশাল পাথর খণ্ডগুলোর দিকে চোখ পড়ে সোমার। বিকেলের দিকে এই নির্জন জায়গাটিতে মাঝে মাঝে দু-চারটি অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে আসতে দেখা যায়। প্রেম করার জায়গা হিসেবে, বিশেষ করে পয়সাকড়িহীন কিশোর-কিশোরীদের প্রেম নিবেদনের জন্যে জায়গাটি উত্তম সন্দেহ নেই।

এখন এই সাতসকালে অবশ্য ওদিকে কেউ নেই। এলে আসবে ওরা বিকেলের দিকে, পড়ন্ত রোদে – তাও কেবল এই বসন্ত আর গ্রীষ্মের কটা মাসেই। সোমা হঠাৎ লক্ষ্য করে পাথরগুলোর গায়ে কী যেন লেখা লাল, নীল, সাদা রং দিয়ে। চেষ্টা করেও পড়তে পারে না সোমা। এর আগে এখান দিয়ে কতবার হেঁটেছে। কখনো চোখে পড়েনি এই রং বা লেখা। ভালোমতো ওদিকে কখনো তাকিয়েছে কিনা সন্দেহ। হঠাৎ সোমার খুব আগ্রহ হয়, কী লেখা আছে পাথরগুলোতে জানার জন্যে।

সোমা দ্রুত ঘরে ফেরে। কফি-টেবিল থেকে চশমাটি তুলে চোখে পরে আবার বেরিয়ে আসে। এ-অঞ্চলের গাছগাছালির মধ্যে পাইন, স্প্রুস, উইলো অথবা ওক তেমন দেখা যায় না যেমনটি সে দেখতে পেত দক্ষিণে। তা সত্ত্বেও কী দারুণ সবুজ চারদিক! সোমা চশমা চোখে দিয়ে আবার সেই আগের জায়গাটিতে এসে দাঁড়ায় যেখান থেকে ওই ছোট্ট জলধারা আর বিশাল বিশাল পাথরগুলো দেখা যায় গাছের ফাঁক দিয়ে। হ্যাঁ, এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সোমা। পাথরের গায়ে বড় করে নীল রঙে লেখা আছে – লিসা। তার নিচে লাল রঙের বিশাল এক হৃদয়। তারও নিচে সাদা রঙে লেখা রন। অর্থাৎ লিসা রনকে ভালোবাসে। সোমা হাসে। বড় সুন্দর নারী পুরুষের – বিশেষ করে উঠতি-বয়সী ছেলেমেয়েদের পরস্পরের প্রতি এই আকর্ষণ ও অভিব্যক্তি। লনের ঘাসগুলো এরই মধ্যে বেশ বড় হয়ে গেছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই ঘাস কাটা হয়েছে। এরই মধ্যে কেমন করে এতো বড় হয়ে গেল এগুলো! সোমা লক্ষ করে বাঁ-পাশের বাড়ির মেরি ডাকছে সোমাকে। বহুদিন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী থেকে গতবছরেই মারা গেছে মেরির চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনের স্বামী পল। এখন এতো বড় বাড়িটিতে সে একাই থাকে। ছেলেমেয়েরা যে-যার জায়গায়।

এই সাতসকালেই ইস্ত্রি করা স্কার্ট আর ব্লাউজ পরে একেবারে ফিটফাট মেরি। টমেটো গাছে জল দিচ্ছিল সে। সোমা কাছে দিয়ে দাঁড়ায়। গাছের গোড়ায় মাটি নেড়ে দিতে দিতে সোমার সঙ্গে গল্প করে মেরি। এই মহিলা পড়াশোনা বেশি করেনি। চাকরি-বাকরিও করেনি জীবনে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় না যে সে হাইস্কুলও পাশ করেনি। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা না করলেও সাধারণ বুদ্ধি ও জাগতিক প্রজ্ঞা অসাধারণ মেরির। স্থানীয় লাইব্রেরিতে নিয়মিত যায়, বই পড়ে, দেশের-জগতের হালচালের খবর রাখে। মেরির সঙ্গে অনেকদিন পর আজ দেখা হলো সোমার। শীতের সময় দেখা হয়েছিল, যখন তারা দুজনেই গাড়ি পরিষ্কার করছিল এক বরফের দিনে। মেরির কথা শুনতে খুব ভালো লাগে সোমার। একদিন এমনি করে মেপল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল তারা গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। স্বামীর মৃত্যু শোক তখনো থিতিয়ে আসেনি। এরই মধ্যে যে গভীর উপলব্ধি আচ্ছন্ন করেছিল মেরিকে, তা সোমার কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি মেরি। বলেছিল, দীর্ঘ বিবাহিত জীবনযাপনের পর একজন চলে গেলে আরেকজনের যে-কষ্ট আর একাকিত্ব দেখা দেয়, তার মূল কারণ দুটো। এক, একটা চলমান জীবনে – অতি অভ্যস্ত ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় হঠাৎ একটা ছেদ পড়ে যায়। এই ‘ডিজরাপশন অফ কন্টিনিউটি’ মেনে নেওয়া কষ্টকর। দুই, কিছু আক্ষেপ নাকি থেকেই যায়। যা করার ছিল, করা যেত, অপর পক্ষ চেয়েছিল বা শখ করেছিল কিন্তু যে-সাধ অপূর্ণ রয়েছে, সেইসব আক্ষেপ, কিছু কিছু, সবসময়েই তাড়া করে বেড়ায়। সোমার অনেকবার মনে হয়েছে, মেরি এদেশে জন্মেছে, এদেশে বেড়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু ওর চিন্তায়-চেতনায় কোথায় যেন একটা পূর্বাঞ্চলীয় গন্ধ রয়েছে। এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এতোটা পিছুটান দেখেনি সোমা। ওর স্বামী যখন পক্ষাঘাতে বিছানায় পড়া ছিল, একটি অল্পবয়সী নার্স এসে প্রতিদিন তার দেখাশোনা করে যেত। সেই নার্সই পলকে বিছানায় বসিয়েই চান করাত, গা মুছে দিত, পোশাক পালটে দিত। ফিজিওথেরাপি করাত। কিন্তু মেরি প্রতিদিন নিজের হাতে স্বামীকে খাওয়াত তিনবেলা, মাঝেমাঝেই চুল আঁচড়ে দিত। পাশে বসে বই পড়ে শোনাত। দুজনে মিলে পুরনো দিনের গান শুনত টেপে-রেডিওতে। এই গভীর আত্মনিবেদন, এমন পারস্পরিক মানসিক নির্ভরশীলতা দেখে মুগ্ধ হতো সোমা। কিন্তু এই মেরিই একদিন বলেছিল, মেয়েদের কাছে পুরুষরা দুটো জিনিসই প্রধানত চায়। এক, তার সৌন্দর্য ও যৌবন। দুই, নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ। মেরি বলেছিল, নারী-পুরুষের সম্পর্কের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, পুরুষ কখনো তার পার্টনারের সঙ্গে বৃদ্ধ হতে চায় না। বৃদ্ধ স্ত্রীকে পাশে রেখেও সে আজীবন তরুণ থাকতে চায়। পলকে দেখিয়ে তামাশা করে কতবার বলেছে মেরি, শরীর নাড়াতে পারে না, তাতে কী হলো? চোখের দৃষ্টি দিয়ে এখনো গিলে ফেলতে চায় তরুণী নার্সটিকে।

পল হেসে মেরির হাতটি সস্নেহে চেপে ধরত তখন। সোমার মনে হতো পলের মৃত্যুর পর মেরি বেশিদিন বাঁচবে না, অথবা আর কখনো স্বাভাবিক হয়ে উঠবে না। প্রথমে সে আসলেই খুব মুষড়ে পড়েছিল। কারো সঙ্গে দেখা করত না – কথা বলতো না। ঘরের বাইরে বেরুত না। একদিন কেবল সোমাকে বলেছিল, দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের সবটাই যে মধুমাখা ছিল তা নয়। অনেক তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া, মন কষাকষি হয়েছে। এমনকি ব্যভিচারের ঘটনাও ঘটেছে। তবু, একটা মানুষ ছিল এ-ঘরে সারাক্ষণ, এখন আর সে নেই, মাথা কুটলেও তাকে আর কখনো দেখা যাবে না, পাওয়া যাবে না – এই বোধটি বড় যন্ত্রণাদায়ক। আস্তে আস্তে মেরি আবার ঘরের বাইরে বেরুতে শুরু করেছে। ফুলের, তরি-তরকারির বাগান করে বসন্তে-গ্রীষ্মে। শীতে অল্প বরফ হলে নিজেই পরিষ্কার করে। বেশি হলে লোক ডাকে। হেমন্তে শুকনো পাতা গুছিয়ে ব্যাগে ভরতেও দেখেছি তাকে। এ বয়সে এতো কাজ করে বলেই এমন সুস্থ ও ফিট রয়েছে। শরীরে এক ফোঁটা বাড়তি মেদ নেই মেরির, আজই তা ভালো করে লক্ষ্য করল সোমা। মেরি তার বাগান থেকে একটা বড় সাদা লিলি ফুল তুলে দিল সোমার হাতে। লম্বা সরু ডগার ওপর কলকের মতো সবজে সাদার বিশাল এক লিলি। মেরিকে ধন্যবাদ দিয়ে ডান পাশের লন ভেঙে নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় সোমা। সামনের ফুলের বাগানটিতে লাল, হলুদ কত টিউলিপ ফুটেছে। এরই ভেতর কয়েকটা টিউলিপের গায়ে আবার একাধিক রং – লাল-হলুদ, অথবা সাদা-লাল। হলুদ অথবা হলুদ-সাদার অসংখ্য ড্যাফোডিলসও রয়েছে।

এগুলো সব হঠাৎ করে আজই কী একসঙ্গে ফুটে উঠল? কই! আগে তো লক্ষ করেনি। এ-পথ দিয়েই তো প্রতিদিন ভোরে কাজে যায়, বিকেলের পড়ন্ত বেলায় এ-পথেই ঘরে ফেরে। কলিগুলো দেখেছিল মনে আছে।

কবে সব ফুল হয়ে ফুটে উঠল, টেরই পায়নি সোমা। বেগুনি আর গোলাপি রঙের সহস্র সহস্র কুঁড়ি অ্যাজালিয়ার ঝাড়ে। এখনো ফুটতে তিন-চারদিন বাকি। গোলাপ গাছগুলোর কাছে এসে দাঁড়ায় সোমা। বাড়ির ঠিক দুপাশে দুটো বড় গোলাপের ঝাড়। হ্যাঁ, সেখানেও বেশ কিছু কলি দেখা দিচ্ছে। ডানদিকের গোলাপগুলো হলুদ আর লাল। বাঁ-দিকেরগুলো গোলাপি আর সাদা। এগুলো সব নিজের হাতে লাগানো সোমার। বাড়ির ঠিক সামনে রেড চেরির গাছে অসংখ্য গোলাপি কুঁড়ি। মেরির বাড়ির সামনে ডগউড গাছটিতে একটিও পাতা নেই। কিন্তু সাদা সাদা ঝাঁকড়া ডগউডে ছেয়ে গেছে দীর্ঘ গাছটি। তার ঠিক পাশেই ক্র্যাব-অ্যাপল গাছটিতেও অনেক লালচে গোলাপি ফুল ফুটেছে। এই সময়টা বেশ লাগে। শীতের শেষে গাছে পাতা আসার আগেই ফুলে ফুলে ভরে যায় কাণ্ড – গাছের সমস্ত ডালাপালা।

প্রথম প্রথম এদেশে যখন এসেছিল সোমা, অবাক বিস্ময়ে গাছের এ ফুল ফোটা দেখত – দেখে পুলকিত হতো, শিহরিত হতো। পরিতৃপ্ত হতো চোখ। সোমা জানে না, আস্তে আস্তে কখন বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। চোখ সরিয়ে কি নিয়েছে? আসলে ঘরের ভেতর চোখ দেওয়ার জিনিস আস্তে আস্তে বড্ড বেশি বেড়ে গেছে। দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে তা। রাস্তার ওপাশে রডরিগাসদের বাড়ির সামনে রোজ-অব-শ্যারনের লম্বা গাছটিতে প্রচুর গাঢ় গোলাপি রঙের ফুল ফুটে আছে। পাশে আরেকটি বাচ্চা রোজ-অব-শ্যারন গাছ। তাতেও বেশ কয়েকটি ফুল। সাদার ভেতর মধ্যিখানে খয়েরি রঙের ওই ফুল। এ-গাছটির নাম যখন জানতে পেরেছিল সোমা, খুব অদ্ভুত লেগেছিল তার। কীরকম রোমান্টিক নাম, রোজ-অব-শ্যারন। পাতাগুলো দেখে মনে হয়, ঠিক জবা গাছের মতো। ফুলগুলোও দেখতে লাল জবা অথবা ঝুমকো ফুলের মতো। মাঝখানে পরাগসহ একটা লম্বা ডাঁটি বেরিয়ে থাকে। ও-বাড়ির কর্ত্রী বারবারাকে জিজ্ঞেস করেছিল সোমা, সে জানে নাকি এ-গাছ হেবিসকাস গাছের ফ্যামিলি কিনা। বারবারা ঠিক বলতে পারেনি।

সামনের বাঁধানো বড় গোলাকার চত্বরটি, যার চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মোট ছয়টি বাড়ি, তার ভেতর এখন পরমানন্দে বাইসাইকেল চালাচ্ছে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হঠাৎ সোমার মনে হলো, তাই তো, আজ যে গুড ফ্রাইডে। স্কুল ছুটি। অনেক স্কুল-কলেজ অবশ্য এ-পুরো সপ্তাহজুড়েই বন্ধ। বসন্তের ছুটি। অধিকাংশ অফিস অবশ্য খোলা আজ। সোমাদের বাড়ির ঠিক উলটোদিকের বাড়ির সামনে দাঁড় করানো বাস্কেটবলের উঁচু বাস্কেটটিতে একটি কালো আর আরেকটি সাদা কিশোর পালা করে বাস্কেটবল ছোড়ার মহড়া দিচ্ছে। সাদা ছেলেটিকে চিনতে পারে সোমা। সোমাদের বাঁ-পাশের বাড়ির ছেলে নিক। এরই মধ্যে আরো যেন লম্বা হয়ে গেছে ছেলেটি। এই নিকই তাদের ল্যাটিন আমেরিকান টিয়াটিকে কথা শেখাবার চেষ্টা করে সবসময়। ধৈর্য আছে বটে ছেলেটির। একই কথা কতবার করে বলে টিয়াটিকে।

সোমা আর দেরি করে না। লাঞ্চে যাওয়ার আগে নিজেকে একটু পরিপাটি করে নেবে আজ। কতদিন – কতদিন হয়ে গেল নিজের শরীর, মুখমণ্ডলের কোনো পরিচর্যা করে না সোমা। বাথরুমে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখখানা আরেকবার দেখে। শার্লিকে দিয়ে চুলগুলো আবার আগের মতো কালো করে নেবে আজ। এই যে লালচে আভা তার চুলের ভেতর, এটা তার চুলের আসল রং নয়। কপালের ও জুলফির কাছে কয়েকটি রুপালি চুলের ঝিকিমিকি বাদ দিলে তার চুল মূলতঃ কালো। লালচে বাদামি অথবা মেহেদি রঙের মোটেও নয়। সোমা শুনেছিল, প্রথম যৌবনে অবিনাশের ফ্যান্টাসি ছিল, এক লালকেশি সাদা বিদেশিনীর সঙ্গে অন্ততঃ একটি রাত কাটাবার। অবিনাশকে চমকে দেওয়ার জন্যেই মেহেদি রঙের ছোঁয়া কেশে ধারণ করতে সাহস করেছিল সোমা। তাছাড়া, শার্লিও বলেছিল বাদামি গায়ের রঙ আর কালো চুলের সঙ্গে এই লালচে আভা খুব ভালো যায়। উজ্জ্বল করে তোলে বাদামি রঙের মেয়েদের।

অবিনাশ কখনো লক্ষ করেছে মনে হয় না, সোমার চুলের এই রঙ পরিবর্তন। এই রক্তিম আভা। সোমা ঠিক করে, আজ আবার তার নিজস্ব চুলের রং, অর্থাৎ কালোতে ফিরে যাবে। সেইসঙ্গে একটা ফেসিয়ালও নিয়ে নেবে। শার্লির সময় থাকলে হাতে-পায়ের নখগুলোর পরিচর্যাও করা যেতে পারে। আর্থরাইটিসের জন্যে হাঁটু বাঁকা করে পায়ের নখগুলো কাটতে আজকাল বড্ড বেশি কষ্ট হয় সোমার।

জামাকাপড় বদলে গাড়ি নিয়ে শার্লির দোকানের সামনে এসে যখন দাঁড়ালো সোমা, তখন বেলা সাড়ে নয়টার কাছাকাছি। চুল ছাড়াও শার্লি সোমার ভ্রু দুটো ঠিক করে দিল। ঠোঁট ও নাকের মাঝখানটিতে কয়েকটি অবাঞ্ছিত ছোট ছোট লোম, যা সোমাকে মাঝে মাঝে বিব্রত করত, তাও তুলে ফেলতে ভুলল না। চুলে রঙ মাখিয়ে, ফেসিয়াল ও হাতের-পায়ের নখের পরিচর্যা শেষ করল শার্লি। পা-দুখানাকে হালকা গরম জলে যখন ভিজিয়ে রাখল, কী অসম্ভব আরাম যে লাগল সোমার! মনে হলো, সে যেন এমন পরিচর্যা বহুকাল পায়নি। শার্লিজ বিউটি দোকানটি আসলেই অনন্য। একই জায়গায় সবকিছুর পরিচর্যা পাওয়া প্রায় অসম্ভব এদেশে। শার্লির এখানে না এলে চুলের জন্যে এক জায়গায়, মুখের জন্যে অন্য জায়গায়, নখের জন্যে তৃতীয় জায়গায় যেতে হতো সোমাকে। এবার শার্লির এখানে এসেছে সে প্রায় নয় মাস পর। সোমা ঠিক করে, এখন থেকে মাসে অন্তত একবার আসবে সে। আরাম করার, পরিচর্যা পাওয়ার তারও অধিকার আছে। শার্লি আজ সোমার ঘাড়টাও ম্যাসেজ করে দিল, যেহেতু হাতে সময় ছিল তার, আর এই সাতসকালে ভিড়ও ছিল না দোকানে। ভীষণ ভালো লাগছে সোমার এখন। শার্লির পাওনা টাকার সঙ্গে আজ বাড়তি দশটি ডলার দিলো সোমা টিপ্‌স হিসেবে।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, রোদটা বেশ কড়া হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। ক্যারলের

সঙ্গে খেতে যেতে এখনো এক ঘণ্টার বেশি বাকি। গাড়ির সানভাইজরের গায়ে আটকানো আয়নায় নিজের মুখখানা দেখে নিজেরই ভালো লাগছে সোমার। গালে, কপালে, থুতনিতে হাত দিয়ে নিজের ত্বকের মসৃণতায় তৃপ্ত হয় সোমা। বড়দি সবসময় বলে, সোমা নাকি মায়ের মতো সুঠাম ও কোমল ত্বক পেয়েছে। চুলে রঙ করায় আর খানিকটা আগা কেটে ফেলায় চুলগুলো আর আগের মতো পাতলা দেখাচ্ছে না।

হাতে পুরো একটি ঘণ্টা। আজকের দিনের প্রতিটি মুহূর্ত খুব মূল্যবান মনে হচ্ছে সোমার। এ-সময়টি ঘরে ফিরে গিয়ে আবার এখানে এসে শুধু শুধু অপচয় করে কী লাভ যেহেতু অলিভ গার্ডেন রেস্টুরেন্টটি এ-পাড়াতেই? সোমার হঠাৎ মনে পড়ে ডেভিড অনেকদিন বলেছে তার গ্যালারিটি একবার দেখে যেতে। তার নিজের এবং সংগৃহীত অন্য অনেকের বেশ কিছু নতুন পেইন্টিং এসেছে। ডেভিড সোমার প্রাক্তন সহকর্মী। যদিও ডেভিডের গ্যালারি খোলা থাকে বেলা দুটো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত, যেহেতু গ্যালারির দোতলাতেই সে থাকে, এখন গেলেও সোমাকে গ্যালারি ঘুরিয়ে দেখাতে ডেভিডের অসুবিধা হবে না। একথা ডেভিডই বলেছে তাকে। সোমা ঠিক করে ফেলে, ডেভিডকে ফোন না করেই যাবে। হঠাৎ করে গিয়ে তাকে চমকে দেবে।

আজ থেকে ছয়-সাত বছর আগে একটা কাণ্ডই করেছিল ডেভিড। সে-কথা মনে করে পরে ওরা দুজনেই প্রচুর হেসেছে। কিন্তু সে-রাতে তখন সেটা ঠিক হাসির ব্যাপার ছিল না। সেই সময় প্রায় প্রতিদিন তেরো-চোদ্দো ঘণ্টা করে কাজ করতে হচ্ছিল সোমা, ডেভিড, ক্রিস্টির সেই ম্যাজেলান হেলথ প্রজেক্টে। একরাতে ডেভিডের কী হলো। কাজ করতে করতে হঠাৎ সোমাকে বলে বসল, তার একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে সেই মুহূর্তে। রয়েছে সোমার কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ বা চাওয়া। হয়তো খুবই সামান্য –হয়তো বিশাল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার জন্যে এটা জানানো বিশেষ জরুরি। সোমা সাহস দিলেই কেবল তা জানাবে ডেভিড। সোমা একটু চমকায়। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চায় ডেভিড কী ভাবছে। ক্রিস্টি ততক্ষণে চলে গেছে বাড়ি। কেবল ডেভিড আর সোমা কাজ করছে তখন। ডেভিড খানিকক্ষণ দ্বিধার পর জানায়, সোমার খোলা চুলে একবার শুধু ডেভিড তার হাতখানা রাখতে চায়। ডেভিডের বয়স অন্তত দশ বছর কম সোমার চেয়ে। করপোরেট জগতে আর্থিক হিসাব-নিকাশের কাজ করলেও ডেভিড মূলত একজন শিল্পী। ছবি আঁকে সে। সোমা এক মুহূর্ত ভাবে। তারপর, 'অফ কোর্স' বলে হেসে ডেভিডের ডান হাতখানা তুলে নিজের মাথার ওপর চুলে রেখে বলে, 'কী? হলো, এবার?' ডেভিড শুধু একবার আলতোভাবে সোমার একগুচ্ছ চুল মুঠো করে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলে, 'অনেক ধন্যবাদ'। সোমা বোঝে, ডেভিডের এ সাময়িক আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তির জন্যে এই সামান্য ছোঁয়াটি বড় জরুরি ছিল। কিন্তু এরপর বেশ কিছুদিন সে খোলা চুলে অফিসে আসেনি আর। এর বছরখানেক পরেই অবশ্য ডেভিড হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে নিজের স্টুডিও ও ছবি আঁকা নিয়ে মেতে থাকা শুরু করে। ওর স্টুডিও সেট করার সময় সোমা যতটা সম্ভব সাহায্য করেছে। স্থানীয় কাগজে বিজ্ঞাপন

দেওয়ার ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে, ওয়েবসাইট ডিজাইন করা, জায়গা নির্বাচন, সব ব্যাপারেই সঙ্গে ছিল সোমা। ডেভিডের এক সম্পদশালী কাকা হঠাৎ সে-সময়ে মারা যাওয়ায় ডেভিড আকস্মিকভাবেই একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা পেয়েছিল, যা দিয়ে তার বহুদিনের শখের এ-গ্যালারি শুরু করতে পেরেছিল সে।

ঘরেই ছিল ডেভিড। দরজা খুলে সোমাকে দেখে তো অবাক! 'সোমা? তুমি?' পায়জামা আর গেঞ্জি পরা ডেভিড দরজায় দাঁড়িয়ে। 'এ-রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, দেখে যাই তুমি কেমন আছ?'

'ভালো আছি। তোমার কী খবর? তোমার স্বামী?'

'ভালো। সব ভালো।' সোমা হাসে।

ডেভিড কিন্তু সোমাকে ঘরে যেতে আহ্বান করে না। ঘরের ভেতর মানুষের নড়াচড়ার ছায়া, টুংটাং বাসনের শব্দ। সোমা বোঝে অসময়ে এসে পড়েছে সে। ডেভিডের গ্যালারি দেখার উপযুক্ত সময় এটা নয়।

'আমার আজ হাতে একটুও সময় নেই। এক জায়গায় যাচ্ছি। আরেকদিন আসব তোমার স্টুডিও দেখতে। ইট ওয়াজ নাইস সিয়িং ইউ ডেভিড।' সোমা বেরিয়ে আসে ওখান থেকে। শূন্যস্থান পূর্ণ হতে সময় লাগে না, এটা কে না জানে? তবু ফোন না করে এভাবে হঠাৎ করে চলে আসায় নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগছে সোমার। অলিভ গার্ডেনে যেতে এখনো প্রায় চল্লিশ মিনিট বাকি। ড্রাইভ করতে করতে রাস্তার দুপাশের দোকানপাট দেখে সোমা। এ অঞ্চলে কেউ হাঁটে না রাস্তায়। কোনো ফুটপাতও নেই রাস্তার দুপাশে। বড় শহর থেকে এ শহরতলিতে এসে প্রথম প্রথম তাই কেমন অন্যরকম লাগতো সবকিছু। এখন অনেকটা অভ্যেস হয়ে গেছে। সোমা একটি কসমেটিক্সের দোকানে ঢোকে। মুখে ক্রিম আর ঠোঁটে কখনো কখনো লিপস্টিক ছাড়া অন্য কোনো প্রসাধন নেয় না সোমা। তবে তার একটা বড় দুর্বলতা আছে, সেটা সুগন্ধির প্রতি। অবিনাশও জানে সেকথা। তাই গিফট বলতে সে বরাবরই সোমার জন্যে পছন্দমতো পারফিউমই কিনে দেয়। কিন্তু ইদানীং অফিসের কাজ আর নিজের পোশাক-আশাক নিয়ে সে এতোই ব্যস্ত, সোমার জন্যে কোনো পারফিউম গত একবছরেও কেনার সময় হয়নি। অথচ নিজের জুতোর সঙ্গে প্যান্টের সঙ্গে মোজাটা পর্যন্ত ম্যাচ করে পরে আজকাল অফিসে যায় অবিনাশ। এতোটা সচেতন, এতোটা পরিপাটি পোশাকে-আশাকে আগে কখনো ছিল না সে। সোমা দেখেশুনে নিজের জন্যে তার প্রিয় পারফিউম অপিয়ামই কিনল একটা। তার আগে অবশ্য বেশ কয়েকটা স্যাম্পল দেখল, যদি নতুন কিছু বাজারে এসে থাকে, যা হঠাৎ করে ভালো লেগে যেতে পারে।

তেমন কিছু মনে ধরল না। অলিভ গার্ডেনে ঢুকতে গিয়ে লম্বা ড্রাইভওয়ের দুপাশে চোখ পড়ে হঠাৎ মনটা আনন্দে ভরে যায় সোমার।

ড্রাইভওয়ের দুপাশে সারি সারি যে ক্র্যাব-অ্যাপল আর ডগউডের গাছ, সেখান থেকে

পিচঢালা বাঁধানো রাস্তায় পড়া সহস্র সহস্র ফুলের পাঁপড়ি ক্রমাগত গাড়ির চলাচলের ফলে মধ্য রাস্তা থেকে সব দুপাশে সরে এসে দুটি লম্বা গোলাপি লাইন তৈরি করেছে। পিচঢালা পথটি যেখানে ঘাসে মিশেছে সেই সীমানা বরাবর সেই লম্বা রেখা। মনে হচ্ছে, কোনো শিল্পী যেন সবুজ ঘাস আর কালো ড্রাইভওয়ের মাঝখানটিতে ব্রাশ দিয়ে কয়েক ইঞ্চি প্রশস্ত একটা গোলাপি রেখা এঁকে দিয়েছে। এতো মসৃণ, এতো নিটোল এই রেখা! কী অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে এই গোলাপি ফুলেল সরল রেখাটিকে।

ক্যারল আজ জন্মদিন বলে বেশ সেজেগুজে এসেছে। বেগুনি সাদা জংলি ছাপা সিল্কের একটি ড্রেস পরেছে ক্যারল। গলায় বেগুনি রঙের একটা স্কার্ফ। কানে, গলায়, হাতে মুক্তোর গয়না। বেশ দেখাচ্ছে আজ ক্যারলকে। বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে তার। সোমার দেয়া রুপোর গয়নাগুলো দারুণ পছন্দ করল ক্যারল। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তো খুলে রুপো পরল। খেতে খেতে হঠাৎ দূরের টেবিলে সিন্ডিকে দেখতে পেল সোমা। একসময় সিন্ডি সোমার প্রতিবেশী ছিল। কয়েক বছর আগে বাড়ি কিনে সাফার্ন চলে গেছে। যোগাযোগটা কমে গেছে ইদানীং। ক্যারলকে 'এক্সকিউজ মি' বলে সিন্ডির টেবিলে গিয়ে তাকে অবাক করে দেয় সোমা। সিন্ডি তার প্রতিবেশী লিন্ডাকে নিয়ে খেতে এসেছে। ডিভোর্সড সিন্ডি আর বিয়ে করেনি। সোমাকে তার নতুন সেলুলার ফোন নম্বর দেয় সিন্ডি। তার সেই বখাটে ছেলে ক্লিফ এখন অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। এ-বছর হাইস্কুল শেষ করছে। শুনে খুব খুশি হয় সোমা। সিন্ডির সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে আসে সে।

অলিভ গার্ডেন থেকে যখন বেরিয়ে আসে সোমা, তখন বেলা একটা বেজে গেছে। এখনো হাতে অর্ধেক দিন সময়। একটু একটু করে আকাশে মেঘ জমছে। সন্ধ্যায় নাকি খানিকটা বৃষ্টি হতে পারে। এখনো চারদিক দেখে বৃষ্টির কোনো আভাস পাওয়া যায় না, ওই উড়ো উড়ো বিচ্ছিন্ন কিছু সাদা মেঘ ছাড়া। সোমা ন্যানুয়েট মলে গাড়ি পার্ক করে, ১১/এ বাসের জন্যে অপেক্ষা করে। সময় যখন আছে, নিউইয়র্ক শহরে স্লোন ক্যাটারিং হাসপাতালে গিয়ে আজ দেখে আসবে সেলিমাকে। সোমা শুনেছে সেলিমা ভালো নেই। বাঁচবে না। আজকাল বেশ ঘনঘনই যেতে হচ্ছে তাকে হাসপাতালে। ১১/এ বাসের জন্যে দশ মিনিটও অপেক্ষা করতে হলো না, যদিও টাইমটেবল জানা ছিল না তার। ড্রাইভার সিটে হ্যারিকে দেখে খুশি হয় সোমা। হ্যারি নিজেও বহুদিন পর সোমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়। জানতে চায়, শহরে যাওয়া আজকাল একেবারে ছেড়েই দিয়েছে কিনা সোমা। ডাইনের একেবারে সামনের সিটটিতে বসে সোমা। যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া নিতে নিতে ও টিকিট দিতে দিতে সোমার সঙ্গে টুকটাক কথা বলে হ্যারি। সোমা জানায়, হ্যারির ওজন বেশ খানিকটা কমেছে। শুনে খুশি হয় হ্যারি। বলে, 'চেষ্টা করছি, আরো খানিকটা কমাতে হবে। ডাক্তারের নির্দেশ।'

বাস চলছে হাইওয়ে ধরে। পাশে সমান্তরালভাবে চলে যাওয়া হাঁটা পথে বেশ

কয়েকটা নারীপুরুষ এই দুপুরের রোদেও সাইকেল চালাচ্ছে। কয়েকজন জগিংও করছে। সোমা বোঝে, আজকাল মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যসচেতন হয়েছে, খাওয়া-দাওয়ায়, চলাফেরায়, জীবনযাত্রায়। এটা ভালো লক্ষণ। জীবনধারণের এরকম গুণগত পরিবর্তনই তো এক প্রজন্মকে আগের প্রজন্ম থেকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাল থেকে সাবওয়েতে করে স্লোন ক্যাটারিংয়ে যখন পৌঁছল সোমা, তখন দুটো চল্লিশ বাজে। ভিজিটিং আওয়ার এটা নয়। কিন্তু সেলিমার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা আছে একথা সেলিমা নিজেই বলেছে সোমাকে। অসময়ে আসায় অসুবিধা হবে না। দূর থেকে আসায় এ বিশেষ খাতির। সেলিমাকে দেখে মনে হয় না ক্যান্সার-রোগী। মাথার চুল পড়ে যাওয়ায় পরচুলা পরে থাকে সেলিমা। না-জানলে সেটাও বোঝার উপায় নেই। এছাড়া শরীরে জরার কোনো লক্ষণ নেই। বিছানায় বসে বসে টিভি দেখছিল সেলিমা। খুব খুশি হয় সোমাকে দেখে। জানায়, আগের চেয়ে অনেক ভালো বোধ করছে সে। যদিও ডাক্তার বলে দিয়েছে, তার রোগমুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে যতটা সম্ভব সেলিমাকে ভালো রাখার চেষ্টা করবে ডাক্তাররা। সোমা থাকতে থাকতেই সেলিমার স্বামী – আরশাদ এসে ঢোকে ঘরে। সেলিমার চাইতে বরং তাকেই বেশি অসুস্থ ও মনমরা মনে হয় সোমার। সোমা এসেছে দেখে খুব খুশি হয় আরশাদ। জানায়, সেলিমা প্রতিদিনই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার কথা জিজ্ঞেস করে। সোমার হঠাৎ খুব অপরাধবোধ হয়। এ-কাজটি আরো আগে করা উচিত ছিল। সেলিমাকে মাঝে মাঝে এসে দেখে যাওয়া বড়ই দরকার ছিল, যা সে করেনি বা করতে পারেনি নানা ঝামেলায়। শিগগিরই আবার আসবে কথা দিয়ে বেরিয়ে আসে সোমা। স্লোন ক্যাটারিংয়ের সামনে পাবলিক স্কুলের যে-চৌকো বাঁধানো খেলার জায়গাটি ছিল, সেখানে এখন পার্ক। কয়েকটি মা স্ট্রলারে করে বাচ্চা নিয়ে এসে বসে আছে সেখানে। একটি মা, তিন-চার বছরের এক অস্থির মেয়েকে কী বলে বলে শান্ত করার চেষ্টা করছে। মেয়েটি হাত-পা নাচিয়ে, চ্যাঁচামেচি করে কীসের জন্যে যেন ভীষণ বায়না করছে। কী আশ্চর্য ধৈর্য মায়ের। এরপরও আস্তে আস্তে অনবরত কী যেন বলে যাচ্ছে কন্যাকে শান্ত করার জন্যে। সোমা মনে করার চেষ্টা করে এই অপরিসীম ধৈর্য তার নিজের ছিল কিনা, তার সন্তানরা যখন ছোট ছিল। ফেরার পথে লেক্সিংটন সাবওয়ে স্টেশনের মাঝখানের খোলা জায়গাটিতে একটা ছোট্ট জটলা দেখতে পায় সোমা। সেই পরিচিত অন্ধ লোকটি গিটার বাজিয়ে গান করছে। আর লোকেরা গোল করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শুনছে। কেউ কেউ খুচরো পয়সা, এক-দু ডলার দিচ্ছে সামনে বিছানো চাদরটির ওপর। সোমাও দাঁড়িয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ একমনে শোনে অন্ধ শিল্পীটির মুখে হ্যারি নিলসনের সেই বিখ্যাত গান, আই ক্যান্ট লিভ উইদাউট ইউ। একটি ডলার দিয়ে সোমা সেখান থেকে চলে আসে সাবওয়ের কাছে। এই লোকটি আগে একসময় সিক্সটিএইট স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশনের মুখে বসে গান করত। শহরে যখন ছিল, কতবার দেখেছে সোমা। স্থান পরিবর্তন করে ভালোই করেছে সে। এখানে অনেক বেশি ট্রেন আসে। লোক-সমাগমও বেশি।

সাবওয়েতে এখন ভিড় হতে শুরু করেছে। একটু পরই রাশ আওয়ারে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না। উর্ধ্বশ্বাসে সকলে ঘরে ফেরার নেশায় ব্যস্ত হয়ে উঠবে। সোমা দাঁড়িয়ে আছে ওপরের সমান্তরাল রডটি ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে। একটি চাইনিজ চেহারার লোক তার ব্রিফকেসটি একবার মেঝেতে দুপায়ের মাঝখানে, একবার ডানহাতে ওপরে উঁচু করে ধরে নিজে কোনোমতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। পাশে ঘন বাদামি চুলের এক অল্পবয়সী যুবক এতো ভিড়ের ভেতরও ভাঁজ করে একটি পেপারব্যাকের বই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কোনো রোমান্টিক অথবা রহস্যোপন্যাস। ডানদিকের সিটে বসা কালো এক মহিলার কোলে বসে বছর দু-তিনেকের একটি ছেলে ছোট্ট পটেটো চিপসের এক প্যাকেট থেকে একটি একটি করে চিপস বের করে মুখে পুরছে। সোমা অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, এতো সাবধানি বাচ্চাটি যে এক টুকরো চিপসও মুখের বাইরে পড়ছে না।

পোর্ট অথরিটি স্টেশনে এসে এবার আর ১১/এ নয়, ৪৭ নম্বর এক্সপ্রেস বাসে উঠে পড়ল সোমা। ন্যানুয়েট মলে নেমে দেখে পার্কিংলটে এখন দুপুরের তুলনায় অনেক বেশি গাড়ি। মোটামুটি মনে থাকলেও, ঠিক কোথায় গাড়িটা পার্ক করেছিল আজ দেখে রাখেনি সোমা। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এক জায়গায় এসে গাড়ির চাবির কি-প্যাডে চাপ দেয়। খানিকটা দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দুটো একবার জ্বলে নিভে যায়, সেইসঙ্গে অল্প হর্ন। সোমা দ্রুত তার গাড়িতে গিয়ে স্টার্ট দেয়। প্রযুক্তি কত সুবিধেই না করেছে। এভাবে চিহ্নিত করার সুযোগ না থাকলে কতক্ষণ না জানি গাড়ি খুঁজে বেড়াতে হতো আজ। প্যালিসেডস পার্কওয়ে ধরে উত্তরে যাওয়ার কথা সোমার। সেদিকেই তার বাড়ি। কিন্তু আজ অন্যদিনের মতো নয়। তাই আজ উত্তরে না গিয়ে প্যালিসেডসের দক্ষিণের দিকে যেতে শুরু করল সোমা। ওদিকে হাডসনের ধার ঘেঁষে যে দুটো সুন্দর লুকআউট আছে, সেখানে গাড়ি থামিয়ে খানিকটা সময় কাটানো যাবে আজ। প্রথম লুকআউটটাতেই থামে সোমা। গাড়ি বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। হালকা হাওয়ায় কীরকম শিরশির একটা শব্দ হচ্ছে। ঘন গাছে অল্প অল্প পাতা দেখা দিয়েছে। হালকা হলদে সবুজ রঙের সব পাতা। হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে ওগুলো। সোমা হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়। এ-জায়গাটি নদী থেকে অনেক উঁচুতে। বড় বড় পাথর বসানো ধারটিতে। তারপরে আছে স্টিলের বেড়া। সোমা একটা বড় পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির বাড়িঘর, গাছপালা দেখে। হাডসনের ওপর দিয়ে কয়েকটা স্পিডবোট চলে গেল। একটা মালবাহী জাহাজ আস্তে আস্তে এগুচ্ছে। একজন সার্ফিংও করছে এরই মধ্যে। সোমার হঠাৎ মনে পড়ে ছোটবেলার কথা। লৌহজংয়ের কথা। নদীর ধারে বিকেলবেলা বাবার হাত ধরে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেত সোমা। বিশেষ করে গোয়ালন্দগামী বিশাল বিশাল স্টিমারগুলো দেখতে বড় ভালো লাগতো তার। কতরকম লোকজন দেখা যেত সেখানে গেলে। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে। কারো ভীষণ তাড়া, কেউ-বা আস্তে-ধীরে নামছে, বা উঠছে স্টিমারে। কারো মাথায়, ঘাড়ে বোঁচকা, পোঁটলা, কারো হাতে ব্যাগ, স্যুটকেস। সে এক অভিনব দৃশ্য।

সোমা লক্ষ্য করে, সে ছাড়াও এ লুকআউটে আরো এক জোড়া তরুণ-তরুণী আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডান পাশটাতে। ওদের লাল রঙের হোন্ডা একর্ডটি পার্ক করা সোমার ঠিক পেছনেই। নদীর ধারঘেঁষে লম্বা স্ট্যান্ডের ওপর বাইনক্যুলারগুলো সাড়ি সাড়ি দাঁড় করানো। আস্তে আস্তে একটি বাইনক্যুলারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো সোমা। ব্যাগ থেকে একটা কোয়ার্টার বের করে বাইনক্যুলারের নির্ধারিত ছিদ্রের ভেতর দিতেই একটা যান্ত্রিক আওয়াজ বেরুল। সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ধরতেই বাইনক্যুলারের মাথাটা ডান থেকে বাঁ-দিকে অনায়াসে ঘুরতে শুরু করল। কখনো কোনো জায়গায় স্থির রেখে, কখনো বাইনক্যুলারটি ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সোমা নদীর ওপারের গাছপালা, বসতি দেখতে থাকে। শিশুর মতো উত্তেজনা বোধ করে সে নিজের মধ্যে। একটি আট-দশ বগির ছোট্ট ট্রেন নদীর ধার দিয়ে উত্তরে চলে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ম্যানহাটান থেকে দৈনিক কম্যুটার যাত্রীদের ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে এ-ট্রেন, ওয়েস্টচেস্টারের বিভিন্ন ছোট ছোট শহর বা গ্রামে। হঠাৎ এক ফোঁটা জল এসে পড়ল সোমার মাথায়। হাত দিয়ে তা পরীক্ষা করতে না করতেই আরো কয়েক ফোঁটা জল এসে পড়ল হাতে, পায়ে, মুখে। দেখতে দেখতে একটু একটু করে ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো। ওপাশের ছেলেমেয়ে দুটো দ্রুত দৌড়ে তাদের গাড়িতে গিয়ে উঠল। কিন্তু গাড়ি স্টার্ট দিলো না ওরা। ভেতরেই বসে রইল। সোমা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। হাডসনের দিকে মুখ করে। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এলো। একটি একটি করে নদীর ওপারে ওয়েস্টচেস্টারের আলোগুলো জ্বলে উঠল। ল্যাম্পপোস্ট থেকে ধোঁয়া ধোঁয়া আলো বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সোমার গায়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকল।

নদীর উলটোদিকে আবার তাকায় সোমা। ওদিকের জায়গাটা পাহাড়ি। ফলে মনে হচ্ছে, আলোর কণাগুলো সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেছে আকাশে। অল্প অন্ধকারে। সোমা দাঁড়িয়েই থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে হাডসন দেখে, আলো দেখে। বৃষ্টির ছিটা ছিটা জল আস্তে আস্তে তার সর্বাঙ্গ নাইয়ে দিতে থাকে। সোমা নড়ে না। এ-দৃশ্য দেখে এই মুহূর্তে যা তাকে সবচেয়ে আচ্ছন্ন করে রাখার কথা ছিল, সেই ছ'সাত বছর আগের এক গ্রীষ্মে সুইজারল্যান্ডের লেক লুসার্নের পাশে দাঁড়িয়ে দেখা পাহাড় আর জলাশয়ের অপূর্ব সৌন্দর্য কিন্তু একবার মাত্র মনে উঁকি দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। সোমার কেবল মনে পড়তে থাকে, অনেক রাতে লঞ্চে অথবা বড় নৌকায় করে বাড়ি ফেরার পথে ধলেশ্বরীর জলের সেই অনবরত ছলাৎ ছলাৎ অথবা ছপছপ শব্দের কথা। সেই সঙ্গে চোখে ভাসতে থাকে বিস্তীর্ণ নদীতে ভাসমান অসংখ্য জেলে নৌকা আর পারের বাড়িঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা ছোট ছোট আলোর কণাগুলো যা ক্রমাগত ঘুরে বেড়ায় অথবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিকষ কালো অন্ধকারে।

দুধ-পাপ

মাসুদা ভাট্টি

আকাশের গায়ে ভুবন চিলের খয়েরি ডানা যেনো একেবারে সেঁটে আছে, মাঘের দুপুরের কড়া রোদে আকাশের দিকে তাকালে তাই-ই মনে হয়। মাছ ধরতে ধরতে হাসি আকাশের দিকে দ্রুত তাকিয়ে দেখে নেয়, চিলগুলো কতো দূরে, খালের পারে দাঁড়ানো ছোটো ভাইয়ের দিকে মাছ ছুঁড়ে দেওয়ার আগে দেখে নেওয়া, যাতে ছুঁড়ে দেওয়া মাছ চিলের খাবার না হয়ে যায় আবার। বুলুর হাতে মাছ রাখার মাটির পাতিল, পানিতে রেখে পলো দিয়ে মাছ ধরা যায় না, তাই মাছ ধরে ওপরে ছুঁড়ে দিতে হয়, কিন্তু চিলগুলো বড্ড শয়তান, কোত্থেকে কেমন করে দেখে কে জানে, ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। আজকেও বেশ কয়েকটি মাছ গেছে। এমনিতেই আজ বেশি মাছ পাওয়া যাচ্ছে না, কখনও পলো দিয়ে, কখনও বাঁশের তৈরি হোঁচা দিয়ে মাছ ধরছে হাসি, খালের পানি প্রায় শুকিয়ে গেছে অথচ কতোজন যে নেমেছে মাছ ধরতে, কতো আর মাছ থাকবে, প্রতিদিনই তো প্রায় ধরা হচ্ছে–হাসি হাতে ধরা রয়না মাছটা ভাইয়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাকিয়ে থাকে, চিলে আবার নিয়ে যায় কিনা দেখতে। নাহ্ বুবু ঠিকই মাছটা কুড়িয়ে মাটির পাতিলে রাখে।

দুপুর মাথার ওপর এখন, একটু পরেই বাড়ি ফিরতে হবে, নইলে যা'র হাতে মার খেতে হবে। এই মাছ নিয়ে কুটে-ধুয়ে দিলে তবে রান্না। ইসু যাওয়ার সময় একটু বেলে শাক তুলে নিতে পারলে ভালো হতো, ছোট ছোট মাছ দিয়ে বেলে শাক খেতে কী যে মজা! অনেকগুলো ভাত মেখে খাওয়া যায়, শুকনো হলেও আপত্তি নেই, মাছ আর শাকের ঘ্রাণ মিলে স্বাদই অন্যরকম। বুলুটা যদি একটু বড় হতো তবুও চলতো, ও তো বেলে শাকই চেনে না। শাক তুলতে বললে হাবিজাবি কী তুলতে কী তুলবে তার ঠিক নেই। হাসি মনে মনে হিসেব করে, যে ক'টা মাছ পেয়েছে তাতে ওদের তিনজনের দুবেলা চলে যাবে। কাল সকালে হয়তো টান পড়বে, একটু বেশি করে শাক দিলে তাও পুষিয়ে নেওয়া যাবে। ওর বয়সের তুলনায় চিন্তাটা বেশ একটু ভারি যদিও। ওর বয়সের মেয়েরা শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের নায়িকা হওয়ার কথা, যারা ঘোমটার আড়াল থেকে কটাক্ষ হানবে তিনগুণ বয়েসি নায়কের দিকে, কখনও বা নায়ককে কাঁদার মদ্যে পড়ে যেতে দেখে গাছে বসেই হি হি করে হেসে উঠবে– কিন্তু হাসির এই নয় বছরের জীবনের গত চার বছরই গেছে জীবনের সঙ্গে লড়ে, বুঝে। জীবন মানুষকে শিখিয়ে দেয় অনেক কিছু, এরমধ্যে বাঁচাটা বোধহয় সর্বাগ্রে শিখে নেয় মানুষ। হাসিও শিখে নিয়েছে খুব দ্রুত-চার বছর বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পরেই, যখন বুলুর বয়স মাত্র এক মাস। চোখের সামনে ওর মাকে রঙিন থেকে সাদা-কালো হতে দেখেছে–আর ওর নিজের

জীবন কখনও রঙিন হবে কি না কে জানে, আপাতত: সবটুকুই সাদাকালো।

হাসি উঠে পড়ে খাল থেকে, উঠেই পাতিলে দেখে নেয় মাছগুলো, পুঁটিমাছই বেশি, মরে গেছে। দু'একটা ক্যাচরা বাইন, কয়েকটা রয়না কানসাগুলো ফুলিয়ে রেখেছে, বেশ কয়েকটা ট্যাপা মাছ। বুলুর হাতে একটা ট্যাপা, লেজ ধরে উল্টো করে মাছটা ঘুরাচ্ছে আর সমানে বলে যাচ্ছে– 'ট্যাপটুপানি কদুর বিঁচি, ট্যাপটুপানি কদুর বিঁচি'।

'ও আফা দ্যাখ না ফোলে না ক্যা'? বুলু নাকে কাঁদে।

: এইডা মইরা গ্যাছে, আরেকটা নিয়া ঘুরা ফুলবেনে–হাসি নিজেই একটা ট্যাপা মাছ তুলে নেয় হাতে, তারপর লেজটা ধরে উপুর করে বলতে থাকে, 'ট্যাপটুপানি কদুর বিঁচি, ট্যাপটুপানি কদুর বিঁচি'। মাছটা দ্রুত কটু কটু শব্দ করে ফুলতে থাকে। বুলু আবারও মাকে কাঁদে, 'আমারে দে আমারে দে আমি ফুলাবো, দে না আফা, দে'। মাছটা বুলুর হাতে দিয়ে মাটির পাতিলটা মাথায় বসিয়ে তার ওপর হোঁচাটা আঁটকে অন্য হাতে পলো নিয়ে হাঁটতে শুরু করে হাসি। পেছন পেছন বুলুও হাঁটে।

: চল মাতুব্বরের ভুঁই থিকা কয়ডা বাইলা শাক তুইলা নিয়া যাই। মাছ দিয়া রানবেনে মা–হাসি বলে।

: আমার খিদা লাগছে আফা। কোন বিয়ানে খাইছি, আমি বাড়ি যাবো, শাক তুলা লাগবেনানে।

: নারে, অল্প কয়ডা শাক তুলবানে, তুই এটু খাড়াইয়া খাছিস মাছ আর হোঁচা-পলো নিয়া, আমি শাক জলদি জলদি শাক তুলবানে।

: আমি পারবো না খাড়াইয়া থাকপার, তুই যা আমি নাবার গেলাম–বলেই বুলু দৌঁড়াতে শুরু করে। এক হাতে ওর ট্যাপা মাছটা তখনও কটু কটু করে ফুলছে। ও এখন আলমগীর, কবিরদের সঙ্গে পুকুরে নাইতে নামবে। কখন উঠবে কে জানে? ততোক্ষণে শাক তুলে নিয়ে রান্নাও হয়তো হয়ে যাবে, হাসি খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে। মাতুব্বরদের মুশুরি ক্ষেতের আলে মাছের পাতিলটা রেখে তার ওপর হোঁচা দিয়ে ঢেকে, পাশেই পলোটা রেখে ও দ্রুত হাতে বেলে শাক তুলতে থাকে। হাতে ওর শাক থেকে গুড়ো গুড়ো বালুর মতো লেগে যায়, খুব অল্প সময়েই এক গোছা শাক তুলে ফেলে ও। বেশ বড় বড় শাক হয়েছে, মুশুরি গাছগুলো বেলে শাকের সঙ্গে প্রতিযোগিতার হেরে যাচ্ছে। 'ভুইডা নিড়াইয়া দেয় না ক্যা?' মনে মনে ভাবে হাসি। তারপর আরও গোছা খানেক শাক তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকে বাড়ির পথে। 'হেই যে বিয়াে গেছিস, এ্যাহন আসার সুমায় ওইলোনি তোর? বাছুরডা আমলাইয়া মইরা যাবার লাগছে, পাঠি দুইডার প্যাডে ঘাসপানি কিছুই পড়ে নাই। মাছ দিয়া তোরে আইজ আমি মাটি দিবানে। আল্লায় আমারে নেয়ও না এই দুনিয়ার ত্যা, কি পাপ যে করছিলাম আমি'– চক থেকে মূল বাড়িতে ওঠার ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে হাসির কানে আসে আয়মনার কথা। উঠোনে ধার রোদ দিয়েছে আয়মনা, ঘুরে ঘুরে ধান নেড়ে দিচ্ছে, দু'পা দিয়ে ধান ঠেলছে আর

মুখে হাসিকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। হাসির পরনে ছেঁড়া ফ্রকটা আর ঢোলা হাফ প্যান্টটা এরই মধ্যে শুকিয়ে গেছে। শীতের বাতাস, যা পায় তাই টেনে নেয় নিজের ভেতরে। মাছের পাতিল, হোঁচা-পলো নামিয়ে রেখে বঁটি খুঁজে নিয়ে মাছ কুটাতে বসে পড়ে হাসি। চোখের পলকে মাছ কোটা শেষ করে, বেলে শাকগুলোও বেছে বেছে রাখে ভাঙা একটা কুলোয়। তারপর দ্রুত মাটির হাঁড়ি থেকে পানি নিয়ে মাছগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে একটা মাটির খোরায় রেখে উঠে পড়ে। উঠোনের দড়িতে ঝুলে থাকা গামছা টেনে নিয়ে পুকুরের দিকে যেতে যেতে আয়মনাকে বলে, 'ও মা আমি নাবার গেলাম। মাছ আর শাক কুইটা খুইছি, তুমি রাইন্দা হেলাও, আমি নাইয়া আইসা চাইল ধুইয়া দিবানে'। পেছনে আয়মনা কি বলে তার অপেক্ষা না করেই হাসি পুকুরের দিকে দৌড় দেয়।

: এহ্ মহারাণী আমারে হুকুম দিয়া গ্যালেন। আমি অহনই বাকি কাম ফালাইয়া রানতে বইসা যাবানে আর কি। আরেক মহারাজা কুহানে গ্যাছে, তার কোনও খবর নাই। আমার জ্বালার কি আর শ্যাষ আছে? মসজিদে আইজ বিয়ানে কি ওইছে কিডা জানে? মুন্সিসাব খবর পাডাইছে, হাজের কালে মিয়া বাড়ি যাবার লাইগা– গজরাতে গজরাতে আয়মনা চুলোর পাড়ে যায়। হাসি মাছ-শাক কুটে ধুয়ে-টুয়ে রেখে গেছে গুছিয়ে। দেখে মেয়েটার প্রতি একটু মায়াও হয় আয়মনার। সেই সকালে না খাওয়ার মতো একটু খেয়ে গেছে, হয়তো খিদে লেগে থাকবে। আহারে বাচ্চা দুটোকে ভালোমন্দ কিছু মুখে তুলেও দিতে পারে না। অভাব চারদিকে, এদিক কাটে তো ওদিক বাড়ে।

কাঁচা চুলের বিধবা, চারদিকে তো মানুষের অভাব নেই, যখন-তখন ছুটে আসে ওর দিকে। রাতের বেলা দু'দিকে দু'জনকে নিয়ে ঘুমোয় আয়মনা। দরোজয়, ঘরের বেড়ায় রাতভর কতোজনে যে টোকা দেয়, ভয়ে দুচোখের পাতা এক করা যায় না। দুজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর চেষ্টা করে আয়মনা, ঘুম কি আর আসে? স্বামীর কথা মনে হয়, সন্তানদের কথা ভাবে।

কতো কষ্ট এই বাচ্চা দুটোকে নিয়ে ওর তাও মেয়েটা এই বয়সেই বেশ বোঝেটোঝে, সংসারের সব কাজেই হাত দেয়। ফসলের সময় মানুষের ক্ষেতের ফসল তুলে যা পায় তা দিয়ে তো বেশ কিছুদিন অন্তত: চলে। সকালে মসজিদে ছিপারা পড়তে যায়, সেখান থেকে ফিরেই তো আর অবসর নেই ওর। এই গোবর টোকাতে গেলো, গোবরের সঙ্গে খালুই হাতে ভাইকে নিয়ে যায়, হাঁসের জন্য শামুক পেলে খালুই ভরে নিয়ে আসে। তিনটা হাঁস পালে ও, তিনওটা ডিম পাড়ে, এখন না খাওয়ালে ডিম আর পাড়বে না। ডিম বেঁচা টাকা দিয়ে এবার একটা কাপড় কিনতে হবে, পড়নের কাপড়টা শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর ঢেকে-ঢুকে রাকার উপায় নাই নিজেকে ও দিয়ে। কপালের দোষ আর কী দেবে আয়মনা, স্বামী বেঁচে থাকতেও এর চেয়ে আর কতোই বা ভালো ছিল ও? তবু হয়তো শান্তিটা ছিলো, গভীর রাতে ঘরের বেড়ায় কেউ টোকা দিতো না। কিন্তু তিনবেলা পেটভরা ভাত, বছরে দুটো কাপড় কিনে দেওয়ার সামর্থ খলিলের ছিল না। তার ছিল চোরা স্বভাব, গ্রামের সবাই নামই দিয়েছিলো খলিল চোরা। দুটো গাই ছিলো, তার দুধ

বেঁচেই যা আয়, নইলে কোনওদিন লোকটা কাঁচি হাতে কারো ক্ষেত্রে 'কিন্তুযান' দিতে যায়নি, কতোদিন গেছে ভাতের চাল নেই, অন্যের কাছ থেকে উধার করে এনে হাঁড়ি চড়েছে তবু তাকে ঠেলেও পাঠানো যায়নি কোথাও। রাত-বিরেতে মানুষের ক্ষেত থেকে লাউটা-মুলোটা ঠিকই চুরি করে এনেছে, কিন্তু আয়মনা তাতে সায় দিতে পারেনি। জোর করে কিছু বলতে গেলে কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়েছে খলিল।

সেই মানুষ হঠাৎ করেই রোগে পড়লো, মেয়েটা হওয়ার পরপরই কী যে রোগ হলো মানুষটার, কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে বিছানা-ধরা। একদিন রাতের বেলায় কুবেরদিয়া থেকে ফেরার সময় পথে নাকি কী দেখেছিল লোকটা। কাফনের মতো সাদা কাপড় পরা কে নাকি এসে তাকে বলেছিলো, 'এ কুহানে যাইস? আমারেও সাথে নিয়া চলু'। খলিল বলেছিলো, 'চলেন'। ওর হাতে ধরা ছিলো রখমানের ক্ষেতের বড় বড় দুটো তরমুজ। কুবেরদিয়া থেকে ফেরার পথে চুরি করেছিলো। কিছুদূর যাওয়ার পর খলিলের মনে হয়েছিলো, লোকটা কে? এই রাত দুপুরে সাদা কাপড় পরে ওর সঙ্গে আসছে? ও প্রশ্ন করেছিল, 'কিডা আপনে? আপনারে তো আমি চিনলাম না'।

: ও কি কইস তুই, আমারে চিনলি ন্যা? আমার করবর এই হেলই খালের কিনারেই। কেউই আমারে গ্রামে নিয়া যায় না, এতোদিনে তুই রাজি হইছস, এইবার চলু আমারে গ্রামে নিয়া যা।

খলিল এবার সাদা কাপড় পরা মানুষটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে বিকট দর্শন কি যেন একটা। সে চিৎকার দিকে তরমুজ হাতে নিয়ে দৌড়াতে থাকে। বাড়ির উঠোনে এসে ঠাসু করে পড়ে যায়। ধরাধরি করে ঘরে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর সেই যে রাতে জ্বর আসে, তারপর সেই জ্বর আর ছাড়েনি। কতোদিন জ্বরের ঘোরে বুল বকেছে খলিল, নগেন ডাক্তার বলেছে, যক্ষার লক্ষণ, ফরিদপুর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তখন সবাই ধরে নিয়েছে খলিলকে সে রাতে যমে ধরেছিলো। যম গ্রামে ঢুকতে চেয়েছিলো, ও যদি বলতো, 'আপনে কিডা, আপনারে আমি নিয়া যাবো ক্যান'? তাহলে নাকি আর এই অবস্থা হতো না। কিন্তু ও তো বলেছে, 'চলেন আমার সঙ্গে', তাই যম ঠিক বাড়ি চিনে চলে এসেছে। ভাগ্য ভালো গোটা গ্রামেই যম আসেনি, আরে সেবার আব্দুল আলি যখন রথের মেলা থেকে জিলাপির পোটলা হাতে ফিরছিলো তখন ঠাইরেনের ভিটের কাছে ওরে একটা কুকুর নাকি অবিকল মানুষের গলায় বলে উঠেছিলো, 'ও মিয়াবাই, একটা জিলাফি খাওয়াও দেহি। কতোদিন জিলাফি খাই না'।

আব্দুল আলি তাড়াতাড়ি কলাপাতার পোটলা খুলে একটা জিলাপি ছুঁড়ে দিয়েছিলো কুকুরটার দিকে। কিন্তু কুকুরটা আর ওর পিছু ছাড়েনি, একেবারে ওদের উঠোন পযন্ত এসে হঠাৎই গায়েব হয়ে গিয়েছিলো। সেই রাতেইতো আব্দুল আলীর কলেরা হলো, পরের দিন সন্ধ্যায়ই শেষ। তারপর তো একেবারে গ্রামক গ্রাম কলেরা চললো তিন মাস ধরে। 'আহারে আব্দুল আলি খালি ওই কুত্তারে জিলাফি না দিতো তাইলে এ্যাতোগুলাম মাইনষের সেত্যু ওইতো না'– অসুস্থ খলিলের বিছানার পাশে বসা সান্ধ্য আসরগুলোর

এরকমই গল্প চলতো তখন প্রতিদিন। তারপর একদিন খলিল মারা গেলো, তখন ওর ছেলের বয়স মাত্র এক মাস। সবাই বলতো, 'যতো দোষ ওই ম্যায়াডার, ম্যায়াডা পয়দা ওইয়াই বাপটারে খাইলো, পোলাডা বাপের আদর কি জিনিস বুঝবার পারলো না। দ্যাহস না ম্যায়াডার চোখ দুইডা কেমুন, এ্যাহেবারে শয়তানের লাগান, কোনদেই শ্যা চোখ তা আল্লায় করার পারে। এমুন চোখ তো ভু-ভারতে কোনও হানে দেহি নাই বাফু'।

যেনো ভু-ভারতের সবদেশ ওদের ঘোরা হয়ে গেছে। হাসি হওয়ার কিছুদিন পরেই খলিল অসুখে পড়েছিলো বলে মেয়েটার ওপর এই অভিযোগ গ্রামের সবার। 'অপয়া' বলে হাসিকে সবাই খ্যাপায়, এমনকি অন্য শিশুরাও ওর সঙ্গে খেলতে গিয়ে ওকে অপয়া বলে গাল দেয়। আয়মনা চুলোয় মাটির কড়াই চাপিয়ে তাতে মেয়ের গুছিয়ে রাখা শাখ আর মাছ ঢেলে দিতে দিতে ভাবে, মেয়েটার কী দোষ? রাত-বিরেতে চুরি করতে গিয়ে ভয় পেলে তাতে মেয়েটা দোষী হবে কেন? সবাইতো আর জানে না, সে রাতে খলিল গিয়েছিলো রখমানের ক্ষেত থেকে তরমুজ চুরি করতে। অথচ দোষ হলো কিনা মেয়েটার। এরপর থেকে মেয়েটাকে সব সময়ই মানুষের কথা শুনতে হয়। মেয়েটাও হয়েছে একটা নচ্ছাড়, কারো কথা শোনেনা, নিজের মতো চলে, জেদি, সারাদিন ভাইকে নিয়ে চক-পাথারে ঘুরে বেড়ায়, বনে-বাঁদাড়ে ঘুরে পাতা কুড়োয়, মাছ ধরতে নেমে যায় খালে-বিলে; গ্রামের মসজিদে আজান দিলে ছেঁড়া ফ্রকটা পেছন থেকে তুলে মাথায় দেয়। 'আরে হারামজাদি তোর গোয়া যে পরে দ্যাহে হেই খিয়াল কি তোর আছে?'– আয়মনা নিজের মনেই হাসিকে গাল দিতে থাকে। তালিমারা প্যান্টটা যে প্রায় সময়ই ছেঁড়া থাকে, একটা ভালো প্যান্ট এবার কিনে দিতেই হবে। ঈদ আসছে, ভাগ্য ভালো গাছটা বিইয়েছে, সকাল বিকাল হাঁড়ি-চারেক দুধ হচ্ছে, প্রতি হাঁড়ি দুধ পাঁচ টাকা হলে দিনে কুড়ি টাকা, রোজ নিচ্ছে জব্বার মিয়ার বউ। তার ছেলের আবার দুধ না হলে চলে না, মাসের শেষে বেশ কিছু থোক টাকা আসবে বলে নিজের ছেলে-মেয়ের পাতে এক ফোঁটা দুধ না দিয়ে সবটা দুধই বেঁচে দিচ্ছে আয়মনা। অভাব মানুষকে এমনই পাষাণ করে দেয়–পোড়া পোড়া করে বেলে শাক দিয়ে সাতা-পাঁচা মাছের তরকারি চুলো থেকে নামাতে নামাতে আয়মনা ভাবে আর দীর্ঘ একটা শ্বাস ছাড়ে।

'এ ইডা, বুলুরে এট্টা চড় দে দি, সেই কহন নামছে, এ্যাহনও পানি থিকা উডার নাম নাই। এ ছ্যামড়া উইডা আয় কইলাম, নইলে আইজ কুরবানি দিবানে"– পারে দাঁড়িয়ে হাসি গলা ফাঁটিয়ে চিৎকার করে। এতোক্ষণ নিজেও সে ডুব-গোল্লা খেলেছে, চোখ লাল হয়ে গেছে, ঝাঁপসা দেখছে ও চোখে। পুকুরের ঘোলা পানিতে ওর রোদে পোড়া লালচে চুলগুলো মেটে রপ্তা হয়ে গেছে। গামছায় নিজের শরীর মুছতে মুছতে হাসি ভাইকে ওঠার জন্য তাগাদা দেয়। কিন্তু ওর আর ওঠার নাম নেই, সাঁতার জানে না বুলু, শীতের পুকুর শুকিয়ে গেছে প্রায়, অল্প একটু পানিতে বহুদূর পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়, কাঁদা গোলানো পানিতে একগাদা ছেলেমেয়ের মধ্যে বুলুকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই। হাসি ঠিকই তার ভাইকে চিনেছে, কিন্তু বুলুতো কোনও কথাই শুনছে না। হাসি নিজের

গামছাটা ঘাটের পাশে ওদের ধনে ক্ষেতের বেড়ায় ঝুলিয়ে রেখে নিজে আবার পানিতে নামে। তারপর ধীরে ধীরে হেঁটে যায় ভাইয়ের কাছে, যাতে বুলু ওকে না ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনতে থাকে। 'আরেকটু খাকি আফা, একটু, বেশি না। গুইনা গুইনা দশটা ডুব দিব আফা'–বুলু চিৎকার করতে থাকে।

: এটাও না, চোখ কুওয়া দিয়া গ্যাছে, আইজ যদি তোর জ্বর না আসে তয় কইছি কি। বাড়ি চল দেহিসেনে মা আইজ তোরে বানাবেনে আইচ্ছামতো।

ভাইকে টেনে আনতে ওর গোবর টোকানো, ধুধুলে তোলা আর মাছ ধরার সঙ্গী আলুরিকে দেখে হাসি বলে, 'এ ইডা, আইজ হাজের কালে আসিস, কাইলকের মতো আজান দিয়া নামাজ পড়বানে। বিহেলে কি হরবি? দুধেইলে উঠেবার যাবিনি। এট্টা ঘাসও নাইরে ঘরে, পাঠি দুইডা না খাইয়া মইরা যাবেনে আইজ"।

ওর প্রথম আহবানের উত্তরে আলুরি বলে, 'নারে আর আজান দিয়া নামাজ পড়বো না, জানিস ন্যে আইজ মাদ্রাসার হুজুর কইছে ম্যায়াগো আজান দিয়া হারাম, গুনা অয়। তুই যে আজান দিছিস, তোর বোলে বিচার অবে। হাজের কালে তোর মারে মিয়া বাড়ি ডাকছে মুন্সিসাব।"

: ম্যায়ারা আজান দিলি কি অয় রে? হুজুর তো ম্যায়াগো সবতাই করবার না হরে, কয় ম্যায়ারা খালি গুনা হবে। কবির আললিরদি হাজের কালে একসাথে আজান দ্যায়, আমরা দিলি দোষ ওবি ক্যা ক'দিন–হাসি বুলুকে পাড়ে তুলে গামছা দিয়ে মোছাতে মোছাতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

: কবার পারি ন্যে বাই, তুই আর আজান-উজান দিস ন্যে। ম্যায়ারা সবকিছু করবার পারে না, গুনা অয়। জানিস ন্যে আমরা যে শিলুক কই, 'আলেব বে তে ছে, মুন্সি গ্যাছে গাব গাছে, ছবাব দিবো কার কাছে?' তা কওয়াও গুনা, আইজ শরিফা মুন্সিসাবরে কইয়া দিছে আমাগো এই শিলুকের কতা, মুন্সি কইছে তোর বিচার অবে।

: এই শিলুকতো হগুলিই কয়, আমি এ্যাকলা কইনি

: তুই তো কালমুহি, তুমি কইলি বেশি দোষ অয় জানিস ন্যে।

আলুরির শেষ বাক্য হাসিকে চুপ করিয়ে দেয়। ওর সমবয়েসীরাও যখন ওকে 'কালমুখি' অপয়া' ডাকে তখন আর কিছু বলার থাকে না ওর। অথচ গতকাল সন্ধ্যায় শরীফা, লায়লা, জানু, আঙ্গুরি, রেবেকা সবাই যারা ওর সঙ্গে সকালে বুকে সিপারা নিয়ে মায়ের ছেঁড়া শাড়ি পরে মসজিদে পড়তে যায় সকলে মিলেই আজান দিয়ে নামাজ পড়েছে ওরা। হাসি আজান দিয়েছে, তারপর নিজে সামনে দাঁড়িয়ে মসজিদের ইমামের মতো ওদের নামাজ পড়িয়েছে। দুই শেজদায় নামাজ শেষ ওদের। মসজিদে ছেলেরা নামাজ পড়ে, ওদের বুঝি কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে ইচ্ছে করে না? বিকেলেই ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সন্ধ্যায় নামাজ পড়বে বলে। সেই অনুযায়ী তাড়াতাড়ি হাঁসমুরগিগুলি ঘরে তুলে জব্বার মিয়াগো বাগানের চাপা কলে গিয়ে সবাই ওজু করে এসেছে। তারপর

উঠোনে খেঁজুর পাতায় বোনা পাটি বিছিয়ে এক কাতারে নামাজ পড়েছে। বাড়ির কেউ লক্ষ্য করেনি, আয়মনা ছাড়া। আয়মনা বলেছে, মেয়েদের আজান দিতে হয় না, কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে হয় না। কিন্তু সেরকম বাঁধাও দেয়নি হাসিদের। হাসি ভাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবে, কী হয়েছে আজান দিয়েছে, তাতে? আজান দেওয়া কি দোষের? হুজুরইতো বলেছে, আজান দিয়ে মানুষকে নামাজের জন্য ডাকা হয়। ছেলেরা ডাকলেও যা মেয়েরা ডাকলেও তাই। আঙ্গুরিও ওর পেছন পেছন আসছিলো, হাসি প্রসঙ্গ পাল্টে বলে, 'এ ইডা হুনছিসনি, চপলার বিলে বলে মাছ গাাবাইছে, পানি কুইয়ে গ্যাছে তো, তাই জাইলেরা ঘের দিছে, ঘেরের পাশে কচুরি তুইলা খোয়, আর কচুরির দাঁড়িতি কইমাছ জড়াইয়া খাছে। যাবিনি কাইল? রহিবোনরা গেছিলো কাইল, কোলা বইরা মাছ গাইছে"।

: হু যাবানে, লায়লা-চাম্পারেও কইস। আইজ দুধেইলে উঠাবার কালেই কবানে। আমারে বুলাই নিয়া যাইস হাসি।

: যাবানে। এই তো এ্যাহনই খাইয়া-নইয়া হ্যাসে যাবানে, বেইল পইড়া গ্যাছে, কালিবাড়ির মাথায় সুরুজ গ্যাছে, হাজ ওইয়া যাবেনে হ্যাসে।

ওরা দ্রুত বাড়ি আসে, তিনজনে মিলে ঘরের বারান্দায় বসে ভাত খায়, মোটা ইরি চালের ভাত, গোড়া গোড়া করে বাঁধা বেলে শাক আর মাছেল তরকারি দিয়ে বেশ লাগে। সারাদিনের ক্ষিদে যেনো হামলে পড়ে মাটির বাসনে। বুলুকে ভাত মেখে নিতে হয় আয়মনার। তারপর নিজে খেতে বসে। মেয়েকে তুলে দেয়, খাবার সময় মেয়েকে জিজ্ঞেস করে আয়মনা, 'এ মসজিদে আইজ কি ওইছে রে? আমারে মুন্সিসাব ডাকছে কো?'

" জানি ন্যে মা কি ওইছে। আঙ্গুরি কইলো, আমি কাইল আজান দিছি বইলা আমার বলে গুনা ওইছে, আমার বোলে বিচার অবে।

: কাইলই আমি কইছিলাম, ম্যায়াগো আজান দিয়া ঠিত ন্যে, ও আমার কপাল রে, এই ম্যায়া নিয়া আমি কুতায় যাবো, ও আল্লা আল্লারে আমারে তুমি তুইলা নিয়া যাও গো– হাতের কাছে সিলভারের পানির মগ ছিলো, আয়মনা মেয়ের দিকে মগটাই ছুঁড়ে যাবে। মগটা গিয়ে ঠিক মেয়েটার কপালে লেগে সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি কেটে যায়, দরদর করে রক্ত পড়তে থাকে। হাসি ভাত রেখে উঠে পালিয়ে যায়, এক হাতে কপাল চেপে রাখে। জব্বার মিয়াদের কলপারে এসে পেটভরে পানি খায়, তারপর দুর্বা ঘাস চিবিয়ে কাটা জায়গায় লাগায়, জ্বালা করছে জায়গাটা। খুব দুঃখ লাগে ওর, চোখ ফেটে পানি আসে। বাগানের এক কোণে পড়ে থাকা খেজুর গাছের গুড়ির ওপর বসে হাসি কাঁদতে থাকে। যদিও ও বোঝে না কষ্টটা কোথায়, কিসের জন্য, কতোটা, কিন্তু ওর ছোট বুক ভেঙে যেতে থাকে। অনেকক্ষণ পর বুলু এসে বলে, 'ও আফা, নো যাই দুধেইলে উডাইয়া আনিগ্যে। পাঠি দুইডা না খাইয়া রইছে"। হাসি কোনও কথা বলে া দেখে বুলু ওর হাত ধরে টানে, 'ও আফা যাবি ন্যে? মা গাইলেবেনে, নো যাই"।

: নিজের পেটে তো এ্যাহন আঠু পানি, তাই ছাগলের টান পড়ছে। যা আমি যাবার পারবো না–কান্না মেশানো গলায় হাসি বলে।

: আফা জানিস, মাও বাত খায় নাই, বাতের খাল ঠেইলা থুইছে। নো যাই আফা।

ভাইয়ের মুখে মায়ের কথা শুনে হাসি কি ভাবে কে জানে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'যা গরুর গড়ার মইদ্যে যাহা আছে, নিয়া আয়, যাহা বইবো দুধেইলে আনবানে"। বোনকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বুলু দৌঁড়ে বাঁশের ঝাঁকা আনতে ছোটে। একটু পরেই ফিরে আসে, তারপর দু-ভাইবোনে মিলে ওরা আঙ্গুরি, লায়লা-চাম্পা-জানু-রেবেকা-সবাইকে একত্র করে চকের দিকে যায়। মুশুরি বা শর্ষে ক্ষেতের আগাছা দুধুলে ঘাস, ছাগলের প্রিয় খাদ্য, এই ঘাসের কষ দেখতে দুধের মতো সাদা বলে এর নাম দুধুলে, শাক হিসেবে খাওয়া যায়। ওরা দুধুলে তুলতে তুলতে সম্মিলিত সুরে গান গায়, 'বড়বুজি গ্যাছে নাক ফুড়াবার কোলইডাঙ্গার মাঠে, সেই খেন খিকা খবর আইছে জাম তলায় ঘাটে।

জাম ধরছে, থৈলে থৈলে কুলিতে ঠুকাই খায় পাঁচশ টাকার মোরগ আমার বাঘে ধইরা ন্যায়॥

ও বোনের বাঘলো, নাই কোনও মায়াগো
কোন বোনে তোমার ঘর, আর কোন বোনে তোমার বাসগো?
বোন বোন ফেলিয়া বোন
বোনে বইসা ফেলিয়া বোন
বোনে বইসা কড়ি গোন॥
আইলামরে গিরস্থ বাড়ি, চাইর কোণা চাইর কেলার গাড়ি
কেলার মাথায় ধলা ফুল, বউয়ের মাতায় সুনার চুল
সোনার চুলে ধুড়া সাপ
ফাল দ্যে উডে বউর বাপ
বউর বাপে উক্কা খায়, চাইল বরাবর ধুমা যায়
ধুমার রঙ কালা, বউর বাপ আমার শালা...

ওদের এই গানের কোনও সুর নেই, লয় নেই, এমনকি কথারও কোনও মাথামুন্ডু নেই। হাত চলে দুধুলের লতা-ঘাস তোলায়, আর মুখ চলে কখনও গানে, কখনও 'শিলুকে', কখনও গল্পে। কোন গ্রামে গত রাতে ডাকাতি হয়েছে, তিনজন মানুষ খুন হয়েছে অথবা অমুক গ্রামে অমুকের বউ গাব গাছ থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা গেছে, 'পুলুশ' এসে গ্রামের কাউরে পায়নি, সবাই পালিয়ে গেছে গ্রাম ছেড়ে। ওদিকে পাশের গ্রামের মানুষ এই সুযোগে পালিয়ে যাওয়া গ্রামের পাকা ধান কেটে নিয়ে গেছে। এরকম গল্প ওদের অনেক জানা। জানা গল্পই ওরা করে যায়। হঠাৎ করেই আঙ্গুরি অথবা রেবেকা একটা পাখির বাসা খুঁজে পায়, সেখানে তিনটি ডিম, নীল রঙের ডিম, তার ওপর খায়েরি ফোটা ফোটা। ভিলভিলি পাখির ডিম, চষা জমিতে বড় বড় মাটির চাকার আড়ালে ওরা শুকনো ঘাস দিয়ে ছোট্ট বাসা বানায়। এরকম পাখির বাসা ওর প্রায়ই পায়,

মেয়ে বলে ওরা বাসাটা আরও নিরাপদ করতে মাটির চাকা জড়ো করে কেটার ওপর একটা রেখে বেশ একটা দেয়ালের মতো গেঁথে দেয়। প্রায়ই দেখা যায় ডিমগুলো পরের দিন দুষ্টু ছেলেরা নিয়ে গেছে, অথবা বাচ্চা থাকলে বাচ্চাগুলোকে জবাই করে রেখে গেছে। কিন্তু হাসি, আঙ্গুরি, রেবেকারা পাখির বাসাগুলো ভাঙতে পারে না, ওদের মায়া লাগে খুব, আহারে কবে বাচ্চা হবে? কবে ওরা উড়তে শিখবে?

ওরা ভাবতে থাকে, ওদের আলোচনার মোড় ঘুরে যায়। ততোক্ষণে ওদের ঝাঁকা উপড়ে পড়ছে দুধুলে ঘাসে। সন্ধ্যা তখনও গায়ের ওপাশে দাঁড়িয়ে আসবো আসবো করছে। গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে সূর্য্যটা বার বার রঙ বদলাচ্ছে, যেনো শেষবারের মতো নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে চাইছে সে, তাই রঙের খেলা দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ করার চেষ্টা তার। গ্রামের কোল ঘেষে ধোয়ার একটা অস্পষ্ট অবয়ব তৈরি হয়েছে, ওরা বাড়ি ফিরছে, কারো কাখে, কারো মাথায় ঝাকাভর্তি দুধুলে ঘাস। হাসির সঙ্গে ওর ছোট ভাই, রেবেকার সঙ্গে ওর ছোট বোন রীনা, রাণীর সঙ্গে আঞ্জু–ছোটোগুলো ছুটতে থাকে, ওদের চেয়ে একটু বড়গুলো ঘাস নিয়ে এগোয়; অথচ ওদের শরৎচন্দ্র বা রবি ঠাকুরের নায়িকা হওয়ার কথা ছিলো, এই সন্ধ্যায় ওরাও পারতো চা বানিয়ে টি-কোজি দিয়ে তা ঢেকে রাখতে, যে টি কোজির প্যাটার্ন শিখতে তাদের নাকের জল চোখের জল এক করতে হয়েছিলো।

সন্ধ্যায় আয়মনা হাসি আর বুলুকে সঙ্গে নিয়ে মিয়া বাড়িতে যখন হাজির হয় তখন মিয়া বাড়ির বৈঠকখানায় বেশ ভিড়। কেউ হুকো খাচ্ছে, কেউ বিড়ি, পুরুষ মানুষের কণ্ঠস্বর গমগম করছে। আয়মনা ছোটঘরের, পুরুষ মানুষের সামনে যেতে তার কোনও অসুবিধে নেই, মিয়া বাড়ি বা জব্বার মিয়ার বউরাই শুধু পুরুষের সামনে যেতে পারে না, তাদের পর্দা করতে হয়। আয়মনার সেসবের বালাই নেই, এক হিসেবে বাঁচা গেছে, যদি পুরুষের সামনে বেরুনো না যেতো তাহলে এই ছেলেমে দুটো নিয়ে তার অবস্থা কী হতো? আয়মনা আর ভাবতে পারে না, সে গিয়ে কাচারি ঘরের সামনে দাঁড়ায়। সেখানে বেশ কয়েকটি চেয়ার পেতে বসে আছে গ্রামের মাতব্বর-মুরুব্বিরা। তাদের মধ্যমণি হয়ে বসে আছে মসজিদের ইমাম, সবাই যাকে মুন্সিসাব বলেই ডাকে। তিনি অবশ্য এই এলাকার নন, কোত্থেকে যে এসেছেন কেউ জানে না। তবে সবাই বলে নোয়াখালি থেকে এসেছেন তিনি। তার স্ত্রী যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষাটা এখানকার আঞ্চলিক ভাষার তুলনায় ভিন্ন। প-কে হ বলায় সবাই নিশ্চিত হয়েছে যে, তারা নোয়াখালীর, কিন্তু এ নিয়ে তেমন কারো মাথাব্যথা নেই, হুজুর কামেল মানুষ, তিনি সব নামাজ কালাম নিয়েই থাকেন।

হুজুরের তিন ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে লোহাগাড়া মাদ্রাসায় পড়ে, মেজটা বেশ ছোটই, আর ছোট মেয়েটার বয়স মাত্র তিন মাস। মেজ ছেলেটার নাম বনি আমিন। হাসিদের সঙ্গেই একত্রে মসজিদে হুজুরের কাছে পড়ে, পড়ার চেয়ে শয়তানিতেই তার দক্ষতা বেশি। একদিন সে হাসির ওড়নায় একগাদা পাট-বিছে-বেঁধে দিয়েছিলো। এই বিছার

হুঁল গায়ে লাগে না বটে, কিন্তু একসঙ্গে এতোগুলো বিছা দেখে হাসি ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, শরীর থেকে ওড়না ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিপারাও ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়েছিলো। সে জন্য হুজুরের কাছে ওকে কুড়িটা বেতের বাড়ি খেতে হয়েছিলো, সেই সঙ্গে সিপারার ওজনে চাল মেপে সেই চাল হুজুরের বাড়ি পৌছে দিতে হয়েছিলো। কিন্তু হাসি মনে মনে ভেবেছিলো, দোষটাতো ও করেনি, তাহলে ওকে গুনাগারি দিতে হবে কেন? হুজুর বনি আমিনকে কিছুই বলেননি। আরেকদিন হাসি, আঞ্জু, আঙ্গুরি, জানু, লায়লা-চাম্পা মসজিদের পাশ দিয়ে হেঁটে কোথায় যেন যাচ্ছিলো। আছরের নামাজের আজান দেওয়ার সময় হয়েছে, ওরা দেখেছিলো হুজুর লুঙ্গির তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে, হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গি তুলে এপাশ-ওপাশ হাঁটছেন। ওদের দেখে হুজুর ডাক দিয়েছিলো, 'এই যে আপনারা কোথায় চললেন?' ওরা লজ্জায় আর ভয়ে জবাব দিতে ভুলে গিয়েছিলো। হুজুরের লুঙ্গি উঠতে উঠতে বেশ অনেকখানি উঠে গিয়েছিলো, ভেতর থেকে হুজুর যেখানে তার আঙ্গুলটা ঠেকিয়ে রেখেছিলো সেই জিনিসটাও দেখা গিয়েছিলো। ওরা দ্রুত সেখান থেকে চলে যেতে চাইলেও পারছিলো না, হুজুর বলছিো ঝাড়ু হাতে নিয়ে মসজিদের সামনের চত্তরটা ঝাড়ু দিয়ে দিতে। প্রতিদিন সকালেই ওরা এই কাজটি করে, তবু সেদিন বিকেলে আরা কেন যে হুজুর ঝাড়ু দিতে বললেন কে জানে? ওরা নারকেল পাতার শলার ঝাড়ু দিয়ে মসজিদের সামনের খোলা চত্বর ঝাড়ু দিতে দিতে আড় চোখে হুজুরকে দেখেছিলো, হুজুর লুঙ্গির নীচে হাতটা জোরে জোরে নাড়ছিলো, আর ওদের দিকে কেমন কেমন করে তাকাচ্ছিলো, ওরা অতি দ্রুত ঝাড়ু দিয়ে ওখান থেকে সরে পড়েছিলো। ওরা জানে এই ভাবে হুজুর ওজু, করার আগে ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করে কিন্তু সেদিন কেন অতো জোরে জোরে ঝাঁকিয়েছিলো কে জানে? সহজাত বুদ্ধি হোক অথবা অন্য যে কোনও কিছুই হোক, এই ঘটনার কথা ওরা কাউকে কোনওদিন বলেনি। মেয়েদের বোধহয় এই জ্ঞান আপনাতেই জন্মায়, তারা নিজেদের গ্লানির কথা এভাবেই লুকিয়ে রাখতে শেখে।

আয়মনা যখন মিয়া বাড়ির বৈঠকখানার সামনে ছেলেমেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে তখন মেজ মিয়াই প্রথম কথা বলেন আয়মনার সঙ্গে। 'কী গো মণি, ম্যায়ারে কি আদব-লেহাজ কিছু শিহাইবা না? ম্যায়াতো ডাঙ্গর কোম অয় নাই, এ্যাহনও যদি ম্যায়ায় কিছু না শেহে তয় তারে বিয়া দিবা ক্যামনে?"

: কী হরছে ওবাই জান?

: ও তুমি জানো না কী হরছে? তোমার ম্যায়ায় বিটা ছাওয়ালের মতোন আজান দিলোম, কাতারে নামাজ পড়াইলো, তুমি কবার চাও তুমি কিছু জানো না? তুমি বাড়ি ছিলা না? নাকি তুমারও পাও জালাইছে?

: বাইজান, পুলাপান মানুষ, বোজে নাই, বুজলে কি আর এরহম ওইতো? ম্যায়া আমার কয়, বনি আমিন আজান দিলে দোষ অয় না, আমি দিলে দোষ অবে ক্যা?– আয়মনা বিষয়টা হাল্কা করার চেষ্টা করে খানিক। কিন্তু মেজ মিয়া বেশ জোরে ধমকে

উঠে, 'কী কইলা, তুমার সাহস তো কোম না, আমার মুহে মুহে কতা কও। মুন্সিসাব আপনি শরীয়া মুতাবেক এর যা বিচার-বিহিত অয়, করেন। ম্যায়া আর বয়স কোমস বইলা কোনও খাতির নাই। এই ম্যায়া এমনিই কালমুহি, পয়দা ওইয়াই বাপেরে খাইছে, ও এ্যাহন গ্রামে বালা মুসিবত ডাইকা আনার তালে আছে। কিভাবে আছে হুনছি কিয়ামতের আগে মাগিরা পুরুষপোলার মতোন কাম করবে, ল্যাংটা ওইয়া গুরবে; কিয়ামতের আর বেশি দেরি নাই মিয়ারা, ম্যায়ারা এ্যাহন আজান দিয়া নামাজ পড়ায়"।

: বাইজান আপনি এগুলা কি কন? আমার ম্যায়াডা অবুজ, ওরে আমি মরাছি আইজ, দ্যাহেন কপালডা কাইটা গ্যাছে। অরে আর শাজা দিয়েন না মুন্সিসাব। আমি বুজাইয়া বলবানে, আর কুনোদিন এরহম কাম করবে নাও। এ হারামজাদি, হুজুরের কাছে মাপ চা, যা হুজুরের পায় দইরা মাপ চাইয়া আয়–বলেই আয়মনা মেয়েকে ঠেলে এগিয়ে দেয় খানিকটা। আর তখনই অদ্ভুত এক আওয়াজে মুন্সি সাহেব কথা বলে ওঠেন।

: মাফ তো চাইতেই হবে, কিন্তু তাকে কিছু শাস্তিও ভোগ করতে হবে। নারী জন্য উঁচু গলায় কথা বলা হারাম, সেই নারী সুর করে আজান দেবে– এটা অনেক বড় গুনা। আর মেয়েতো এখন আর ছোট নেই, এই বয়সে আগের দিনে বিয়ে হয়ে স্বামীর ঘর করতে হতো। এছাড়া এই মেয়ে বেশ বেয়াড়া, কথা শোনে না। সে শরীরে কাপড়-চোপড় রাখতে পারে না, বুক থেকে সিপারাসহ কাপড়-চোপড় ফেলে দেয় পরপুরুষের সামনে–নাউজুবিল্লাহ-এরপর হুজুর বেশ কায়দার সঙ্গে আরবিতে একটা দোয়া পড়েন। কোন সুরর কোন আয়াত সেটা বোঝা যায় না, সামনে বসা মানুষগুলো এই বিজাতীয় ভাষায় হুজুরের মুখস্ত বাণী শুনে মোহিত হয়, হুজুরের গুণাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। মানুষগুলোর চোখ সেরকমই বলে। এরপর হুজুর চারদিকে তাকান, তাকিয়ে দেখেন, তারপর আবার শুরু করেন।

: আল্লাহপাক ও তার রাসুল (সঃ) নারী সম্পর্কে স্পষ্ট করে পাক কোরআনের সর্বত্র নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের সেই নির্দেশের এক চুল বাইরেও পা রাখার উপায় নেই। তাহলে সোজা দোযখে যেতে হবে। মানুষকে বিপথে-কুপথে নিয়ে যাওয়ার দরোজা নারীর শরীরে লাগানো। তারা বুক দুলিয়ে, কোমর নাড়িয়ে, শাড়ি তুলে পুরুষকে আহ্বান করে, কুপির আলো যেমন আহ্বান করে পোকা-মাকড়কে, পোকা-মাকড় যেমন এসে কুপির আগুনে পতঙ্গের পাখা পুড়ে প্রথমেই সে আর উড়তে পারে না, তারপর ধীরে ধীরে সে মারা যায়, কিন্তু নারীর পাপ-কুপে পুরুষ ঢুকলে কী হয়? বলেন আপনারা কী হয়? সবাই চুপ। হুজুরের প্রশ্নে ওরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। 'কী পারলেন না বলতে? শোনেন তবে বলছি... ওরা ইজা... একটা বেশ দীর্ঘ আরবি আয়াত শেষে হুজুর বলেন, 'ওই পাপের কুপে ঢুকে পুরুষ প্রথমে কোনও পথ চোখে দ্যাখে না, সে প্রথমে আনন্দে আত্মহারা হয়, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তার ইচ্ছে করে ওই পাপের কুয়ার থাকতে, তারপর একদিন তার কাছে একটু গন্ধ লাগে। ধীরে ধীরে গন্ধটা তীব্র হয়, অসহ্য মনে হয় কিন্তু তখনতো আর ওই কুয়া থেকে বাইর হওয়ার কোনও উপায়

নাই। চতুর নারী সেই দরোজা তো পুরুষ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করে দিয়েছে। এখন পুরুষের ইহকাল-পরকাল এই পাপকুপের মধ্যে কাটাতে হবে, এর থেকে পুরুষের আর মুক্তি নেই। তাইতো আমি সব সময় বলি, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপ এই নারী। পুরুষকে এই পাপ থেকে সব সময় দূরে থাকতে হবে। কী ছোট, কী বড় সব নারীই এই পাপের ভান্ড, সবাই সমান সবার থেকেই আমাদের দূরে থাকতে হবে'– কথার মাঝখানে হুজুর পানের পিক ফেলেন একটু দূরে। তারপর আবার শুরু করেন। 'এই যে মেয়েটা আজ আজান দিয়েছে, এটা আর কিছু নয়, শয়তানকে এই গ্রামে আহবান করেছে। পুরুষ যদি আজান দেয় তাহলে সেটা হয় মুসুল্লিদের সালাত আদায়ের জন্য আহ্বান আর নারী যদি আজান দেয় তাহলে সেটা হয় শয়তানকে আহ্বান। এরপর এই গ্রামে যতো অসুখ-বিসুখ হবে সব কিছুই হবে এই মেয়ের আজানের জন্য আসা শয়তানের দ্বারা। সে শয়তানকে আহ্বান করে পাপ করেছে, তার বয়সের হিসেবে আমরা এই পাপকে বলবো দুধ-পাপ। কোনও পাপেরই ক্ষমা নাই, পাপের শাস্তি পেতেই হবে, তার বয়স কম হলেও সে যে পাপ করেছে তার জন্য তাকে শাস্তি পেতেই হবে কারণ তার পাশে পুরো গ্রাম ছারখার হবে। তাছাড়া তারে এখন শাস্তি না দিলে পরে সে আরও পাপী হবে, শরীরের পাপে সে সবাইরে ডুবাবে। আমি তারে দশটা ধানের শীষ একত্র কইরা পঞ্চাশটা কোড়া মারার নির্দেশ দিলাম, বলেন চোবহাআল্লাহ।'

শুদ্ধ বাংলায় মুন্সি সাহেবের বুক্তৃতা শেষ হয়, শ্রোতারা এবার নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করে। কেউ শাস্তির প্রতিবাদ করে না। মুন্সি সাহেব তখন আবার শুরু করেন, আগামি শক্রুবার, বাদ জুম্মা, মসজিদের সামনে এই শাস্তি দেওয়া হবে। এই যে বেটি, তুমি তোমার মাইয়্যারে সেদিন মুখঢালা ওড়না দিয়ে আইনো, এই মাইয়া তো গতরে কাপড় রাখতে পারে না"।

: হুজুর এই শিশুরে এরহুম শাজা দিয়েন না হুজুর, আল্লার আরশ কাঁইপা উঠফে হুজুর, অর তো কুনও দোষ নাই হুজুর। হাসিরে আমি নিজে মারছি, আরও মারবো। হুজুর, আর কুনওদিন ও আজান দিবেন নানে হুজুর, আপনি ওরে মাফ কইরা দ্যান মুন্সিসাব–আয়মনা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

এবার মুন্সির বদলে কথা বরে মেজ মিয়া। 'ও মনি, ইসলামের শরীয়ত-মারুফত তুমি মুন্সি সাবের চাইয়া বেশি জানোনি? মুহে মুহে আর জিরা কইরো না, এবার যাও, বিচার ওইয়া গ্যাছে। শুকুকুর বার নামাজের পর মসজিদে ম্যায়া নিয়া আসফা। এই যে দশজন সাক্ষী, এ্যাহন তুমি যাও'।

এরপর আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা, আয়মনা ছেলে-মেয়ের হাত ধরে বাড়ির পথ ধরে। বেশ অন্ধকার পথ, কিন্তু আয়মনার কাছে অন্ধকার লাগে না। নৈঃশব্দে ওরা পথ হাঁটে। মসজিদের ভিটের সামনে দিয়ে পথ, ওরা মসজিদের সামনে এসে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে চত্বরের দিকে, কী মনে হয় আয়মনার কে জানে, মেয়েটাকে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে ধরে রাখে। তারপর দ্রুত ওই পথটুকু পেরিয়ে আসে। বাড়ি ফিরে সে রাতে

আর ওদের খাওয়া হয় না কিছুই, আজ বুধবার, মাঝখানে বৃহস্পতিবার, তারপরেই তো শুক্রবার। মাটিতে খেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে ওরা শুয়ে পড়ে, দু'পাশে দুই ছেলেমেয়ে, মাঝখানে আয়মনা। মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আয়মনা বলে, 'এতোগুলা ধানের শীষের কোড়া, ও আল্লা আল্লারে কী মাজা আমারে তুমি দিলা? কী পাপ করছিলাম আমি?'

: মা তুমি কাইন্দো না, আমি বেশি ব্যাথা পাবান নানে, আমি কানবান নানে মা, তুমি কাইন্দো না মা। মেয়ের কথা শুনে আয়মনার বুকের ভেতর থেকে দমকে উঠে কান্না। এই অবুঝ শিশু, তার প্রতিও ক্ষমা নেই, এ কেমন ধর্ম? তার মনের মধ্যে প্রশ্ন উত্থাল-পাথাল করে। একবার ভাবে, আজ রাতেই ছেলেমেয়ে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু যাবেটা কোথায়? এ জীবনে তো শহরের কোথাও যায়নি আয়মনা। এখন এই দুটো শিশু বাচ্চা নিয়ে কোথায় গিয়ে সে আশ্রয় খুঁজবে? বাপের বাড়িও যাওয়ার মতো কিছু নেই, ভাইয়েরা, ভাইয়ের বউয়েরা দুর দুর ছেই ছেই করে তাড়িয়ে দেবে তিন দিনের মাথায়। জীবনে এতো অসহায় বোধহয় আর কখনও লাগেনি ওর, এমনকি খলিলের মৃত্যুর পরও না। বরং চোরের বউ হিসেবে বদনামটা ওর ঘুচে গিয়েছিলো খলিলের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই, তাতে এক বাঁচা বেঁচেছিলো বরং। কিন্তু এখন, মেয়ের পিঠে যখন দশটা ধানের শীষ একত্র করে কোড়া মারবে তখন যা হয়ে তা কী করে সহ্য করবে আয়মনা?

ভাবতে ভাবতে ওর ঘুম আসে না। ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমিয়ে পড়ে, বাইরে ঘরের বেড়ায় কারা যেনো টোকা মারে। ইচ্ছে করে বটি নিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ওপর। মনে হয়, আজকে যদি ওদের এরকম বিচার হতো তাহলে ভালো হতো, ধর্ম এদের দিকে দেখে না কেন? আয়মনার চোখ ভেঙে জল আসে, রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত আয়মনা ঘুমুতে পারে না দু'চোখ ভর্তি নোনা জল থাকলে কি আর ঘুম তাতে ঢুকতে পারে? ঘুমেরও তো জায়গা দরকার খানিকটা, নাকি?

পরদিন সকালে গ্রামের সবার মুখে এক তথ্য, 'খলিল চোরার অপায়া ম্যায়ার বিচার হবে, ধানের শীষের কোড়া মারবে মুন্সিসাব'। যেন এক সকালেই আয়মনা আর তার ছেলেমেয়ে সবার কাছে দর্শনীয় বস্তু হয়ে গেছে। কতোজন আসছে দেখতে, শুনতে, জানতে। আসলেই কী হয়েছিলো? কেন তারে হাসিকে শাস্তি দিয়েছে মুন্সি সাহেব? গল্পের ডালপালা ছড়াতে সময় লাগে না, অতি দ্রুত মানুষ জানতে পারে, আসলে আজন-টাজান কিছু নয়, 'খলিল চোরার অপায়া ম্যায়াডা জিনা হরছে হইসুস্যার ভুঁইতে'। বাক্যটা খুব নীরিহ শোনালেও ততোটা নীরিহ নয়, বরং হাসির জন্য সেটা ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায়, সর্বত্রই তাকে মানুষ প্রশ্ন নিয়ে দ্যাখে, প্রশ্ন করে, উত্তর না পেলে মুখে একটা 'ঠোকা' দিয়ে বলে, 'এহ চোরের ম্যায়ার ঠমক কতো দ্যাহো, ক্যারে মাগি করবার সুমায় মনে আছিলো না?' হাসি ভেবে পায় না সে আসলে কী করেছে? যার জন্য তাকে সবাই এভাবে ঘিরে ধরেছে।

শুধু পরের দিন গোবার কুড়োতে গিয়ে কিংবা দুধুলে ঘাস তুলতে গিয়ে ওর সঙ্গীরা

ওকে কীভাবে ধানের শীর্ষ দিয়ে মারবে তা নিয়ে গভীর কষ্টে ডুবে যায়। অনেকক্ষণ ওরা ক্ষেতের আলে বসে থাকে, মাঝখানে হাসি, ওর চারপাশ ঘিরে মেরে, শাহিদা, জানু, লালয়া, চাম্পা, জানু, রেবেকো–সবাই মেয়ে, এই শাস্তি যে কেউ পেতে পারতো, ওদের সবাই সেদিন হাসির পেছনে কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছে, পুরুষ মানুষে কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে, ওরা পারবে না কেন? এই ছিল ওদের মনে প্রশ্ন, সেই পশ্ন যে হাসির জন্য এতো বড় শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে, ওদের ছোট্ট মনে ওরা তা ভাবতেও পারেনি। তাই ক্ষেতের আলে বসে ওরা হাসিকে শান্ত্বনা দেয়, 'তুই ভয় পাইস না বুনুডি, দাঁতের তলে খাজুরের বিঁচি দিয়া খাড়াইয়া থাকপি, তাইলে ব্যাখ্যা পাবি না বুজছস?'

ওদের কথায় হাসি মাথা নাড়ে। ওর মনে হয়, মা এতো মারে, তাতে ব্যাখা পাওয়া যায়, হয়তো তার চেয়ে বেশি ব্যাখা হবে না ধানের শীঁষের কোড়ায়। ওরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে রাখে অনেকক্ষণ, তারপর সূর্য যখন গ্রামের পশ্চিম পাশে পুরোপুরি ঢলে পড়ে তখন ওরা বাড়ির পথ ধরে, অন্যদিনের তুলনায় সেদিন ওদের ঝাঁকায় দুধুলে ঘাস অনেক কম; ওদের মনভর্তি সেদিন অনেক বড় দুঃখের বোঝা, যা ওদের শরীরের তুলনায় হয়তো অনেক, অনেক বেশি ভারি।

শুক্রবার দুপুরে নামাজের পরে খুব স্বাভাবিক ভাবেই হাসির পিঠে পঞ্চাশটা কোড়া মারা হয়, পাঁচ ছ'টা কোড়া মারার পরেই শীষ থেকে পাকা ধানগুরো ঝরে যায় বলে প্রায় চার বার ধানের শীষ পরিবর্তন করতে হয়। পাতলা ফ্রকের ওপর দিয়ে হাসির পিঠ থেকে রক্ত ঝরে, জামা ভিজে যায়, হাসি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, দুপুরের কড়া রোদের কারণে ওর নাকের নীচে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে নাকি কোড়া খাওয়ার কারণে এই ঘাম– কেউ ধরতে পারে না। হাসি তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে, সেখানে খয়েরী ডানার ভুবন চিল ওড়ে, ওর মনে হয় চিলটা ক্রমশঃ মসজিদের চত্বরের দিকে নেমে আসছে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে কিছু কিছু আশেপাশে তো কোথাও কোনও মাছ নেই, চিলটা নেবে কি? চিলটার জন্য ওর দুঃখ হয় খুব, এরপর আর কিছুই মনে পড়ে না ওর। এর পরে আবার যখন সবকিছু মনে পড়তে শুরু করে তখন বোধহয় গভীর রাত, ধুম জ্বরের ঘোরের ওর তখন কতো কিছু যে বলতে ইচ্ছে করে তার ঠিক নেই।

'এ বুলু, খালই নইয়া আয়, ঝালোডাঙ্গার বিলি বাজারি মাছ গাবাইছে। মাইনসি এতোক্ষুণ সব মাইরা হালাবেনে, নো দাদা, এক খালই মাছ ধইরা আনবানে, হ্যাসে মারে কবানে হইস্যার ত্যাল দিয়া রানবার'।

মেয়ের মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে আয়মনা জ্বরের ঘোরে হাসির মুখের প্রলাপ শুনে আশ্চর্য হয়, আহারে কোনও দিন মেয়েটা কি খেতে চায়, কি পছন্দ করে তা জানা হয়নি। এখন জ্বরের ঘোরে বাজারি মাছ শর্ষের তেল দিয়ে মাখামাখা করে রান্নার কথা মনে হয় ওর খুব। দুপুরে ধানের শীষের কোড়া খেতে খেতে যখন ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তখন আয়মনা চিৎকার করে উঠেছিলো, 'আফনাগো মনে কি এটুও মায়াদয়া নাই? এটুক এটা দুধের শিশুরে আফনারা এরকম বে-রহমের লাহান মারবার লাগছেন, আরে গ্রামে

পাপ কি কম আছে নি? খুঁজলি হগগুলির গুদিই ও পাওয়া যাবেনে, আমার ম্যায়াডারে আফনারা মাফ কইরা দ্যান, ওর বদলে আমারে আফনেরা যারেন, তাও এই শিশুরে আর কষ্ট দিয়েন না।"– কে শোনে কার কথা। গুনে গুনে পশ্চাশটা কোড়া মারার পর সবাই যে যার মতো বাড়ি যায়, শুক্রবার মসজিদে পাওয়া সিরুনি খেতে ভুলে যায় সবাই। কারো বা বাটিতে, কারো কলা পাতায় মোড়ানো সিরুনি ঠান্ডা হয়ে যায়, সবাই হা করে দেখে, মসজিদ চত্বরের ধুলোয় পড়ে আছে হাসি, ওর পিঠের জামা ভিজে গেছে, তার ওপর রোদ চলকে চলকে পড়ছে– মার শেষ হলে মেয়েকে কোলে নিয়ে আয়মনার বাড়ি ফিরতে একটুও কষ্ট হয় না, মেয়েটা এতো হাল্কা? আহারে, কতোদিন মেয়েটারে একটু কোলেও নেওয়া হয় না– আয়মনার মনটা ভারি হয়ে ওঠে।

বিকেলেই জ্বর আসে, আর সন্ধ্যা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বরের গোরে ভুল বলতে শুরু করে হাসি। তারপর সারাটা রাত যায়, সকালে নগেন ডাক্তারকে ডেকে আনে আয়মনা, নগেম ডাক্তার ওষুধ দিয়ে যায়, ডাক্তার সমস্ত ঘটনা শুনে কেমন বোকার মতো তাকিয়ে থাকে আয়মনার দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওষুধের বাক্সটা নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে নগেন ডাক্তার। তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে তীব্র অসহায়তা, ব্যাগ নিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষটাকে তখন খুব ভাঙাচোরা মনে হয় আয়মনার।

নগেন ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে চারদিন জ্বরে ভুগে উঠে দাঁড়ায় হাসি, শুকিয়ে বুকের পাজরা বেরিয়ে যাওয়া হাসি যখন জব্বার মিয়াদের কলপারে মুখ ধুতে যায় তখন সবাই যেন ওর দিকে কেমন করে তাকায়। এমনিতেই ও 'অপায়া' তার উপর এই শাস্তি ওকে যেনো একেবারেই আলাদা করে ফেলে। ও যেখনেই যায় লোকে ওর দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকায়, প্রশ্ন করে, আরও কতো কথা বলে, যার অনেকটাই হাসি বুঝতে পারে না। এই অবোধ্য কষ্ট দিয়েই হাসি গোবর কুড়ায়, শামুক কুড়ায়, ছাগল আর গাই-বাছুরের জন্য দুধুলে ঘাসের সময় দুধুলে, পাটের সময় পাটের পাতা, ধানের সময় ক্ষেতের আল খেতে হাত পাঁচেক লম্বা লম্বা বাক্সা ঘাস কেটে আনে– আর সবচেয়ে বেশি ধরে মাছ, মাছ ধরার মতো আনন্দ যেনো হাসি আর কিছুতেই পায় না।

হাসি সব কিছুই করে, শুধু মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দেয়, ওকে আর কখনও মসজিদের দিকে ছিপারা বুকে করে কেউ যেতে দেখেনি। ধানের শীর্ষের কোড়া ওকে শুধু মসজিদ নয়, আরও অনেক কিছু থেকেই হয়তো দূরে সরিয়ে দেয়। হাসি আর কখনও নামাজও পড়ে না, ওর সঙ্গীদের নিয়ে কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার ইচ্ছেতো যায়ই সেই সঙ্গে একা একা নামাজ পড়ার কথাও ওর আর কোনও দিন মনে হয় না। বরং একটু বড় হতে হতেই ওর 'অপায়া' দুর্নামের সঙ্গে যুক্ত হয় 'দুধ-পাপী' নামও। ও কিছু বলে না কাউকে, নিজের মনে থাকে, নিজের মতো করে থাকে। এখন ভাইটা বেশ বড় হয়েছে, তাকে নিয়েই দিনমান কাটে ওর। যদিও এখন নিজের শরীরটা নিয়েও ওর বিরক্তি কম নয়, শুকনো শরীর ধীরে ধীরে কেন যে এতো ভারি হয়ে যাচ্ছে দিন দিন সেটা ও বুঝতে পারে না। যেকোনেও অবোধ্য ব্যাপারই কষ্টদায়ক, কিন্তু ও ধীরে ধীরে

নিজের কষ্ট নিজের ভেতরে গোপন করতে শিখে গেছে। মসজিদ চত্বরে ওই ঘটনার পর ও আর কোনও কষ্টের কথাই কাউকে বলেনি কখনও, এমনকি আয়মনাকেও না। শুধু যেদিন শরীর থেকে ওর লাল রক্ত বেরিয়েছিলো সেদিন আয়মনার কাছে না গিয়ে পারেনি, এরপর ব্যাপারটা গা সওয়া হতে সময় লাগলেও এ নিয়ে আয়মনাকে আর কখনও বিরক্ত করেনি হাসি। দেখতে দেখতে কখন যে সময় যায় কে জানে? আয়মনার কালো চুল সাদাটে হয় আর হাসির শরীর যেন প্রতিদিন গমকে গমকে বাড়ে। ওর সঙ্গীদের কারো কারো বিয়ে হয়ে গেছে, কারো বিয়ে হবে হবে করছে। অথচ আয়মনা হাসির জন্য কোনও পাত্র জোগাড় করতে পারে না। হাসি যে 'দুধ-পাপী'; ধানের শীষের পঞ্চাশ কোড়ার দাগ যে ওর পিঠে এখনও আছে, অথবা হাসির পিঠে তা খুঁজে না পাওয়া গেলেও মানুষের মন থেকেতো সে দাগ মিটে যায়নি? তাছাড়া 'অপায়া' বদনামের সঙ্গে নতুন যেসব দুর্নাম যোগ হয়েছে তাতে এই বেনামাজি, বেশরা মেয়েকে কেউ ঘরে নিতে চায় নাকি? কিন্তু কেন যেন আয়মনা এ জন্য হাসিকে দোষ দিতে পারে না। নিজের মেয়ে বলে নয়, হাসির মধ্যে সে কোনও দোষ-ক্রুটি খুঁজে পায় না। সারাদিন মুখ বুজে মেয়েটা কাজ করে, কোনও কাজেই আপত্তি নেই। সংসারের তিন তিনটা মুখতো ওই হাসিই বাঁচিয়ে রেখেছে। যখন যেভাবে পারছে, খেটেখুটে সংসারকে টিকিয়ে রেখেছে, এখন এই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সংসারের কী অবস্থা দাঁড়াবে সে চিন্তা করে আয়মনা শিউরে উঠে। তবু নিজের অবস্থা মেয়ের বিয়ের কথা কোনও মা না ভেবে পারে?

কিন্তু কেউ তো এগিয়ে আসে না এদিকে। যাও বা দু'একটা আসে তাদের বয়স মৃত খলিলের কাছাকাছি, হাসির চেয়ে বড় তাদের আগের ঘরের ছেলেমেয়ের বয়স। এমন জায়গায় মেয়ে দেওয়ার চেয়ে তাকে ঘরের খুঁটি বানিয়ে রাখাটাও বোধ হয় ভালো– আয়মনা ভাবে। আবার ভাবে এই সোমথ মেয়ে, যদি কোথাও আবার কোনও বিপদ ঘটে? শত্রুর তো অভাব নাই, জব্বার মিয়ার বউয়ের কাজ করে সারাদিন হাসি, ওই বাড়িতেই তো তিন তিনটা যুবক কামলা, তারা যদি কেউ কিছু করে, তখন? আয়মনার মনে শান্তি নেই। কিন্তু মেয়েকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, কথা এতো কম বলে যে, ওর ভেতর কখন কি হচ্ছে কেউ বুঝতে পারবে না কিছুই।

আয়মনা যখন মেয়েকে নিয়ে এমনসব ভাবনায় নির্ঘুম রাত কাটায় তখন ভাবনাহীন হাসি গভীর ঘুমে অচেতন থাকে, কাকভোরে উঠে নিজেদের ঘরের কাজ সেরে দ্রুত চলে যায় জব্বার মিয়ার বাড়ি, সেখানে তখন বাড়ির তিনজন কামলা গরুর যাবনা তৈরি করে, কেউ জমিতে হাল দেওয়ার জন্য লাঙল-জোয়ার নিয়ে তৈরি হয়, কেউ বা উঠোনে নেড়ে দেওয়া ইরি ধান ছড়ায় রোদ উঠার আগেইথ–হাসি তাদের কারো দিকেই খেয়াল করে না, নিজের কাজ নিয়ে পড়েও। ওরা যে কেউ হাসিকে ইঙ্গিতে ইশারায় ডাকে না তা নয়, কিন্তু হাসি তার চারদিকে কঠিন একটা দেয়াল তুলে রাখে, অনেক দনি এই দেয়াল ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে বলে এখন এসব দেয়ালকে আরও কঠিন করে নিয়েছে হাসি। জব্বার মিয়ার বউ হাসিকে খুব আদর করে, হাসির কাজের কোনও খুঁত নেই, তাই হাসিকে সে কোনওদিনই তাড়িয়ে দেবে না। মাঝে মাঝে সে যখন বিয়ের কথা তোলে তখন হাসি

বলে, 'আফনে আমারে খেদাইয়া দিয়েন না মাইজা আম্মা, আমার তো যাবার জাগা নাই, এহেনেই বালো আছি, আবার কুহানে যাবানে, কার লাখি-গুঁতা খাবানে, তার চিনা এহেনে আফনার কাছেই খাহি'।

জব্বার মিয়া বউ মেয়েটের মুখের দিকে তাকিয়ে অভিভুত হয়ে যায় তখন, মনে হয় মেয়েটার মনের জোর অনেক। ও জানে ওর বিয়ে হবে না, এতো বদনামের মেয়েকে কেউ বিয়ে করে না, অথচ সবাই চারদিক থেকে হাত বাড়ানোর জন্য মুখিয়ে আছে। কামলাদের জব্বার মিয়ার বউ স্পষ্ট বলে দিয়েছে, যদি কোনও দিন হাসিরে কেউ জ্বালায় তাহলে সেদিনই তাকে বের করে দেবে কাজ থেকে, এই আঁকড়ার বাজারে সারা বছরের এরকম নিশ্চিত কামাই ছাড়তে কেউই রাজি হবে না, তাই আপাততঃ হয়তো হাসিকে কেউ জ্বালাবে না, কিন্তু এরকম কতোদিন? তার মনে হয়, শিশুকালের একটা ভুল মানুষের জীবনকে কতোই না বদলে দেয়, নিজের জীবনেও সে এরকম ভুল শিশুকালের একটা ভুল মানুষের জীবনকে কতোই না বদলে দেয়, নিজের জীবনেও সে এরকম ভুল খোঁজার চেষ্টা করে কিন্তু সেগুলোকে তার ভুল বলে মনে হয় না– বরং তাকে ফেলে রেখে তার মায়ের জন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যাওয়ার কষ্টটা তার আরও অনেক বড় বুল বলে মনে হয়, সে ভুল কার তা তার জানা নেই, অথবা খুঁজে বের করারও ইচ্ছে নেই তার। সেটা অবশ্য অন্য গল্প, জব্বার মিয়ার বউ হাসির দিকে তাকিয়ে হাসির ভেতরকার প্রতিবাদী চরিত্র। আবিষ্কারের চেষ্টা করে। হাসি হয়তো তখন কুলোর ধান নিয়ে বাতাসের অনুকুলে ছেড়ে দিচ্ছে, ধুলো উড়ে যাচ্ছে আর ধানগুলো জড়ো হচ্ছে এক জায়গায়, জব্বার মিয়ার বউয়ের মনে হয়, এভাবে যদি মানুষের জীবন থেকেও সব ময়লা ঝেড়ে ফেলা যেতো, হাসির দুধ-পাপও হয়তো এভাবে ও নিজেই উড়িয়ে দিতে পারতো; কিন্তু জবিনতো ধান নয়, জীবন জীবনই, সেখানে দুধ-পাপ আজীবনের পাপ হয়েই থাকে, ময়লা হয়ে উড়ে-পুড়ে যায় না।

বর্ষা আসে, বর্ষা যায়–বরা বর্ষায় হাসিদের গ্রামটাকে ভেসে থাকা দ্বীপের মতো মনে হয়, গ্রামের খুব কাছ দিয়েই পাল তুরে ধান-পাট-পেঁয়াজের ব্যবসায়ীদের বিশাল বিশাল নৌকো যায়। কখনও কখনও প্রায় দুপুরের দিকে মাইক বাজিয়ে দুই মাঝির ঘাসি নৌকো যায়, বোঝাই যায়, হয় এই নৌকায় বর যাচ্ছে বিয়ে করতে, নয় বিয়ে করে বউ নিয়ে ফিরছে। একেক দিন একেক নৌকোয় একেক গান বাজে, কখনও বাজে, 'বড় লোকের বিটি লো লম্বা লম্বা চুল, লাল মাথায় বেজ্যা দ্যুব লাল গেন্ধ্যা ফুল... তোমার সনে দেখা হোবে বাবুর বাগানে' অথবা 'যারে যা চিঠি লেইখা দিলাম সোনা বন্ধুর নামে রে...চিঠি রে তুই পঙ্খি হ্ পলকেতে উইড়া যা... ঘুম আসে না একলা ঘরেতে রে...'–জব্বার মিয়াদের বাগানের ঘাটে বসে হাসি এই গান শুনে সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দিকে তাকায়, নাহ কোথাও কোনও ভুবন চিলের দেখা পাওয়া যায় না। বর্ষার সব চিল যেনো কোথায় চলে যায়, সব চিলেরা শীতে ফিরে আসে– হাসি অপেক্ষা করে চিলদের ফিরে আসার; এই চিলরাই ওর অনেক বেশি চেনা, অন্ততঃ ওর আশেপাশের মানুষগুলোর চেয়ে।

মায়ের কবর

মীজান রহমান

গাড়িটা এসে থামলো গেটের সামনে। ত্রস্ত পদে বেরিয়ে ড্রাইভার খুলে দিল গাড়ির দরজা। গফুর সাহেব আস্তে আস্তে নামলেন গাড়ি থেকে। বাতগ্রস্ত শরীর তাঁর, মাটিতে পা ফেলতেই কষ্ট হয়। সঙ্গে ছোটবোন সিতারা, তার শরীরটাও খুব ভালো যাচ্ছে না ইদানিং। রোজই সন্ধ্যাবেলা ঘুষ ঘুষে জ্বর আসে গায়ে, তারপর সারারাত মাথার ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা। তবু বড় ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হল। গফুর সাহেব উঁচু গেটটার দিকে তাকিয়ে মনে করতে চেষ্টা করলেন কত দিন পরে এসেছেন এখানে। প্রায় পঞ্চাশ বছর। স্কুলে পড়াকালে সেই যে বন্ধুটি মারা গেল তারপর আর এখানে আসা হয়নি। কি যেন নাম ছিল বন্ধুটির। মনে পড়েছে, মাহবুব! দেওয়ান মাহবুবুল হক। তুখোড় ছাত্র ছিল সে--ভূগোলে মোটা নাম্বার পেত। ওদেও বাসায় কতবার গেছেন গফুর সাহেব–ওর মা চমৎকার তিলের নাড়ু বানাতেন। উনি মাহবুবকে শেখাতেন অংক, আর মাহবুব ওঁকে সাহায্য করতো ভূগোলে। দু'জনের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা কে ফার্স্ট হয় কে সেকেন্ড। এতোদিন আগের কথা কেমন করে সব ভেসে উঠছে চোখের সামনে। মাহবুবের বাড়িতে সেদিন নিমন্ত্রণ ছিল, ওর বোনের বিয়ে। বিয়েতে যাওয়া হয়নি। দুপুরবেলা মাহবুব পাড়ার এক বন্ধুকে সাথে করে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল বুড়িগঙ্গায়। সাঁতারে ওর জুড়ি কেউ ছিলনা। বোনের বিয়ের উত্তেজনায় সেদিন একটু ডাইভিং করার ঝোঁক উঠলো মাথায়। নোঙরপাতা একটি বার্জের উপর থেকে ঝাঁপ দিল পানিতে। শক্ত একটি কাঠের খুঁটি ছিল পানির নীচে যেটা সে দেখেনি। ঝাঁপ দেবার পর একবারই সে মাথা উঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল 'বাঁচাও বাঁচাও'। ওর বন্ধুরা ভাবছিল মস্করা করছে। কেউ গ্রাহ্য করেনি। বিকেলবেলা বার্জ সরিয়ে মাহবুবকে পাওয়া গেল। মাহবুবের থেতলানো মাথাটা এখনো ভোলেননি গফুর সাহেব, এখনো গা শিউরে উঠে। পঞ্চাশ বছর পর এই গোরস্থানে এসে মনে হচ্ছে যেন গেটটার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মাহবুব। মিষ্টি করে হেসে বলছে, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি গফুর, এসো।

ছাত্র জীবনে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বহুবার এসেছেন তিনি নিউমার্কেটে। কেনা কাটার জন্যে না। রেস্টুরেন্টে বসে আলুচপ খাওয়ার জন্যে, দুধের সর মাখানো চা খাওয়ার জন্যে, আড্ডা মারার জন্যে, তার ফাঁকে ফাঁকে কলেজের সালোয়ার কামিজ পরা মেয়েগুলোর দিকে না তাকাবার ভাব করে ঘোরাঘুরি করার জন্যে। চুয়ান্ন সালেরও আগের কথা। তখনো দেশে মুসলিম লীগের রাজত্ব, তখনো সেই সর্বনাশা বন্যা আসেনি দেশে, ভাষা আন্দোলনের রক্ত তখনো শুকায়নি ভালো করে। এ জায়গাটিতে তখন

অনেকগুলো বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে থাকতো তোরণের আকারে, আর আজিমপুর কলোনীর তরুণ তরুণীরা তার মাঝ দিয়ে হাঁটতো, সাইকেল চালাতো। কোন কোন দুঃসাহসী যুগল ওখানে হাতে হাত ধরে হেলে দুলে হাঁটতো, যেন পৃথিবীতে ঐ দুটি প্রাণী ছাড়া আর কিছু নেই। জীবন যেখানে নির্ঝর হয়ে উঠতো, প্রাণের সব বল্গা যেত খুলে। অথচ তার পাশেই এই নির্জন জায়গাটা। এখানে সময় নিশ্চল, নিসর্গ নিশ্চুপ। এখানে অশরীরী আত্মার বাস। মাহবুব এখানে ঘুমিয়ে আছে।

দীর্ঘকাল পরে গফুর সাহেবের আবার ঢুকতে হল এর উঁচু গেটের ভেতর দিয়ে। এখানে তাঁর বাবা মায়ের কবর। তাঁদের মৃত্যুদিবসে সিতারা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কবর জিয়ারত করে যায়, অন্যান্য ভাইবোনেরাও কয়েকবার ঘুরে গেছে। তবু তাঁরই আসা হয়নি কোনদিন। তিনি ঢাকায় থাকেন না, থাকেন দূর আমেরিকায়। পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেই যে ছেড়েছেন দেশের মাটি, তারপর শুধু একবারই এসেছিলেন সস্ত্রীক বেড়াতে। না এলেই ভাল হতো। না এলে স্মৃতি এমন যাতনা হয়ে উঠতো না।

দুটি কবরই সিতারার ভালো করে চেনা। বাবা-মায়ের শেষ জীবনে সে-ই ওঁদের দেখাশুনা করেছে সবচেয়ে বেশী। ভাইবোনদের বেশীর ভাগই দেশ বিদেশের নানা জায়গায় ছড়ানো। দু'ভাই আমেরিকায়, একজন সিঙ্গাপুরে। তিন বোনের মধ্যে একজন লন্ডনে, আরেকজন বাহরাইনে। শুধু সিতারাই থাকে ঢাকায়। ও না থাকলে দেশে গিয়ে হয়ত হোটেলেই উঠতে হত সবাইকে। পরিবারের শেষ খুঁটিটা সেই টিকিয়ে রেখেছে এখন পর্যন্ত। এককালে মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দরী ছিল, মনটাও ছিল ভারী নরম। ছোটবেলায় গফুর ভাইয়ের জন্যে কি পাগলটাই না ছিল সে। ভাইয়ের জামাকাপড় গুছিয়ে রাখতো সে, বিছানার উপর চাদর ছড়িয়ে রাখতো, সাবান দিয়ে গেঞ্জী কেচে দিতো, এমনকি একজোড়া জুতো যে ছিল তাঁর সেগুলোও নিয়মিত পালিশ করে রাখতো। গফুর সাহেবও বোনটির জন্যে অজ্ঞান ছিলেন। কলেজে পড়াকালে মাসিক বৃত্তির টাকাটা হাতে এলেই ভাই বোনের সবার জন্যে এটা ওটা কিনে আনতেন, বিশেষ কওে সিতারার জন্যে। একজোড়া স্লিপার, না হয় সিল্কের কামিজ, মেয়েদের প্রসাধনের জিনিষ, নিদেনপক্ষে এক ডজন কাঁচের চুড়ি। বাবার ছোট চাকরী, তাতে করে মাসের বাজারটাও ভালো করে চলতো না। তিন সপ্তাহ যেতে না যেতেই টাকা ফুরিয়ে যেত, তখন লোকজনের কাছে ধার করে কিনতে হত চালডাল তরিতরকারি। সুতরাং নতুন কাপড়চোপড় ছিল এ বাড়িতে বিলাসিতা।

এমনকি ঈদের সময়ও সবার ভাগ্যে নতুন কাপড় জুটতো না। সেইসব দিনের কথা এখনো ভোলেননি গফুর সাহেব। মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে ভাবতে যেয়ে। এতো কষ্টের সংসারেও আনন্দময় মুহূর্তের অভাব ছিলনা। আজকে কারো জীবনে অর্থের অনটন নেই, অনটন শুধু আনন্দের।

খানিকদূর হেঁটেই পাওয়া গেল বাবার কবর। চারদিকে ইটের দেয়াল দিয়ে বাঁধানো। ভাই বোনেরা চাঁদা তুলে জায়গাটা কিনে নিয়েছিল। সিতারা ঘোমটাটা মাথায় টেনে গম্ভীর

মুখে দোয়াদরুদ পড়তে লাগলো। গফুর সাহেব দোয়াদরুদ পড়েন না তেমন, ওগুলোর উপর খুব একটা বিশ্বাসও নেই। এককালে রীতিমত নামাজ পড়তেন, বাবার সঙ্গে নিয়মিত মসজিদে যেতেন, এমনকি দুয়েকবার ছোট জামাতের ইমামতি করেছেন। ভাবতে হাসি পায়। গফুর সাহেব নিজেকে নাস্তিক ভাবেন না কখনো। খানিকটা এগনস্টিক ঠিকই, কিন্তু নাস্তিক নন। স্রষ্টার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী কিন্তু সে স্রষ্টার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণা অন্য সবার থেকে ভিন্ন। একজনের দোয়াদরুদ দিয়ে আরেকজনের উপকার হয় সেটা খুবই অযৌক্তিক মনে হয় তাঁর কাছে। কিন্তু এসব নিয়ে লোকের সঙ্গে কোনরকম তর্ক বিতর্কে তিনি নামতে প্রস্তুত নন। এগুলো যুক্তির ব্যাপার নয়, বিশ্বাসের ব্যাপার।

সিতারার পাশাপাশি তিনিও মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বাবার কবরের সামনে। বাবার মুখটা মনে করার চেষ্টা করলেন। শেষ বয়সের চেহারা তিনি দেখেননি, মৃত্যুর আগে পঁচিশ বছর কোন যোগাযোগ ছিলনা তাঁদের মধ্যে। কিন্তু ছোটবেলার অনেক কথাই তাঁর মনে আছে। সেই এতটুকু বয়স থেকেই বাবা ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। গ্রামের হাটবাজারে গিয়ে বাতাসা আর বাদাম কিনে দিতেন। হাট থেকে ফেরার সময় মাঝে মাঝে বেলা ডুবে যেত, বৃষ্টি বাদলায় গেঁয়ো পথ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে বার বার হোঁচট খেতেন। বাবা তখন বাকী পথটা ছেলেকে কাঁধে করে বাড়ি ফিরতেন। ঢাকাতেও বাবার সঙ্গে তাঁর প্রীতিকর স্মৃতির অভাব নেই। পল্টন ময়দানে নিয়ে যেতেন ফুটবল খেলা দেখতে। ফেরার পথে মাঝে মাঝে এক হিন্দু বন্ধুর বাসায় যেতেন অফিসের কিছু কাজের কথা বলতে। বন্ধুটি প্লেটে করে রসগোল্লা আর পানতুয়া নিয়ে আসতেন। ওগুলোর স্বাদ জিভে লেগে থাকতো অনেকদিন। যতবার বাবার সঙ্গে খেলা দেখতে যেতেন ততবারই মনের ভেতরে গোপন ইচ্ছে হত বাবা যেন আবার ঐ বন্ধুর বাসায় নিয়ে যান। যেদিন যেতেন না সেদিন মনটা ভীষণ দমে যেত। বাবা মায়ের ছোট সংসার আস্তে আস্তে বড় হল। যেটুকু স্বাচ্ছল্য ছিল এককালে সেটা দারিদ্রের কাছাকাছি পৌছে গেল। তারপর এলো মহাযুদ্ধ, এলো দুর্ভিক্ষ, মহামারী। বাবার সেই হাসিখুশী মুখটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। সরকারি চাকরি তাঁর ছিল ঠিকই, কিন্তু অল্প মাইনে দিয়ে দুর্ভিক্ষের দিনে কালোবাজারে চাল কিনে খাবার মুরোদ তাঁর ছিল না। মাঝে মাঝে একবেলা খাওয়া হত। রেশনের দোকান থেকে পাওয়া যেত পঁচা মার্কিন চাল, আর পাওয়া যেত ঘোড়ার খাদ্য–বজরা আর চিনাই। সেগুলো খেয়েই বেঁচে থাকতে হত। অফিসে যাওয়ার আগে বাবার অভ্যেস ছিল ঘি আর চিনি দিয়ে ভাত খাওয়া। সেটা বন্ধ হল। তারপর একদিন মা ভাতও রাঁধতে পারলেন না। বাবা বাজার থেকে তরিতরকারি নিয়ে এলেন। গোসল করে মাকে বললেন, 'ভাত দাও'। মা'রও সেদিন মেজাজটা ভাল ছিলনা। চোখা গলায় জবাব দিলেন 'চাল কেনার মুরোদ নেই, আবার লাট সাহেবের মত ফরমাশ দেয় ভাত দাও'। ব্যস, লেগে গেল দু'জনের মধ্যে। ছোটরা ভয়ে লুকিয়ে রইলো খাটের নীচে। শুনতে পেল মা চিৎকার করতে করতে

পাকঘরে ঢুকে খিড়কি লাগিয়ে দিয়েছেন। বাবা একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন মায়ের গালে। সে কথা আজও ভোলেননি গফুর সাহেব। সিতারার কি মনে আছে ওসব? ওর বয়সতো তখন মাত্র তিন কি চার। তারপর যুদ্ধ গেল, দুর্ভিক্ষ গেল, কিন্তু সুসময় যেন আর কোনদিন ফিরে এলোনা সংসারে। মাকে সারা জীবন বড় কষ্ট দিয়েছেন এই লোকটি যার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া পড়ছে সিতারা। ও হয়তো ক্ষমা করে দিয়েছে বাবাকে, কিন্তু গফুর সাহেব এখনো পারেননি। আজকের এই প্রবল আবেগের মুহূর্তেও তাঁর মন থেকে পুরনো ক্ষোভের কুয়াশা দূর হয়নি।

ঢাকা থেকে এম এস সি পাশ করার পরপরই ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন আমেরিকায়। বছর চারেক পর ডিগ্রী করার সঙ্গে সঙ্গে ভালো একটি চাকরি পেয়ে যান ওখানে। দেশে এসে মাসখানেক ছিলেন ঢাকায়। বাবা মা আগেই একটি মেয়ে পছন্দ করে রেখেছিলেন, বাবার এক পুরনো বন্ধুর মেয়ে। মেয়েটি নাকি অনেক আগে থেকেই গফুর সাহেবকে মনে মনে ভালবাসতো, তিনি সেটা জানতেন না। বাবা কথা দিয়েছিলেন বন্ধুকে যে ঐ মেয়ের সঙ্গেই ছেলের বিয়ে হবে। কিন্তু গফুর সাহেব কাউকে সাহস করে বলতে পারলেন না যে এ বিয়েতে মত দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বলতে পারলেন না যে আমেরিকাতে একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর ভাব হয়েছে এবং ওকে কথা দিয়ে এসেছেন যে দেশ থেকে ফেরার পরই বিয়ে হবে। ভেবেছিলেন ঢাকায় এসে বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে ওদের আশীর্বাদ নিয়ে যাবেন। কিন্তু অবস্থা যেভাবে মোড় নিল তাতে আর ভরসা পেলেন না কথাটা পাড়তে। আমেরিকায় যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চেয়েছেন সে আমেরিকান খৃষ্টান ঘরের মেয়ে নয়, তারচেয়েও খারাপ। সে ইহুদী মেয়ে, তার আদিম দেশ জার্মানী। গফুর সাহেব জানতেন ইহুদীদের ব্যাপারে বাবার কী ভীষণ রকম কুসংস্কার। কথায় কথায় বলতেন, ইহুদীরা আল্লাহতা'লার অভিশপ্ত জাতি।

আমেরিকায় ফিরে দেশের কাউকে না জানিয়ে গফুর সাহেব বিয়ে করে ফেললেন বারবারাকে। দেশে তিনি চিঠি লিখতেন নিয়মিত, টাকা পাঠাতেন প্রতিমাসে, শুধু বিয়ের কথাটা লিখতে সাহস পেতেন না। কিন্তু বারবারার ইচ্ছে স্বামীর পরিবার তাকে গ্রহণ করে, ঘরের বউ হিসেবে মেনে নেয়। সে-ই বলে কয়ে গফুর সাহেবকে রাজী করালেন দেশে গিয়ে বাবা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আসতে হবে। ওঁরা গ্রহণ করতে না চাইলেও এদিক থেকে চেষ্টার ক্রটি থাকবেনা। অনেক ইতঃস্তত করে একদিন গফুর সাহেব চিঠি লিখে জানালেন সবকিছু। আরো বললেন যে মাস দুয়েক পর বড়দিনের ছুটিতে দেশে যাবেন বারবারাকে নিয়ে ওঁদের দোয়ার জন্যে। কিছুদিন পরই বাবার চিঠি এল। দু'লাইনের চিঠি, ইংরেজীতে লেখা। 'আমার বাড়িতে তোমাদের স্থান নেই। আজ থেকে তুমি আমার পুত্র নও।' তবু বুকে আশা ছিল যে বারবারাকে দেখে হয়ত বাবার রাগ পড়ে যাবে। কিন্তু বাবার মন গলেনি। সত্যি সত্যি তিনি আশ্রয় দেননি তাঁর নিজের বাড়িতে। সিতারার বাসায় গিয়ে থাকতে হয়েছিল দু'টি সপ্তাহ। মা এসে কেঁদে কেটে সাগর ভাসিয়ে গেলেন, ভাইবোনেরা সবাই এল নতুন ভাবীকে দেখতে, কিন্তু বাবা এলেন না একবারও। বারবারাকে ঘরে রেখে গফুর সাহেব একবার গিয়েছিলেন বাবার কাছে। পা ছুঁয়ে সালাম করতে যাচ্ছিলেন, বাবা পা সরিয়ে নিলেন। তারপর 'নামাজের দেরী হয়ে গেল' এই অজুহাত দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ঐ শেষ দেখা বাবার সঙ্গে।

এবার মায়ের কবর। সিতারা আগেই বলে রেখেছিল যে মায়ের কবরটাতে এখন আর মায়ের দেহ নেই, চার বছর পরেই ওরা অন্য কারো মৃতদেহ পুঁতে রেখেছে ওখানে। মায়ের মৃত্যুর সময় এখানে নাকি স্থায়ীভাবে জায়গা কেনার উপায় ছিলনা। অন্য কোন গোরস্থানে হয়ত সম্ভব হত, কিন্তু সেই মুহূর্তে কারো মাথায় কথাটা ঢোকেনি। এতগুলো কবরের মাঝে মায়ের জায়গাটা যে সিতারা কি করে মনে রেখেছে সেটাই আশ্চর্য। একটা লেবু গাছ আছে ওখানে, ওটাই একমাত্র চিহ্ন। মা খুব লেবু পছন্দ করতেন, কাগজিলেবু। রোজার সময় ইফতার করতেন তিনি লেবুর শরবত দিয়ে। বাড়ির ভেতরে এক টুকরো খালি জায়গা ছিল, ওখানে তাঁর দুটো সখের গাছ ছিল। একটা ছিল গন্ধরাজ ফুলের গাছ, আরেকটা লেবু। খুব লেবু হত গাছটাতে। মাছ রান্না করতে মা উদারভাবে লেবুর রস ঢালতেন। বিশেষ করে মাছটা একটু পঁচা পঁচা ভাব হলে লেবুর রস, ধনেশাক আর কাঁচা মরিচ দিয়ে দোপেঁয়াজী বানাতেন। সেই স্বাদ ভাইবোনরা কেউ ভোলেনি। সিতারা বুদ্ধি করে একটা লেবু গাছ লাগিয়েছিল মায়ের কবরের পাশে। ওটাই এখন বড় হয়েছে, ফল হচ্ছে। কয়েক প্রস্থ ধূলো লেগে পাতাগুলি ভীষণ ময়লা হয়ে গেছে, কিন্তু গাছটাতে জীবন আছে এখনো। একটি অভুক্ত পোষা প্রাণীর মত চুপটি করে দাঁড়িয়ে পাহাড়া দিচ্ছে। গাছটি জানেনা যে মায়ের কংকাল নেই কবরটার নিচে। সবকিছু মুছে গিয়ে শুধু একটি করুন চিহ্নই রয়ে গেছে মায়ের--একটি বিবর্ণ লেবুগাছ।

গফুর সাহেব নতজানু হয়ে মাটি স্পর্শ করলেন। আবেগ উথলে এল ভেতর থেকে। স্মৃতির জোয়ার নামলো বাঁধ ভেঙ্গে। ছোটবেলার সেই দুর্ভিক্ষের দৃশ্যগুলো মনে আসতে লাগলো একে একে। হেঁসেলে তো সারাটা জীবনই কেটেছে মায়ের, তবু ঐ সময়টাতে যেন তিনি সারাদিন পড়ে থাকতেন সেখানে। রান্না করার মত বেশী কিছু ছিলনা তবু সারাদিন কেবলি উনুন জালানো থাকত। কখনো বজরা, কখনো মিষ্টি আলু, ভুট্টা, ক্ষুদের পিঠা, চিনাইর ডাল আর দু মুঠো পঁচা মার্কিন চাল। সবাইকে খেতে দিতেন চিনাই-বজরা, শুধু বাবা আর বড় ছেলে গফুরের জন্যে রান্না হত ঐ ভাতটুকু। ভাত না থাকলে বাবা খেতেন না। আর গফুর সাহেবও ঘোড়ার খাদ্য খেতে পছন্দ করতেন না, কেবলি রাগারাগি করতেন। তাই মা যে করেই হোক দু' চামচে ভাত রেঁধে রাখতেন পরিবারের বড় দু'টি পুরুষের জন্যে। ছেলেদের খাওয়া হয়ে গেলে মা আর মেয়েরা পাকঘরের মেঝেতে পিঁড়ি পেতে খেতে বসত। মেয়েদের বাসনে খাবার দেয়ার পর, মায়ের জন্যে খুব একটা থাকত না খাওয়ার মত। মাঝে মাঝে তিনি ভাতের ফেনটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলতেন কাউকে না দেখিয়ে। শেষের দিকে মায়ের পায়ে পানি এসে গিয়েছিল। বাবা খুব একটা গ্রাহ্য করেননি। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার মত সময় বা অবস্থা ছিলনা বাবার, ইচ্ছেও বোধ হয় ছিলনা তেমন। ঘরের বউ ডাক্তারের কাছে গেলে রান্নাবান্না

করবে কে, ছেলেপুলের দেখাশুনা করবে কে?

ভালো ছাত্র হিসেবে গফুর সাহেবের বেশ সুনাম ছিল। কিন্তু কলেজ জীবনে দারুণ একটা উচ্ছৃংখল সময় এসেছিল। পড়াশুনা করতেন না, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াতেন, ফলে পরীক্ষার ফল ভাল হয়নি। বাবাতো বেঁকে বসলেন যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির টাকা দেবেন না। বললেন, 'চাকরিতে ঢোক'। পড়াশুনাই যখন করবে না তখন চাকরী করে কিছু পয়সাকড়ি আনো বাড়িতে। মা বললেন সেটা কিছুতেই হবেনা। তাঁর গায়ে প্রাণ থাকতে ছেলের পড়াশুনা বন্ধ হতে দেবেন না। দু'জনের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হল কিছুদিন। বাবা নরম হলেন না। শেষ পর্যন্ত মা তাঁর বাক্স থেকে এক টুকরো সোনার অলংকার খুলে দিয়ে বললেন, 'বাবা, এটা বিক্রি করে তুমি ভর্তি হয়ে এসো।' ঐ সময় মা যদি অতটা শক্ত হয়ে না দাঁড়াতেন তাহলে গফুর সাহেব হয়ত বাবার মতই একটা কেরানিগিরি চাকরি নিয়ে বাকী জীবন কাটাতে বাধ্য হতেন। অথচ ভাগ্যের এমনই খেলা যে সেই বাবার কবরই আজ ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা, আর মায়ের কবরে আছে শুধু একটি বিষণ্ন লেবুগাছ। গফুর সাহেবের যেন মনে হল তাঁর পায়ের নীচের সমস্ত মাটিটাই মায়ের অস্থি আর মজ্জা দিয়ে তৈরি। মা তাঁকে এখনো ধারণ করেন, লালন করেন। তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না কারণ তাঁরই বুকের উপর দিয়ে তিনি হেঁটে বেড়াচ্ছেন নিত্য, যেমন করে পৃথিবীর সব সন্তানেরা হেঁটে বেড়ায় তাদের মায়েদের কবরের উপর।

কানাডার তৃতীয় বৃহত্তম শহর ভ্যাংকুবার

মীনা আজিজ

কানাডার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সুন্দর সুন্দর পর্বতমালা শোভিত অঞ্চল 'কানাডিয়ান রকি' (Canadian Rockie) নামে পরিচিত। এই কানাডিয়ান রকির সৌন্দর্য্যের খ্যাতি সারা বিশ্বময়। প্রতি বছর তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর পর্যটকের আগমন ঘটে এখানে। এই পর্বতমালা শুধু শক্ত পাথরের সমষ্টিই নয়। এদের গঠনশৈলী, মাথার চুড়ায় বসে থাকা সাদা ধবধবে বরফের মুকুট এবং পায়ের নীচ দিয়ে বরফ গলা পানির তৈরি স্বচ্ছ লেক ও নদী এই পাহাড়ী অঞ্চলকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এর সাথে আরো আছে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে ঘন অরণ্য। পাহাড়, নদী, লেক, গ্রেসিয়ার এবং সুন্দর সুন্দর সবুজ গাছওয়ালা পার্ক নিয়ে এই অঞ্চল আসলেও ভ্রমন পিপাসুদের কাছে একটি পরম আকর্ষণীয় স্থান।

গত দু'বছর যাবত এই কানাডিয়ান রকির সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনে আসছিলাম, এবারের গ্রীষ্মের প্রথম দিকেই তাই একমাসের প্যাকেজ ট্যুর বুক করে আবারও ঘরছাড়া হলাম। আমাদের প্যাকেজ ট্যুর শুরু হবে ভ্যাংকুবার থেকে। আমরা ভ্যাংকুবার ভালো মতো ঘুরে দেখবো বলে নির্দ্ধারিত ট্যুর প্যাকেজ শুরু হওয়ার চারদিন আগেই ভ্যাংকুবারে গেলাম। ভ্যাংকুবারও সুন্দর জায়গা। আমরা টরন্টো থেকেই হোটেল বুক করে এসেছিলাম। আমাদের উড়োজাহাজটি একটু বিলম্ব করেছিলো উড়তে। আমরা তাই বিমান বন্দর থেকে যখন হোটেলে এসে পৌছলাম, তখন রাত দুটো বাজে। দু'চোখ ভরা ঘুম নিয়ে কাউন্টারে দু'জন চটপটে তরুন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। আমরা নির্দ্ধারিত কামরার চাবি নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলাম।

যদিও অনেক রাতে ঘুমিয়েছি কিন্তু স্বভাব সিদ্ধ নিয়মে ভোর বেলাতেই উঠে গেলাম। তৈরি হয়ে নিচে নেমে এলাম। আমাদের হোটেলের নাম 'ভ্যাংকুবার ফেয়ারমন্ট হোটেল' (Vancouver Fairmont Hotel)। হোটেলটি বেশ নামী দামী এবং বনেদী হোটেল। কামরাগুলো এবং বাথরুম বেশ বড়। শুনতে পেলাম ইংল্যান্ডের রানী প্রথমবার ভ্যাংকুবার এসে এই হোটেলে অবস্থান করেছিলেন। রানী এলিজাবেথের অবস্থানের স্মৃতিবহ এই হোটেলটি ডাউন টাউনে অবস্থিত। আশে পাশের অনেক স্থান পায়ে হেঁটেই দেখতে যাওয়া যায়। আমরা অবশ্য আগেই গাইডেড ট্যুর বুক করেছি। সকাল আটটায় আমাদের ট্যুর বাস এসে আমাদের তুলে নিলো শহর ঘুরিয়ে দেখাতে।

ভ্যাংকুবার এলাকা প্রথম আবিষ্কার করেন Jose Maria Marscler নামের একজন স্প্যানিশ পর্যবেক্ষক ১৭৯১ সালে। ভ্যাংকুবার শহরের অবস্থান ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার

দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝে। যখন সমস্ত কানাডাকে একটি সংগঠনের বা Confederation এর অন্তর্গত করার প্রচেষ্টা চালানো হয় তখন ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাদের সামনে তখন দুটি প্রস্তাব ছিলো। একটি হচ্ছে দক্ষিণাংশের সমৃদ্ধ দেশ আমেরিকার সাথে যুক্ত হওয়া আর অপরটি হচ্ছে পূর্বাংশের নতুন ডোমিনিয়ন কানাডার সাথে যুক্ত হওয়া। অবশেষে অটোয়া সরকার দেশের পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত এক Railway তৈরি করে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ সাধনের প্রতিশ্রুতি দিলে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া কানাডার সাথে যুক্ত হয়।

১৮৮৫ সালে রেললাইন বসানোর কাজ শেষ হলে কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে কোম্পানী অর্থাৎ CPR একটি প্রান্তিক রেলস্টেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলো। তারা এ কাজের জন্য ভ্যাংকুবার এলাকাকে পছন্দ করলো। ভ্যাংকুবারের আগে নাম ছিলো (Granville) 'গ্র্যানভিল'। এই এলাকায় আগে থেকেই কিছু শরনার্থী বাস করছিলো। CPR কর্তৃপক্ষ Granville-এর আশে পাশের জায়গা দখল করে রেল স্টেশন তৈরির কাজ শুরু করলো। ১৯৯৬ সালে রেল স্টেশনের কাজ শুরু হয়ে এক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। ১৮৮৭ সালের ২৩শে মে তারিখে মন্ট্রিল থেকে প্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ী এখানে এসে থামে। CPR কোম্পানীর রেলস্টেশন তৈরিকে কেন্দ্র করে আশে পাশের জায়গাগুলোকে এক সাথে করে নতুন একটি শহরের পত্তন করা হয় এবং ক্যাপ্টেন দুর্দু ভ্যাংকুবার এর নামানুসারে এই শহরের নাম রাখা হয় ভ্যাংকুবার। এক বছর পরে চায়না থেকে প্রথম একটি জাহাজ এসে ভ্যাংকুবার বন্দরে নোঙর করে। নদীপথ ও রেলপথের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর সাথে ভ্যাংকুবারের যোগাযোগ স্থাপিত হলে ভ্যাংকুবার একটি আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত হয়। ১৯১৪ সালে পানামা খালের সংস্কার শেষ হলে ইউরোপের বাজারে এবং উত্তর আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে কানাডার বাণিজ্য বাজার ছড়িয়ে পড়ে। CPR রেললাইন তৈরিতে যে সমস্ত চায়নীজ শ্রমিক অংশ নিয়েছিলো, কাজ শেষ হয়ে গেলে তাদের একটি বড় অংশ ভ্যাংকুবারে বসতি স্থাপন করে এবং চায়না টাউন গড়ে তোলে। ২০০৪ সালের মধ্যে ভ্যাংকুবার দুই মিলিয়ন লোক সংখ্যা নিয়ে কানাডার তৃতীয় বৃহত্তম শহরে পরিণত হলো। বর্তমানে ভ্যাংকুবার একটি অন্যতম প্রধান শহর রূপে পরিচিত। নৌপথ–আকাশপথ-রেলপথের যাতায়াত সুবিধা এবং এখানকার সহনশীল আবহাওয়া ও চমৎকার প্রাকৃতিক নিসর্গ সারা পৃথিবীর পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। ভ্যাংকুবার বন্দর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রবেশ পথ। প্রতি বছর প্রায় তিন হাজার জাহাজ এই বন্দরে নোঙর করে। বিশাল বিশাল কার্গোগুলো (Cargo) এই বন্দর দিয়ে চিনি-গম-তৈল-কাঠ-গন্ধক ইত্যাদি আনা নেওয়া করে। এটি কানাডার বৃহত্তম প্রশান্ত অঞ্চলীয় টার্মিনাল। ১৯৮৬ সালে এখানে সংঘটিত Expo সম্মেলন বিশ্বের সামনে ভ্যাংকুবারের উন্নতির দ্বার উন্মোচন করে দেয়। এরপর ১৯৯৭ সালে হংকং থেকে বিত্তবান চায়নিজ ব্যবসায়ীরা ভ্যাংকুবার-এ এসে আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন ব্যবসার প্রসার ঘটায়।

শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নয়, ভ্যাংকুবার শিল্পকলা, ফ্যাশন, খেলাধূলা ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও একটি জাতীয় আশ্রয় ও কর্মস্থল। কানাডার অন্যতম একটি সিনেমা তৈরির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে ভ্যাংকুবার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসহ আধুনিক জীবনের চাকচিক্যময় জৌলুস ও ফ্যাশনের বর্ণাঢ্য আয়োজন ভ্যাংকুবার শহরকে পর্যটকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

আমাদের বিলাস বহুল ভ্রমণ কোচটি প্রথমে এসে থামলো Howe Sireet-এর প্রান্তে নদীর তীরে অবস্থিত 'কানাডা প্লেস' নামক জায়গায়। কানাডা প্লেস দূর থেকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর চমৎকার গঠন শৈলীর জন্য। দূর থেকে মনে হয় যেনো অনেকগুলো পাল উড়িয়ে একটি বড় সমুদ্রগামী জাহাজ Ocean liner দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা সিডনীর বিখ্যাত অপেরা হাউজের মতো দেখতে এই প্যাভিলিয়নটি ১৯৮৬ সালে Expo সম্মেলনের জন্য তৈরি করা হয়। সাদা ধবধবে রঙের এই বিশাল প্যাভিলিয়নটি হারবার ফ্রন্টের শোভা বৃদ্ধি করেছে। বিশাল জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই কমপ্লেক্সের মধ্যে আছে–ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, ভ্যাংকুবার কনভেনশন হল, একটি Cruise ship টার্মিনাল, একটি প্রদর্শনী কেন্দ্র, বিখ্যাত প্যান প্যাসিফিক হোটেল, C.N.Imax থিয়েটার এবং নানান খাবারের দোকানসহ চমৎকার একটি ফুডকোর্ট। প্যান প্যাসিফিক হোটেলটি ভ্যাংকুবারের অন্যতম প্রধান সম্মেলন কেন্দ্র ও বাণিজ্য ঘাঁটি। C.N. Imax সিনেমা হলের তিন হাজার পাঁচশত স্কোয়ার ফুটের বিশাল পর্দাটি (Screen) three Dimensional ছবি দেখার জন্য দর্শককে আকৃষ্ট করে।

এরপরে বাস থামলো এসে ভ্যাংকুবারের ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রাক্তন বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত গ্যাসটাউন-এ। গ্যাস টাউনের আগের নাম ছিলো গ্যাসিস টাউন (Gassy's town)। Jack Deighton নামের একজন ইংরেজ নাবিক প্রথমে এই এলাকায় সমূদ্রের ধারে একটি খোলা পানশালা প্রতিষ্ঠা করে ১৮৪৭ সালে। এই পানশালাকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে এখানে বসতি গড়ে উঠে এবং 'জ্যাক' এর নামানুসারে এলাকায় নামকরণ 'গ্যাসি'স টাউন' হয় পরবর্তী কালে যা গ্যাসটাউন নামে পরিচিতি লাভ করে। এখানকার ম্যাপল স্ট্রিট স্কোয়ারে গ্যাসি জ্যাকের একটি দাঁড়ানো মূর্ত্তি আছে।

তবে শহরের বিস্তৃতি ঘটতে থাকলে গ্যাসটাউন আস্তে আস্তে পুরাতন হয়ে জীর্ন চেহারায় পরিণত হয়। ১৯৭০ সালে এই জায়গাকে আবার নতুন করে সংস্কার করা হয়। পুরাতন ভিক্টোরিয়ান ডিজাইনের বাড়ীগুলোকে রেস্তোঁরায়, পানশালা ও গ্যালারীতে রূপান্তরিত করা হয়। ওয়াটার স্ট্রিট ও ক্যাম্বি স্ট্রিটের কিনারায় গ্যাসটাউনের আর একটি প্রাচীন নির্দশন গ্যাসটাউন ষ্টিম ক্লক (Steam Clock)টি আরো সযত্নে রক্ষিত। Steamline-এর Vent এর উপরে ঘড়িটি স্থাপিত। এই Steamline আগে গ্যাস টাউনের দোকান পাট গরম রাখার কাজ করতো। এই বাষ্পীয় ঘড়িটি এখনও সচল। প্রতি ১৫ মিনিট পরপর ঘড়িটি বাষ্প বের করে এবং এক ঘণ্টা পরপর আওয়াজ ছাড়ে।

পুরাতন চেহারার এই ঘড়িটির বাষ্প নির্গমন দেখার জন্য ট্যুরিষ্টরা সবাই কোচ থেকে নেমে চারপাশে ভীড় করে দাঁড়ালো।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মনে হয় একটি করে 'চায়না টাউন' আছে। কারণ, যেখানেই বেড়াতে যাই ট্যুর প্রোগ্রামের মধ্যে সব জায়গাতেই চায়না টাউনের উল্লেখ থাকে। আর এই চায়না টাউনগুলোর চেহারা প্রায় একই ধরনের হয়। তাই 'চায়না টাউনে' এসে যখন আমাদের কোচ থামলো তখন গাড়ী থেকে নামার খুব একটা ইচ্ছা ছিলো না। কিন্তু গাইড জানালো ভ্যাংকুবারের এই চায়না টাউন নাকি উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম চায়না টাউন। Trans Continental Railway-র কাজ শেষ হয়ে গেলেও সেখানে কর্মরত চায়নিজ শ্রমিকেরা গ্যাসটাউনের পূর্বদিকের এই এলাকায় বসতি স্থাপন করে। প্রতিটি চায়না টাউনের সাথে একটি করে সুন্দর China Garden সংযুক্ত থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। Kitsilano এলাকার ভিতর দিয়ে ঘুরে সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত নিয়ে যেতে যেতে আমাদের ড্রাইভার ও গাইড জানালো ১৯৬০/৭০ দশকের দিকে এই এলাকাটি মূলতঃ হিপ্পীদের দখলে ছিলো। রাস্তা-ঘাটে-সমুদ্র তীরে হিপ্পীদের অলস আড্ডাবাজি করতে দেখা যেতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এলাকার চেহারারও পরিবর্তন ঘটে। আড্ডাবাজ হিপ্পীরা ক্রমে ক্রমে কাজ কর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ফলে এলাকাটি একটি ভালো আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়। তবে Kitsilano সমুদ্র সৈকতটি গ্রীষ্মের সময়ে লোকের ভীড়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জমজমাট থাকে।

তবে ভ্যাংকুবারের একটি ভালো আবাসিক এবং বিনোদনমূলক এলাকা হিসেবে False creek-এর সুনাম আছে। ১৯৭০ এবং ১৯৮০ সালে এই এলাকাটি গড়ে উঠে creek-এর পানি প্রবাহকে ঘিরে। আগে এলাকাটি শুধু নৌবিহার-এর কাজে ব্যবহৃত হতো। এখন সুন্দর সুন্দর দালান কোঠা গড়ে উঠেছে। দুটি সুন্দর পোতাশ্রয় আছে এখানে। পোতাশ্রয়ে ছোট ছোট অসংখ্য বোট (Boat) ভিড়ে থাকে সব সময়ে পানির বুকে ভেসে বেড়ানোর জন্য। বর্তমানে এলাকাটি শহরের অভিজাত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।

Greenville দ্বীপে এসে আমাদের দু'ঘণ্টার যাত্রা বিরতি হলো। দুপুরের খাওয়া এবং দ্বীপটি ঘুরে দেখার সুযোগ দিতে এই ব্যবস্থা। গ্রীনভিল এলাকাটি সত্যিই সুন্দর। প্রতিটি বাড়ীর ডিজাইন সুন্দর। বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান। আমরা ফুডকোর্টের ভিতরে প্রবেশ করে অবাক হয়ে গেলাম। মাঝখানের খোলা চত্তরকে ঘিরে চারপাশে বিভিন্ন দেশীয় অসংখ্য খাবারের দোকান সাজানো। মাঝখানের চত্তরে চেয়ার টেবিল সাজানো। আমরা পছন্দমতো খাবার নিয়ে এসে একটি টেবিল দখল করে বসলাম। এতো লোকের ভীড় অথচ এতোটুকু আওয়াজ নেই। সবাই আপন মনে খাওয়ায় মগ্ন।

খেয়ে দেয়ে ঘুরতে গেলাম আশেপাশে। প্রথমেই গেলাম কানাডার বিখ্যাত শিল্পী ইমিলিকার-এর স্থাপিত 'কলেজ অব আর্ট' দেখতে। ১৮৭১ সালে ইমিলিকার ভিক্টোরিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কানাডার স্থানীয় শিল্প প্রসার ও প্রচারে তাঁর অবদান অসীম। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। ইমিলিকার মোটামুটিভাবে অভিজাত পরিবারে বড় হয়ে উঠেন। কিন্তু তিনি কানাডার আদি অধিবাসী ফার্স্ট নেশনদের (First Nation) জীবন ধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের জীবন ধারার সাথে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরূপ সমন্বয় ঘটিয়ে চমৎকার ছবি এঁকেছেন।

নদীর তীরেও সুন্দরভাবে সাজানো। সুন্দর সুন্দর বিলাস বহুল Boat নোঙর করে আছে ধনাঢ্য ও সৌখিন ব্যক্তিদের গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে। খুব ভালো লাগলো জায়গাটিকে। আজকের ভ্রমণ এখানেই শেষ। আগামীকাল যাবো আবার ঘুরতে।

আজকের ভ্রমণে প্রথমেই আমরা বিখ্যাত 'স্ট্যানলি পার্কে' গেলাম। চারশত পাঁচ হেক্টর জমির উপরে বিশাল এক পাইন গাছের বনসহ এই পার্কে তিনটি সমুদ্রতট, গোলাপ বাগান, রডোড্রেনডন ফুলের বাগান, বড় একটি অ্যাকুয়ারিয়াম (Aquarium), রোয়িং ক্লাব (Rowing), ইয়াট ক্লাব (yateh) আছে। ১৮৮৮ সালে ভ্যাংকুবারবাসী নাগরিকদের চিত্তবিনোদনের জন্য পার্কটি স্থাপিত হয় বিশাল এলাকা নিয়ে। কানাডার তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল Lord Stanley-এর নামানুসারে পার্কের নাম রাখা হয়। পুরো পার্ক এলাকা একদিনে ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। তাই কয়েকটি বিভিন্ন অংশে ঘুরে দেখলাম। বনের ধারে অপেক্ষাকৃত ঢালু জমিতে অনেকগুলো কারুকার্যময় থাম্বি আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কোন কোন থাম্বি অনেক উঁচু। প্রতিটি থাম্বির গায়ে অপূর্ব কারুকার্য করা নানান দেব-দেবীদের চেহারা খোদিত। থাম্বির মাথার উপরে একজন করে দেবতা বসে আছে। শুনতে পেলাম এগুলো আদি অধিবাসী ফার্স্ট নেশনদের (First Nation) হাতে তৈরি। আদি অধিবাসীরা তাদের পছন্দ মতো দেব-দেবীর নামে থাম্বিগুলো উৎসর্গ করেছে। কারুকার্যময় এই শিল্প নৈপুণ্যে ভরা থাম্বিগুলোকে 'টোটেম পোল' (Totem Poles) বলা হয়। থাম্বির কারুকার্যের মধ্য দিয়ে আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছে। টোটেমপোলগুলোর সমাদর দেশের সর্বত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পর্যটকগণ আগ্রহ করে এগুলো দেখতে আসে।

এরপর ঘন রেইন ফরেস্টের (Rain Forest) বুক চিরে তৈরি মসৃণ রাস্তা পেয়ে আর একটি সুন্দর স্থান Prospect Point-এ এলাম। এটি একটি চমৎকার look out. উঁচু পাহাড়ী এলাকায় দাঁড়িয়ে পুরো ভ্যাংকুবার শহরকে দেখা যায়। Prospect point-এর উঁচু জায়গা থেকে নেমে পায়ে হেঁটে Lions gate bridge দেখতে গেলাম। ৭০ বছর বয়সী এই ব্রিজটি ১৯৩৭ সালে Guinness Brewing Company দ্বারা তৈরি হয় উত্তরাংশের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। ব্রিজের অপর তীরে পাশাপাশি দুটো পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। ঐ পাহাড় দুটির চূড়া দূর থেকে সিংহের কানের মতো দেখায় বলে ব্রিজের নাম Lions gate bridge হয়েছে। ব্রিজটি ব্যক্তি

মালিকানাধীন। ১৯৮৬ সালে Guinness পরিবার ১২৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে ব্রিজটির সংস্কার সাধন করে এবং ডেকটি আলোকিত করে দেয়।

স্ট্যানলি পার্ক ও চায়না টাউনের মাঝখানে একটি ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা আছে, যার নাম West End. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় চল্লিশ হাজার লোক এখানে বাস করে। ঘণ বসতি হলেও এলাকাটির চেহারায় একটি বনেদিয়ানা আছে। অনেক পুরাতন ভবনের সাথে আধুনিক নতুন ভবনের সমন্বয়ে এলাকাটি ভিন্ন চেহারা পেয়েছে। ভ্যাংকুবারের First beach নামে পরিচিত English beach টি এখানে অবস্থিত।

ভ্যাংকুবারের ডাউন টাউনের চেহারা বেশ ঝলমলে। অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ভবন এখানে অবস্থিত। এদের মধ্যে নয়তলা বিশিষ্ট গোলাকার পাবলিক লাইব্রেরী দেখতে একদম কলোসিয়ামের মতো (Colosseum)। গঠন শৈলীর অপূর্বতায় এটি দূর থেকেই সবার নজর আকর্ষণ করে। ভবনটির বাইরের অংশে একটি 'ত্র্যাম্পি থিয়েটার' আছে। ভ্যাংকুবার আর্ট গ্যালারী ভবনটিও সুন্দর। এটি আগে প্রাদেশিক কোর্ট হাউজ ছিলো। ব্যস্ততম রবসন ষ্ট্রিটের দু'ধারে সুন্দর সুন্দর দোকানপাট ও রেস্টুরেন্ট অবস্থিত। এই রাস্তাটি সব সময় লোকের ভীড়ে জম-জমাট থাকে। আমরা হোটেল থেকে হেঁটে চলে যেতাম।

ড্যাংকুবার বেড়ানো অপূর্ণ থেকে যায় যদি এর অদূরে অবস্থিত Capilano Suspension bridge না দেখে কেউ ফিরে আসে। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম পায়ে হাঁটা ঝুলন্ত ব্রিজ। Capilano নদীর ৭০ মিটার উপরে অবস্থিত এই ব্রিজটি George maCkay নামক এক ব্যক্তি ১৮৮৮ সালে শুধুমাত্র মোটা দড়ির বাঁধন দিয়ে ব্রিজটি তৈরি করেন। এখানে অবস্থিত ২৪০০ হেক্টর জমি জুড়ে অবস্থিত তাঁর সেডার গাছের তদারকি করার জন্যই তিনি ব্রিজটি তৈরি করেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ব্রিজটি এই এলাকায় রোমাঞ্চকর ভ্রমণ পিয়াসীদের এক আকর্ষণে পরিণত নয়। অনেক নিচে খরস্রোতা বহতা নদী– দু'পাশে পাহাড় ঘেরা গহীন বনের মাঝখানের এই ঝুলন্ত ব্রিজে দাঁড়িয়ে মনে হয় যেনো উর্দ্ধগগণ আর নিম্নে ধরনী তলের বুকের মাঝে ঘন গাছপালায় সন্নিবিষ্ট শ্যামল অরণ্যে দোল খাচ্ছি।

ক্যাপিলানো রোডের উত্তরাংশে অবস্থিত Grouse mountain শহরের অন্যতম একটি Ski এলাকা। তবে পর্যটকদের কাছে এর প্রধান আকর্ষন হচ্ছে সুইসদের তৈরি Sky ride আকাশ যানটি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই চমৎকার Tram গাড়ীটি সমুদ্র হতে ১১০০ কিলোমিটার উঁচু আকাশ পথে পাহাড় চূড়া হতে অপর পারের সুন্দর শ্যালে (Chalet) পর্যন্ত নিয়ে যায়। ছোট্ট হলেও ভ্রমনটি উপভোগ্য।

ভ্যাংকুবারের আকর্ষণ তাই শুধু একটি সুন্দর আধুনিক নগরী হিসেবেই নয়। পাহাড়-বন-সমুদ্র মিলিয়ে এর আবেদন ভিন্নতর। ছায়া-ঢাকা শ্যামলিমা আর সুন্দর সমুদ্রতট নিয়ে ভ্যাংকুবার সত্যি একটি ভালোলাগার শহর।

যাই

মুহম্মদ জুবায়ের

আমার অনেক ঋণ থেকে গেলো তোমার কাছে!

ভেজানো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট স্বরে প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলেন এবারক হোসেন। তাঁর গলা ধরে এসেছে। জোহরা বেগম সহজে ভেঙে পড়ার মানুষ নন, কিন্তু এই কথাগুলো তো শুধু কথা নয়, তার পেছনে কিছু একটা যেন লুকানো। ভাবতে চান না এমন কথা মনে আসে – তাহলে এই সেই সময়! এসে গেলো!

চোখ ভিজে উঠলে মুখ নিচু করেন জোহরা বেগম। এবারক হোসেনের দুই হাতের মুঠোয় ধরা তাঁর ডান হাত। হাতগুলো কি একটু কেঁপে ওঠে? ঠিক বোঝা যায় না। বুকের ভেতরে শেকড় উপড়ে ফেলার মতো তোলপাড়, মাথা পাগল-পাগল। এই সময়ে হাতের সামান্য কেঁপে ওঠা হয়তো টের পাওয়া সম্ভবও হয় না। পেলেও মানতে ইচ্ছে করে না। এ সত্যি নয়, সত্যি নয়!

দরজার বাইরে বারান্দায় রবি অপেক্ষা করছে। গেটের সামনে রিকশা দাঁড়িয়ে, ওই রিকশাতেই সে এসেছে। জোহরা বেগম ভাবলেন, আর দেরি করিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। বললেন, তোমরা যাও। আমি আরেকটা রিকশা পেলেই চলে আসছি।

এবারক হোসেন শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ওঠেন। ঘরের ম্লান আলোয় দেখা যায়, তাঁর ফর্সা মুখ লালচে হয়ে উঠেছে। গায়ে জড়ানো চাদরে চোখ মুছে এবারক হোসেন ডান হাত রাখেন জোহরা বেগমের মাথায়। সে মাথায় এখন কালোর চেয়ে সাদা চুলই বেশি, পাতলাও হয়ে এসেছে। পঞ্চাশ বছর আগের একটি ছবি এক ঝলক দেখতে পেলেন এবারক হোসেন। মাথাভরা কোঁকড়া কালো চুলের মেয়েটি। টলটলে মুখের ওপরে বসানো উজ্জ্বল একজোড়া চোখ। বিয়ের কয়েকদিন পরে এবারক হোসেন কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন, জোহরা বেগম আপাতত কিছুদিন নিজের বাবা-মা'র কাছে থাকবেন। বিদায় দেওয়া-নেওয়ার ছোট্টো এক টুকরো ছবি। সেই ছবিটি এখন এবারক হোসেন স্পষ্ট দেখলেন। কী মায়া মাখানো সেই মুখ, সেই দেখা! *'চেয়ে দেখি আর মনে হয় / এ যেন আর-কোনো একটা দিনের আবছায়া, ... দূরকালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে। / স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ, / মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।'*

মুখ বাড়িয়ে জোহরা বেগমের কপালে ছোটো করে ঠোঁট ছুঁইয়ে পেছন ফিরেছেন এবারক হোসেন। টের পেলেন, তাঁর একটি হাত শক্ত করে ধরে আছেন জোহরা বেগম। *'লতায়ে থাকুক বুকে চির-আলিঙ্গন, / ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।'*

কী হলো! এবার যাই!

জোহরা বেগম জানেন না কখন তাঁর দুই হাত এবারক হোসেনের হাত আঁকড়ে ধরেছে। কী যেন একটা মনে পড়ি-পড়ি করে। মনের ভেতরটা কী-যেন-কী কয়ে ওঠে। উপায় নেই, হাত আলগা করে দিতে হয়।

দরজা খুলে বাইরে। এক ঝলক ঠাণ্ডা এসে মুখে লাগে। পৌষ শেষ হয়ে মাঘের শুরু। এবারে শীতও যেন একটু বেশি। জোহরা বেগম জানেন, তবু জানেন না, বুকের ভেতর এমন খালি-খালি লাগে কেন!

ধীর পায়ে দুটো সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসেন এবারক হোসেন। গেটের কাছে এক মুহূর্ত থামেন। রাস্তায় আলো বেশি নেই। বাইরের বারান্দায় আলো জ্বালানোর কথা মনেও পড়েনি। বসার ঘরের জানালা ঘেঁষে দাঁড়ানো পুরনো শিউলি গাছে সাদা ফুলগুলো দেখা যায় আধো অন্ধকারে। ভোরের আলো ফোটার আগে পাড়ার কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে শিউলি কুড়িয়ে নিয়ে যায় রোজ। মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। প্রথম প্রথম সকালে দরজা খোলার শব্দে ফুলচোরগুলো দৌড়ে পালিয়ে যেতো, প্রশ্রয় পেয়ে আজকাল আর পালায় না। অনেক বছর ধরে এবারক হোসেন দেখে আসছেন, ভোরের ফুলচোরদের মুখ বদলে গেছে কিছুদিন পর পর, ফুল কুড়ানোর বয়স ছাড়িয়ে গেলে নতুন মুখ এসে তাদের জায়গা নিয়েছে। কাল ভোরে কি ওদের দেখা পাওয়া আর হবে?

এবারক হোসেনের হাত ধরে রিকশায় তুলে বসিয়ে দেয় রবি। নিজে উঠে বসার আগে জোহরা বেগমকে বলে, আমি আরেকটা রিকশা পেলে পাঠিয়ে দিচ্ছি, দিদা। না হলে এই রিকশাই আপনাকে নিতে আসবে।

রিকশায় বসা এবারক হোসেনের মুখ ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলেন না বলে নেমে রাস্তার কাছে চলে এলেন জোহরা বেগম। এবারক হোসেন শক্ত মুখে সোজা সামনে তাকিয়ে আছেন। ব্যথাটা কি আছে এখনো? বাড়লো কি আবার? এমন মানুষ, মুখে ফুটে বলবেন না, বুঝতেও দেবেন না! চোখের কোলে কি পানি দেখা যায়! কিছু একটা বলতে গিয়েও পারলেন না জোহরা বেগম, রিকশা চলতে শুরু করেছে। এবারক হোসেন মুখ তুলে দোতলা বাড়িটি একবার দেখলেন – *'ভাঙল দুয়ার, কাটলো দড়াদড়ি...'*।

এমনিতে শীতবোধ খুব বেশি তাঁর, অথচ আজ এই মাঘের প্রবল শীতের রাতে রিকশায় বসে কিছুই টের পাচ্ছিলেন না। ফুলহাতা ফ্লানেলের শার্টের ওপর সোয়েটার, তার ওপরে উলের চাদর জড়ানো। একটু মনে হয় গরমই লাগছে। লাগুক, কিছু এসে যায় না। রবি পাশে বসে এক হাতে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। মনে মনে হাসলেন তিনি, ধরে কি আর রাখতে পারবি রে রবি? চলেই তো যাবো।

পেছনে তাকিয়ে নিজের বসত বাড়িটিকে আরেকবার দেখলেন। তাঁর চোখে পড়ে না, জোহরা বেগম তখনো গেটের কাছে দাঁড়ানো, ঝাপসা দুই চোখ তাঁরই দিকে।

বাড়ির দিকে চোখ ফিরিয়ে এবারক হোসেনের মনে হলো, এই বাড়িটিকে কি তাঁর জাগতিক অর্জনের প্রতীক মনে করা যেতে পারে? হয়তো পারে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার সঙ্গে সঙ্গে একই রকম যত্নে-ভালোবাসায় অনেক বছর ধরে গড়ে তোলা। দেড় হাজার টাকা দিয়ে সাড়ে চার শতক জায়গা যখন কিনেছিলেন বাড়ি করার জন্যে, এদিকে বসতি তেমন ছিলোই না। শহরের শেষ মাথায় বাঁশঝাড় ঘেরা জায়গাটিতে বাড়ি তুলে শখ করে নাম দিয়েছিলেন – বনান্ত। হিসেব করে দেখলে পঁয়ত্রিশ বছরের বাস এই বাড়িতে। এতোটা সময় চলে গেছে, বোঝা তো যায়নি!

শীতের রাতের জনহীন অন্ধকার রাস্তায় রিকশা এগিয়ে যায়। সরু পীচঢালা রাস্তা, দুটো রিকশা কোনোমতে মুখোমুখি পাশ কাটাতে পারে। এবারক হোসেন যখন এখানে বাড়ি তুলতে শুরু করেন, সেই সময় ছিলো কাঁচা মাটির রাস্তা। একদিন ইট বসলো, পীচ ঢালা হলো তারও অনেক পরে। দু'পাশে খানিক দূরে দূরে ল্যাম্পপোস্ট। নামেই ল্যাম্পপোস্ট, আলো জ্বলে না বেশিরভাগ সময়। সেই বাঁশঝাড়ের অনেকটাই এখন নেই। মানুষের নতুন নতুন বসতির বিস্তার ঠেকায়, এমন সাধ্য কার!

বাড়ি তৈরি শুরু হওয়ার সময় কাছের প্রতিবেশী বলতে ছিলো রাস্তার উল্টোদিকে আলতাফ কন্ট্রাকটর আর তার পরের বাড়ির তোতারা। তোতার ছোটো বোন আঙুরকে বিয়ে করেছে এক পুরনো ছাত্র, মোহাম্মদ আলী। পরে ওদেরও বাড়ি উঠেছে তাঁর বাড়ির ঠিক পুবদিকের সীমানা ঘেঁষে।

রাস্তায় মানুষজন নেই, দু'পাশের বাড়িগুলো অন্ধকারে ডুবে আছে। এতোদিনের প্রতিবেশীরা কেউ জানে না, মনে মনে এবারক হোসেন বিদায় নিতে নিতে একেকটি বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছেন।

মোহাম্মদ আলী ছেলেটি বেশ খোঁজখবর করে, বাজারে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করে যায় কিছু লাগবে কি না। আর আছে তাঁদের দু'ঘর ভাড়াটে। ওপরতলায় অসীমকুমার কুণ্ডু। বউ রীতা আর তিনটি মেয়ে নিয়ে সংসার সরকারি চাকুরে অসীমের। অসীম-রীতারা আছে আজ প্রায় ন'বছর। নিচেরতলার চারটি ঘরের দুটো কোনো কাজেই লাগে না বলে ভাড়া দেওয়া হয়েছে বছরখানেক আগে। দু'বছরের একটি ছেলে নিয়ে মজিবর আর ইতির ছোট্টো সংসার সেখানে। কুড়িয়ে পাওয়া দাদু-দিদার দেখা না পেলে ওপরের আর নিচেরতলার বাচ্চাগুলোর একটা বেলাও চলে না।

নিজেদের ছেলেমেয়েরা একে একে বাড়িছাড়া হয়েছে। ছোটো এই শহরের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠে এক এক করে নিজেদের জীবন-জীবিকায় চলে গেছে আরো বড়ো বড়ো সব শহরে। এক হিসেবে ধরতে গেলে তারা সব ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীময়। মেজো ছেলেটি একবার বলেছিলো, খেলতে হলে বড়ো মাঠেই খেলা উচিত। ঠিকই তো। এবারক হোসেন নিজেও একসময় দোগাছি গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে এই শহরে চলে এসেছিলেন। মানুষ সবসময়ই এইভাবে নিজের পরিবেশ-প্রতিবেশ অতিক্রম করে যায়।

অসীম-মজিবরদের বাদ দিলে এখন বাড়িতে বাসিন্দা তাঁরা দু'জন। অবশ্য তাঁদের ভাড়াটেরা শুধু ভাড়াটে হয়ে কোনোদিন থাকেনি, এক রকমের আত্মীয়ই হয়ে উঠেছে বরাবর।

সন্ধ্যায় জোহরা বেগম একবার ওপরে গিয়ে অসীমকে খবর দিতে চেয়েছিলেন। মনে পড়েছিলো, অসীম আজ বাড়িতে নেই। চাকরির কারণে মাঝে মাঝে তাকে শহরের বাইরে দুয়েক রাত থাকতে হয়। ফিরবে আগামীকাল। এই সময় আর কাকে বলবেন! মজিবরকে বলতে যাবেন, এবারক হোসেন নিষেধ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে নীরবে চলে যাওয়া, ওদের মুখের দিকে তাকালে যেতে বড়ো কষ্ট হবে যে! *'ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি...'*।

বুকের ব্যথা এবারক হোসেন অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখার চেষ্টা করছিলেন। বিশেষ করে জোহরা বেগমকে ব্যথার তীব্রতা সবটা খুলে বলতে চাননি। যা জানার তা জানবেই। একটু আগে বা পরে, এই যা। শুধু শুধু এখনই উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে কী লাভ! এখন তাঁর কষ্টটা যন্ত্রণার পর্যায়ে চলে গেছে, সহ্যের সীমার মধ্যেও আর নেই। বুকের ভেতরটা প্রবলভাবে চেপে চেপে আসছে, সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে। বললেন, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, রবি।

রবি নিজে ডাক্তার। এবারক হোসেনকে জড়িয়ে ধরে বসে সবই টের পাচ্ছিলো সে। কিন্তু ডাক্তারি বা সাধারণ বিবেচনায় সে জানে, হাসপাতালে পৌঁছার আগে কিছু করার নেই। রাতে দশটার দিকে খবর পেয়েছিলো রবি। বাসায় ফিরে মাত্র খেতে বসেছে, এই সময় মজিবর এলো। তখনই জানে, নিতান্ত নিরুপায় না হলে শীতের রাতে অতো দেরিতে কেউ আসে না। হাত ধুয়ে সে মজিবরের সঙ্গে রিকশায় উঠে পড়েছিলো।

রবি বলে, এই তো দাদু, আর একটু সময়, হাসপাতালে পৌঁছে গেলেই একটা ব্যবস্থা হবে।

ব্যবস্থা করা যদি না যায়, রবি?

এ কথার কোনো উত্তর হয় না। তবু রোগীর মনের জোর টিকিয়ে রাখা দরকার, ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ সরকার জানে। বলে, এতো ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

বুকের ভেতরে অমানুষিক খামচানির মধ্যেও এবারক হোসেনের হাসতে ইচ্ছে করে। মনে মনে বলেন, শরীরটা তো আমার রে রবি!

জানা হয়ে গেছে, এই রাতের পরের ভোরটি আর তাঁর দেখা হবে না – *'ঢাকো তবে ঢাকো মুখ, নিয়ে যাও দুঃখ সুখ / চেয়ো না চেয়ো না ফিরে – / হেথায় আলয় নাহি – অনন্তের পানে চাহি / আঁধারে মিলাও ধীরে...'*। এখন শুধু সহ্য করে যাওয়া আর অপেক্ষা করা। শেষের সে সময়টি কেমন হবে? *'হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি / স্তব্ধ আকাশ নীরব শশী রবি...'*।

একজন কবিকে মনে পড়ছে তাঁর। আসলে মনে পড়ার ব্যাপার ঠিক নয়, সেই কবি

তাঁর জীবন ঘিরে আছেন সেই কবে থেকে! খঞ্জনপুর হাই স্কুলের নিচের ক্লাসের ছাত্র তখন এবারক হোসেন। বীরেন স্যার ক্লাসে এসে কবির মৃত্যুর খবর দিয়ে বললেন, আজ আমি কিছুই পড়াবো না। ক্লাসের পুরোটা সময় তিনি সেই কবির কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। সব কবিতা বোঝার বয়স তাঁর তখনো হয়নি। বীরেন স্যারের আবৃত্তির গুণে বা আর যে কোনো কারণেই হোক, কবি তাঁর প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কবির তখন খ্যাতি প্রচুর, তবু একজন কবির মৃত্যুতে ক্লাসের পড়া বন্ধ রাখা খুব অভিনব ঘটনা ছিলো। স্পষ্ট মনে আছে, পৃথিবীর শেষ বড়ো যুদ্ধের দ্বিতীয় বছর চলছে তখন, ঋতু বর্ষা।

কিন্তু কবির কি মৃত্যু হয়? সেই দিনের পরে খুঁজে খুঁজে কবির কবিতা পড়ার শুরু। একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে উঁচু দেওয়ালঘেরা এক বাড়ির ভেতর থেকে কিশোরীকণ্ঠের গান ভেসে আসতে শুনেছিলেন – *'আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে...'*। আগে শোনা কোনো গানের সঙ্গে এই গানের কিছুমাত্র মিল নেই। একেবারে নতুন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হয়েছিলো। জেনেছিলেন, এ-ও সেই কবির গান। দেওয়ালঘেরা বাড়িটি ছিলো এক সম্পন্ন হিন্দু পরিবারের, মুসলমান বাড়িতে তখনো মেয়েরা গান করে না। সেই গান গাওয়া কিশোরী মেয়েটিকে কোনোদিন চোখে দেখেননি, কিন্তু সেই গান যে কী সুধারস ঢেলেছিলো, আজও তা তাঁর কানে লেগে আছে।

কবির কবিতা আর গান বুকের ভেতরে খোদাই হয়ে যাচ্ছিলো। কলেজ পেরিয়ে বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়া, সাহিত্যের শিক্ষকতা – সে-ও কি কবির কারণে নয়! আজ ষাট বছরের ওপরে তাঁর নিত্যদিনের সখা ওই কবি।

'কবে আমি বাহির হলেম তোমারই গান গেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে –
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ঝরনা যেমন বাহিরে যায়, জানে না সে কাহারে চায়
তেমনি করে ধেয়ে এলেম জীবনধারা বেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।'

আজ এই রাতে, যখন তিনি জেনে গেছেন চলে যাওয়ার সময় এসে গেছে, কবিকে কি তাঁর মনে পড়বে না! কবি বলেছিলেন, আমার কিছুই না থাকলেও গান থেকে যাবে। কবিরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টাও হয়ে থাকেন। কবির গান ঠিকই রয়ে গেছে, আজও নতুন। এবারক হোসেনের অকস্মাৎ মনে হয়, আচ্ছা আমি চলে গেলে কী থাকবে আমার? কিছু থাকবে কি? এই যে এতোগুলো বছর কাটলো এই ধূলি-ধূসরিত পৃথিবীতে, তার যোগফল কি? আনন্দ-সুখ-বেদনা-দুঃখ-চাওয়া-হতাশা-ভয়-দুরাশা-পাওয়া এইসব মিলিয়ে জীবন নামের অত্যাশ্চর্য মহার্ঘ্য একখানা জিনিস, এই তো! ধরাছোঁয়া যায় না, কেবল যাপন করে যেতে হয়। কী পাওয়া হলো? কবি বলেছিলেন, *'...কী পাইনি, তার হিসাব মিলাতে*

মন মোর নহে রাজি...'। সময় আর নেই, হিসেব মিলিয়ে কী আর হবে? যা পাওয়া গেলো, যা দেওয়া হলো, সবটুকুর শেষ যোগফল তো এই সত্যে এসে স্থির হয় – চলে যেতে হবে। *'ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে...'*।

হাজীপাড়ায় এসে রিকশার চেন পড়ে গেলে রবি বলে, তাড়াতাড়ি কর, বাবা। তোর চেন পড়ার আর সময় পেলো না!

রিকশাওয়ালা জবাব দেয় না, সে নেমে চেন লাগাচ্ছে। এবারক হোসেন অন্ধকারে চোখ ফেলে চারদিক দেখে নিচ্ছিলেন। বাঁয়ে ছোটোমতো একটি মাঠ, ছেলেরা দিনের বেলায় হৈ-হল্লা করে খেলে। খেলাধুলায় তাঁর বিশেষ উৎসাহ কখনো নেই, এই মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করেও দেখেননি তেমন। আজ এখন মনে হলো, আর দেখা হবে না! *'এতো কামনা এতো সাধনা, কোথায় মেশে...'*।

২.

অন্ধকার থাকতেই ভোর ভোর উঠে গোসল সেরে ফেলার অভ্যাস। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় সারা বছর এবারক হোসেন কাকভোরে গোসল সেরে হাঁটতে বেরিয়ে যান। কোনো কারণে এদিক-ওদিক হয়ে গেলে মনে হয়, দিনটা ঠিকমতো শুরু করা হলো না। আজও দিনের শুরুতে অন্যরকম কিছু ঘটেনি। মর্নিং ওয়াক সেরে ফিরে আলু ভাজা দিয়ে দুটো রুটি খেয়েছিলেন। আলু খেতে অবশ্য ডাক্তারের নিষেধ আছে, ব্লাড শ্যুগারের বাড়াবাড়ির কারণে। মাসকয়েক আগে এইসব গোলমাল নিয়ে দিনকতক হাসপাতালেও থাকতে হলো। তখনই ডাক্তার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খুব সাবধান করে দেয়। এবারক হোসেন নিজেই বরাবর সতর্ক। কিন্তু বয়স তাঁকে এমন একটা জায়গায় এনে ফেলেছে যে শরীরের কলকব্জাগুলো আর ঠিক বশে রাখা যাচ্ছে না। এ দফায় আবার ডাক্তার বলে দিয়েছে, ফলমূলও খেতে হবে খুব বাছাবাছি করে। কী সর্বনাশ! আমের মৌসুম তখন, আমও নাকি খাওয়া যাবে না। দুপুরে খাওয়ার পরে মৌসুমের একটা কোনো ফল মুখে না দিলে খাওয়া শেষ হলো বলে যে মনেই হয় না! আমের সময় অবশ্যই আম, তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। হাসপাতাল থেকে ফিরে তিনি পরদিনই আম কিনে এনেছিলেন। ডাক্তারের নিষেধের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তীব্র আপত্তি করলেন জোহরা বেগম। এবারক হোসেন মিটিমিটি হেসে বলেছিলেন, আগামী বছর আমের সময় যদি আমি আর না থাকি! তখন এই তোমারই মনে হবে, আহা রে, মানুষটা খুব আম খেতে চেয়েছিলো!

আজ সকালে আলু ভাজা করতে বলে গিয়েছিলেন। ডাক্তারের নিষেধ মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই, চুপ করে ছিলেন জোহরা বেগম। সবকিছুতেই ঠাট্টা করার ঝোঁক মানুষটার, ফট করে কী একটা হয়তো বলে দেবেন। রাগও করা যায় না।

দুপুরে খাওয়ার পর খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সামান্য ঘুমিয়ে নেওয়ার অভ্যাস অনেকদিনের। আজ ঘুম থেকে উঠতে বিকেল হয়ে গিয়েছিলো। বিছানা ছেড়ে উঠে

পাশের ঘরে প্রিয় ইজিচেয়ারে বসতে গিয়ে বুকে অস্পষ্ট চিনচিনে ব্যথামতো টের পেলেন। খুব অপরিচিত নয়, এই ব্যথার সঙ্গে জানাশোনা হয়েছিলো ঠিক আট বছর আগে। সে রাতে জোহরা বেগম বাড়িতে ছিলেন না, গ্রামে ভাইয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা থেকেই সেদিন এবারক হোসেন বুকের অস্বস্তি টের পাচ্ছিলেন, রাতের সঙ্গে ব্যথাও বেড়ে যাচ্ছিলো। ঘাড়ের পেছন দিকটা টনটন করতে থাকে, সারা শরীরে ঘাম দেয়। রাত এগারোটায় রিকশা নিয়ে একা একাই উপস্থিত হয়েছিলেন ডক্টরস ক্লিনিকে। তাঁর এক পুরনো ছাত্র ডাক্তারি পাশ করে ক্লিনিক খুলেছে। চাকরি নিয়ে এ শহরে এসে প্রথম যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন এবারক হোসেন, সেই একতলা বাড়িটিই এখন তিনতলা হয়ে ডক্টরস ক্লিনিক। ডাক্তার ছাত্রটি তাঁকে পরীক্ষা-টরীক্ষা করে দোতলার ক্যাবিনে শুইয়ে দিয়ে জানায়, এখন আপনার কোথাও যাওয়া চলবে না। ভাগ্য ভালো, সময়মতো এসে পড়েছেন।

কাটাছেঁড়া কিছু অবশ্য করতে হয়নি, কিন্তু এখানে দিনকয়েক চিকিৎসার পর ডক্টরস ক্লিনিকের ডাক্তারদের প্ররোচনায় আর ছেলেমেয়েদের প্রশ্রয়ে ঢাকা পর্যন্ত সাত-আট ঘণ্টার পথ অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে যেতে হয়েছিলো। প্রাইভেট ক্লিনিক আর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল মিলিয়ে মাস দুয়েক কাটানোর পর ডাক্তাররা ঘরে ফেরার অনুমতি দেয়। ছাড়া পেয়ে বনানীতে মেয়ের বাড়ির দোতলায় যখন উঠতে হলো চারজনে ধরাধরি করে তোলা একটি চেয়ারে বসে, সেই প্রথম নতুন একটি সত্য জানা হয়েছিলো – এতো বছর ধরে যে শরীরের মালিকানা, তার অনেক কলকব্জাই আর নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করবে না। নিজেকে অতো দীনহীন, অথর্ব আগে কখনো মনে হয়নি। সোহরাওয়ার্দীতে প্রথম দু'দিন বেডের অভাবে রোগীদের বিছানার ফাঁকে প্যাসেজের মেঝেতে শুয়েও এতো জীর্ণ লাগেনি। সময় বড়ো দয়াহীন ও নির্মম, কতোকিছু যে কেড়ে নেয় সে!

বিকেলে বুকের ব্যথা যখন টের পেলেন, সেই সময় জোহরা বেগম বাড়ির পেছনে বাগানে শুকোতে দেওয়া কাপড়গুলো আনতে গেছেন। একতলা হয়ে গেলে এ বাড়িতে উঠে আসার কিছুদিন পর বাড়ির পেছনের লাগোয়া কিছু জায়গা কিনে ফেলেছিলেন। জায়গাটা তখনো বাঁশঝাড়। সেগুলো কেটেকুটে পরিষ্কার করে উঁচু পাঁচিল তুলে অনেক রকমের গাছপালা লাগানো হয়েছিলো। সেই গাছগুলো এখন সব বড়ো হয়ে উঠেছে, সেখানে রোদও আর আগের মতো পাওয়া যায় না। তবু ওরই ফাঁকে ফাঁকে দড়ি ঝুলিয়ে কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়।

জোহরা বেগম ঘরে এলে এবারক হোসেন বলি-বলি করেও বললেন না। ভুলও হতে পারে। পেটে গ্যাস হলেও এরকম হয়, শুধু শুধু ব্যতিব্যস্ত হওয়ার মানে হয় না। বললেন, এক গ্লাস পানি দাও তো!

পানি দিয়ে জোহরা বেগম বললেন, আমি ওপর থেকে একটু ঘুরে আসি।

ওপরতলার অসীম আজ সারাদিনই নেই, রীতাও মেয়েদের নিয়ে কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিলো। ফিরে এসে একটু আগে অসীমের ছোটো মেয়েটি ওপর থেকেই

হাঁক দেয়, দিদা!

তার মানে এখন তুমি ওপরে আসবে, না আমি নিচে আসবো? জোহরা বেগম জবাব দিয়েছিলেন, একটু পরে আসছি রে, দিদি।

জোহরা বেগম ওপরে যাচ্ছেন শুনে এবারক হোসেন একবার ভাবেন বলবেন, থাক, আজ না হয় না গেলে। এখন আমার কাছে একটু থাকো। বললেন না। বললে খুব অস্বাভাবিক কিছু শোনাতো না, জোহরা বেগম কিছুক্ষণ আশেপাশে না থাকলে দিশেহারা লাগে তাঁর। ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে যে যার মতো ছড়িয়ে যাওয়ার পর শূন্য বাড়ি। কাজের মেয়ে একজন আছে, সকালে-বিকেলে কাজ করে দিয়ে চলে যায়। ঘুরেফিরে সেই দু'জন মাত্র মানুষ সারা বাড়ি জুড়ে। ছাত্রজীবনে তাঁর শিক্ষক – বিখ্যাত পণ্ডিত ড. শহীদুল্লাহ – একবার ক্লাসে বলেছিলেন, শেষ বয়সে এখন আমার সম্বল হলো বই আর বউ। ক্লাসে সবাই বেদম হেসেছিলো সেদিন। এখন এবারক হোসেন জানেন, স্যার একটুও ভুল বলেননি। বই পড়া আজকাল আর তাঁর হয় না, চোখের ওপর বড়ো চাপ পড়ে। চিকিৎসা অনেক রকম করা হলো, খুব একটা কিছু হয়নি। ডাক্তার শেষমেষ বলে দিয়েছে, চোখ এখন শুধু খারাপই হতে থাকবে, সেই ধস ঠেকানোরও কোনো উপায় নেই আর। কিন্তু বউ না হলে তাঁর একেবারেই চলে না। অনেক বছরের নির্ভরতা। বন্ধু-বান্ধবরা একে একে অনেকেই চলে গেছে, যারা আছে তাদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ বড়ো একটা হয় না। সবাই এখন খুব ছোটো জায়গার মধ্যে চলাফেরা করে, একটু দূরে কোথাও একা একা যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

এখন তাঁর সঙ্গী বলতে, বন্ধু বলতে জোহরা বেগম। গত অগাস্টে তাঁদের বিয়ের পঞ্চাশ বছর হলো। ঝর্ণা একটা উৎসবমতো করবেই। ঘটা করে এসব পালন করার রীতিনীতির সঙ্গে ভালো পরিচয় ঘটেনি, খানিক আপত্তি তাঁর ছিলোই। তবু রাজি হয়েছিলেন, একটা উপলক্ষ করে সবাইকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে, এ-ই বা কম কী! করা হলো একটা ছোটোখাটো অনুষ্ঠান। ঢাকায় চিঠি লিখলেন : আমাদের বিয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে ছোটোখাটো একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চাই। জীবনের এই শেষ উৎসবে মনে-প্রাণে তোমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করছি। তোমরাই আমাদের আত্মার ধন, আমাদের সামনে যাওয়ার পিছুটান...

দোগাছীর গ্রামের বাড়ি থেকে বড়ো তিন ভাইয়ের ছেলেরা – খোকা, আশরাফ, আফজাল – তাদের বউ-ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছিলো। ঢাকা থেকে মেজো ছেলে ফিরোজ আর তার বউ রুবা, ঝর্ণা-রঞ্জু আর তাদের একমাত্র ছেলে রঙ্গন। রীতা আসতে পারেনি, জ্বরে পড়া মেয়েকে নিয়ে ঢাকা থেকে ছুটে আসার কোনো মানে হয় না। এবারক হোসেন নিজেই ফোন করে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। আর আসেনি বড়ো আর ছোটো দুই ছেলে। দেশের বাইরে থেকে সশরীরে ওদের আসা সম্ভব ছিলো না, ফোনে এসেছিলো। বড়ো ছেলেকে লিখেছিলেন : তোমরা আসতে পারবে না জেনেও এই ভেবে পুলক অনুভব করছি যে তোমরা ছায়ার মতো আমাদের পাশেই আছো...

জোহরা বেগম ওপরে চলে গেলে এবারক হোসেন ইজিচেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। শোবার ঘরে গেলেন, বেরিয়েও এলেন আবার। দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় একটু দাঁড়ালেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কিছু না দেখেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলেন ঘরে। অস্থিরতা বোধ করেন। মনে হয়, কী যেন একটা কী করার আছে। কিন্তু কী? মনে পড়ে না। বুকের ব্যথা খানিক বেড়েছে বলে বোধ হয়। অন্ধকার ঘরে ফিরে আলো জ্বালতে ইচ্ছে হলো না। আবার ইজিচেয়ারে বসে বুকের ভেতরে একটা তীব্র দংশন টের পেলেন। ধাক্কাটা খুবই আচমকা আর জোরালো। এই তো সেই চকিত-দংশন, চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয়। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাকেন ইজিচেয়ারে। ছোবলটা আর টের পাওয়া যায় না, কিন্তু বুকের ভেতরটা কেমন ভয়ানক ভারী হয়ে চাপ ধরে আছে। যেন বুকের ওপর পাথরচাপা দেওয়া হয়েছে। চোখমুখে গরম ভাপ, এই শীতে সন্ধ্যায়ও কপালে ঘাম জমছে। শরীরের ভেতরে কি ঘটছে, ভাবতে চান না। ভেবে কী হবে! *'যেতে যদি হয় হবে / যাব, যাব, যাব তবে...'*। জীবনের কাজ কিছুই আর বাকি নেই। অবশিষ্ট পড়ে আছে কেবল একবুক ভরা মায়া, ভালোবাসার মানুষদের জন্যে পিছুটান। এই লেনদেন শেষ হওয়ার নয়। জীবন যে কী ভীষণ এক তৃষ্ণা! তার পরতে পরতে কতো মায়া আর পিছুটান! *'এখনো নিজেরই ছায়া, রচিছে কত যে মায়া / এখনো মন যে মিছে চাহিছে কেবলই পিছে...'*

এবারক হোসেন জানেন, জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে শুয়ে আছে অস্পষ্ট একটি রেখা। দেখা যায় না, বোঝা যায়না। অনুভবেরও বাইরে। তাহলে? এক মুহূর্তের কারসাজিতে নেই হয়ে যাওয়া! কী করুণ! নিজের জন্মের সময়টি মানুষের স্মৃতিতে থাকে না। আর এই চলে যাওয়ারও কোনো স্মৃতি আমার থাকবে না। অদেখা সুতোয় টানা রেখাটি পেরিয়ে গেলে স্মৃতি-বিস্মৃতি কোনোকিছুরই আর কোনো মূল্য নেই। আমি তখন অন্য মানুষদের কাছে স্মৃতি, আমার সেখানে কোনো ভাগ নেই! কী দুঃসহ এই চলে যাওয়া। কী অর্থ আছে এর! জীবনের পরে কী আছে জানা গেলে হয়তো এই যাওয়া অনেক সহজ হয়ে যেতো। জানা নেই বলেই কি এতো সংশয়! এতো দ্বিধা! এতো পিছুটান! পিছুটান, ভালোবাসা, মায়া না থাকলে বুকভাঙা এমন হাহাকারও বুঝি উঠতো না।

শরীরের ভেতরে এই আকস্মিক আক্রমণ সহনীয় হয়ে ওঠার কথা নয়, কিছু সময় গেলে খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে ওঠার ব্যাপার হয়তো ঘটে। এবারক হোসেন ধীরে ধীরে উঠে বসলেন, অনেকখানি ইচ্ছেশক্তি জড়ো করে দু'পায়ে ভর রেখে দাঁড়ালেন। মাথার ভেতর খালি খালি লাগে, পা সামান্য টলোমলো। ইজিচেয়ারের পাশে খাটে হাত রেখে সামলে নিলেন। পায়ে পায়ে চলে এলেন শোবার ঘরে, পড়ার টেবিলে এসে বসলেন। চোখের আলো কমে আসায় আজকাল আর লেখাপড়ার কোনো কাজ নেই, টেবিল তবু রয়ে গেছে এ ঘরে। টেবিলে কাচের নিচে খুব প্রিয় মুখগুলোর ছবি পরপর সাজিয়ে রাখা। ছেলেমেয়েরা, তাদের ছেলেমেয়েরা ছবির ভেতরে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের

দেখা আর হওয়ার নয়, ছবিতে এখন কাকে রেখে কাকে দেখবেন! ভেজা ঝাপসা চোখে দেখাও কি যায়! চোখের কোল মুছে তাকিয়ে দেখেন আবার। *'নদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই, একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায়...'*। জানি, জীবন এরকমই, চাইলেও সব ধরে রাখা যায় না। ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়েছে, তাদের নিজেদের জীবন, জগৎ তৈরি হয়ে গেছে। ওরা তাঁর আশেপাশে যে সবসময় থাকবে, তা হয় না। তবু কী বিষম এই তৃষ্ণা!

ছোটো ছেলেটি ক্যাডেট কলেজ পাশ করে বিদেশে পড়তে গিয়েছিলো। আর তার ফেরা হলো না। চোখের আড়ালেই সে থাকলো প্রায় সারা জীবন। চল্লিশের কাছাকাছি, তবু তাকে সংসারী করে তোলা গেলো না আজও। কী আর করা, সবাই একরকম হয় না। একসময় অনুযোগ করতেন, এখন আর তা-ও নেই। ওর মুখে তিনি তাঁর নিজের পিতার ছবি দেখতে পান, একমাত্র ওকেই আদর করে বাপজান বলে ডাকতেন। আজও ডাকেন, মনে মনে। তার সঙ্গে দেখা নেই ঠিক পাঁচ বছর, চিঠিপত্র নেই, ফোনও আসে না বড়ো একটা। তাঁদের পঞ্চাশ বছরের বিয়ে বার্ষিকীর সময় ওকে লিখেছিলেন : বাপজান, অনেক দুঃখ-বেদনার মধ্যেও আজ তোমার হাসিমুখ স্মরণ করছি। তুমি সুখে থাকো, ভালো থাকো। আমাদের কথা মনে রেখো...

কীসের অভিমান তার, বোঝা যায় না। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো, কষ্ট আসলে আজও আছে। ওকে শেষবার একনজর দেখার বড়ো ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু তা যে হয়ে উঠবে সে আশা ছেড়ে দিতে হয়েছে। কিছুদিন আগে ফোনে অনুনয় করে বলেছিলেন অন্তত সাম্প্রতিক একখানা ছবি পাঠাতে। তা-ও আসেনি। *'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা... / হৃদয়বিদারি হয়ে গেল ঢালা...'*। তবু ওকে তিনি ক্ষমাও করে দিয়েছেন। সঠিক কিছু জানা নেই, তবু ভেবে নিয়েছেন, হয়তো তাঁরই কোনো ভুল হয়েছিলো কোথাও। তিনি জানেন, কোনোকিছু বদলে ফেলার ক্ষমতা না থাকলে তাকে মেনে নিতেই হয়।

মেয়েটিই সবসময় খোঁজখবর রাখে। একদিন-দু'দিন পরপর ঢাকা থেকে ফোন করে ঝর্ণা, ঈদে-পরবে আসে। রঙ্গন দাদু-নানীর বড়ো ভক্ত। ও-ই প্রথম নাতি, আর ওকেই সবসময় চোখের সামনে পাওয়া যায়। বড়ো ছেলেটির ঘরে ছেলেমেয়ে এলো ওরা দেশের বাইরে যাওয়ার পর। নাতনিকে প্রথম দেখলেন ওরা দেশে বেড়াতে এলে, ডোরার তখন তিন বছর। খানিক পরপরই ভুরু-মুখ কুঁচকে হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে বলতো, আমি রাগ করেছি! এক সকালে গুনেছিলেন, ঊনচল্লিশবার এরকম রাগ করেছিলো সে। অর্ণব হলো আরো কয়েক বছর পর। তাকে দেখতে সেই দূরদেশে উড়ে যেতে হয়েছিলো। দু'বছর বয়স তখন ওর। দাদুর দেখাদেখি বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর পা তুলে বুকের ওপর বই খুলে পড়ার অভিনয় করতো। ডাইনোসরের ছবি দেখতো বই খুলে। ওকে দেখে ভাবতেন, ওর বয়সে আমরা ডাইনোসর বলে কোনোকিছুর নামও জানতাম না। তার ডাইনোসরপ্রীতি আরো বেড়েছে, একদিন ফোনে কথা বলতে বলতে অর্ণব ঘোষণা দেয়, বড়ো হয়ে সে ডাইনোসর হবে!

ফিরোজ-রুবার ছেলেমেয়ে হয়নি এখনো, কেন কে জানে মিসক্যারেজ হয়ে গেলো কয়েকবার।

রুবার বাবা তরিকুল আলম কলেজে তাঁর সহকর্মী ছিলেন। তিনি বাংলায়, তরিকুল সাহেব ইংরেজিতে। একসময় মালতীনগরে তরিকুল সাহেবের করতোয়ার পাড়ের বাড়িতে রোজ বিকেলে ব্রীজ খেলতে যাওয়া হতো। চাকরি জীবন শেষ হওয়ার পরও প্রায়ই বিকেলে তাসের আসর বসতো। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে তরিকুল সাহেব চলে গেলেন বছর দুয়েক হয়। পাড়ায় তাস খেলার সঙ্গী আফসার খোন্দকার, পণ্ডিত সাহেবও আর নেই, এবারক হোসেনের কর্মহীন দীর্ঘ বিকেলগুলো এখন আরো দীর্ঘ হয়েছে।

ব্রীজ খেলায় মনমতো তাস কোনোসময় পাওয়া যায় না, এটা আছে তো ওটা নেই। নিজের হাত ভালো তো পার্টনারের হাতভর্তি রাজ্যের জঞ্জাল। তবু তাস বেঁটে দেওয়ার পর হাতে যা আসে, তাই নিয়ে খেলে যেতে হয়। এবারক হোসেন দেখেছেন, মানুষের জীবনও ওরকমই। বড়ো ছেলে লেখাপড়া শেষ করলো, চাকরি-বাকরি করবে না। বছর কয়েক ধরে কীসব ব্যবসাপত্র করার চেষ্টা করলো, বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। বিয়েও করে ফেলেছিলো এরই মধ্যে। বউটি হাসিখুশি, খানিকটা পাগলাটেও। ব্যবসায় কিছুতেই কিছু ঘটে উঠছিলো না দেখে ওরা দেশের বাইরে চলে গেলো বিয়ের বছর তিনেক পরে।

ঝর্ণার বিয়ে হয়েছিলো পাশ করার পরপরই। সরকারি কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পেয়েও করলো না, রঞ্জুর মত নেই বলে। চমৎকার ছেলে রঞ্জু, কখনো কখনো তাঁর নিজের ছেলেদের চেয়েও বেশি সে। কিন্তু এই একটা ব্যাপার নিয়ে ওর ওপরে খানিকটা ক্ষোভ জন্মেছিলো তাঁর। এবারক হোসেনের মতে মেয়েদের জন্যে অধ্যাপনার মতো ভালো পেশা আর নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো রেজাল্ট করেও ঝর্ণা পড়াশোনাটা কোনো কাজে লাগালো না, এই অনুযোগটি ছিলো তখন। শুধু ঘরসংসার করবে, তাহলে আর এতোদূর লেখাপড়ার কী দরকার ছিলো? এখন অবশ্য মাঝে মাঝে মনে হয়, চাকরিতে ঢুকে পড়লে ঝর্ণার জীবনটা কীরকম হতো? বাইরের কাজকর্ম করে না বলে তাঁরা ঢাকায় গেলে অখণ্ডভাবে সময় দিতে পেরেছে সে বরাবর। যখন-তখন যে কোনো সঙ্কটে-সমস্যায় তাকে পাওয়া গেছে সহজে।

ফিরোজ ঝামেলা কম করেনি, শুরু সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকে। পড়াশোনায় সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ধারালো, অথচ মনোযোগ নেই মোটে। কোনো কারণ ছাড়াই সে প্রথমবার বাড়ি থেকে পালায়, তখন সে ক্লাস সেভেনে। তারপর প্রশ্নবোধক চেহারার বন্ধুবান্ধব, তাদের নিয়ে দলপাকানো, মারপিটে জড়িয়ে পড়া কোনোটাই বাদ যায়নি। এক রাতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যাকে ছাড়া তার এক মুহূর্ত চলে না, খুন হয়ে গিয়েছিলো প্রকাশ্য রাস্তায়। সেবার ফিরোজকে রাতারাতি ঢাকায় পাচার করে দিতে হয়েছিলো। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে মুষ্টিযুদ্ধ পর্যন্ত অগণিত বিষয়ে তার প্রবল উৎসাহ এবং এক ধরনের সহজ দক্ষতা, কিন্তু যোগফলে তেমন কিছু দাঁড়ালো না। ধরে-বেঁধে

একরকম জোর করে তাকে বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ানো হলো, অপ্রত্যাশিত রকমের ভালো ফল করলেও আর পড়াশোনা করলো না। অনেক বছর ধরে অনায়াসে একেকটা চাকরি ধরেছে, তখন তার কী উচ্ছ্বাস-উৎসাহ। অথচ উৎসাহ তার বেশিদিন থাকে না, নির্বিকারভাবে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। আবার নতুন কোনো একটায় লেগে পড়তেও সময় লাগেনি। বয়স বাড়ছে, কিন্তু এখনো বদলায়নি সে তেমন।

জীবনভর দূরে থাকা ছাড়া ছোটোটিকে নিয়ে কোনো গোলমাল ছিলো না। তারপরেও কোথায় কী যে একটা না-বোঝা জট পাকিয়ে গেলো, সে আরো দূরের মানুষ হয়ে উঠলো। হয়তো সবচেয়ে দূরের।

সবাই বাড়িছাড়া হওয়ার পরে অন্তত রীতা ছিলো, বাড়ি এতো ফাঁকা ফাঁকা লাগতো না। জোহরা বেগমের ফুপাতো বোনের মেয়ে রীতা, একেবারে শিশুকাল থেকে সে এ বাড়ির একজন হয়ে উঠেছিলো। শান্তাহারে নিজের বাবা-মা'র কাছে মাঝেমধ্যে গেলেও সে এবারক হোসেন আর জোহরা বেগমকেই আব্বা-আম্মা জেনেছে। এক বাড়িতে দুই রীতা নিয়ে বেশ গোলমাল লেগে যেতো। নিচে এক রীতা, ওপরে অসীমের বউ রীতা। কখনো কখনো নাম ধরে ডাকলে একসঙ্গে দুই রীতাই সাড়া দিয়ে ফেলতো।

ছেলেমেয়েরাও রীতাকে নিজেদের ছোটো বোনটি ছাড়া কিছু ভাবেনি কোনোদিন। একবার তিন ছেলেকে একসঙ্গে পেয়ে এবারক হোসেন বলেছিলেন, আমাদের তো বয়স হচ্ছে, বাড়িঘর আর সামান্য যা কিছু আছে তার একটা ব্যবস্থা কাগজে-কলমে করতে চাই। তোমরা কী বলো? তিনজনই বলেছিলো, ওদের কিচ্ছু চাই না, সব যেন ঝর্ণা আর রীতার জন্যে থাকে। রীতাও বিয়ের পরে ঢাকায় চলে গেলো বছর পাঁচেক হয়। নাতি-নাতনিদের পাওনা যা-কিছু আদর-প্রশ্রয়, নাগালের মধ্যে আছে বলে রঙ্গন একা লুটেপুটে নিচ্ছিলো অনেকদিন ধরে। এখন ভাগ বসাচ্ছে রীতার মেয়ে শ্রেয়া।

মনে পড়ে, বড়ো ছেলে একবার চিঠিতে তার শোনা একটি ইংরেজি গানের কথা লিখেছিলো। গায়ক বলছে, এই তো মাত্র সেদিনের কথা, আমার ছেলেটি এত্তোটুকু ছিলো। তখন ওর সঙ্গে বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করতাম। ছেলেটি কেবল আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করে আর বলে, বড়ো হলে আমি আমার বাবার মতো হবো। আমি সারাদিনমান কাজে কাজে বাইরে থাকি, ব্যস্ততার শেষ নেই। মাঝেমধ্যে দীর্ঘ সময়ের জন্যে শহরের বাইরে চলে যাই, দেখা হয় না দিনের পর দিন। তবু যখন ঘরে ফিরে আসি, সে ঝাঁপিয়ে চলে আসে আমার কোলে আর বলে, বড়ো হলে আমি ঠিক বাবার মতো হবো। এই তো মোটে সেদিনের কথা...। এখন ছেলে বড়ো হয়েছে, দূরের শহরে থাকে কর্মস্থলে। কাজকর্ম, সংসার নিয়ে সে ব্যস্ত এখন, দেখা হয় কালেভদ্রে। এই তো মোটে সেদিনের কথা, ওর সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিলো। বললো, ছেলেটার শরীর ভালো নয়। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কবে দেখা হবে? ছেলে বললো, বাবা, বোঝোই তো, কতো ব্যস্ত থাকি! তখন মনে হলো, আমার ছেলেটি ঠিকই তার বাবার মতো হয়ে উঠেছে!

গানটি এবারক হোসেন শোনেননি। ভিনদেশী গান তাঁর পছন্দ নয় কোনোদিন, কিন্তু

এই গানটি তাঁর খুব শুনতে ইচ্ছে হয়েছিলো। অদ্ভুত এক চক্র এই জীবন – যা নিচ্ছি, তা ফিরিয়েও দিতে হবে এই জীবনেই। ভেবেছিলেন, এরপরে ছেলে যখন আসবে দেশে, গানটি সঙ্গে করে আনতে বলবেন। বলা হয়নি, আর কি হবে?

এবারক হোসেন ভাবলেন, এতো অপূর্ণতার পরেও এক জীবনে যা পাওয়া হলো, তা-ও কি কম কিছু? *'জীবন হয়নি ফাঁকি, ফলে ফুলে ছিল ঢাকি / যদি কিছু রহে বাকি কে তাহা লবে! / দেওয়া-নেওয়া যাবে চুকে, বোঝা-খসে-যাওয়া বুকে / যাব চলে হাসিমুখে – যাব নীরবে'*। ঠাট্টা করে প্রায়ই বলেন, মরার পরে বেহেশত-দোজখ বা স্বর্গ-নরক যেখানেই যাই না কেন, কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে ঠিক ঠিক পেয়ে যাবো। আমার আর ভাবনা কীসের? আসলে ঠাট্টাও নয়, শিক্ষক হিসেবে প্রায় সর্বজনপ্রিয় ছিলেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীদের ভালোবাসা তিনি ফিরিয়েও দিতে চেয়েছেন। পুরনো অনেক প্রিয় ছাত্র তাঁর পরিবারের মানুষ হয়ে আছে দীর্ঘদিন, তিনিও তাদের ঘরের মানুষ। ঈদে-পরবে সালাম করতে আসে তারা, বাড়ির ভিত দেওয়ার জন্যে ডাকে, মেয়ের বিয়ে ঠিক হলে স্যারের কাছে একবার পরামর্শ করে যায়।

এক জীবনে কতোকিছু প্রত্যক্ষ করা হলো! কতো আলো-আঁধারি এই পৃথিবীর! বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে পেয়েছিলেন পৃথিবীর সর্বশেষ বড়ো যুদ্ধ। পতিত জাপান-জার্মানী। হিরোশিমা-নাগাসাকি। বৃটিশ তাড়াও। এরই মধ্যে দেশে অন্নের অনটন, অনাহারী মানুষের তখন অবস্থাপন্নের দুয়ারে ভাত চাওয়ারও সাহস নেই, ভাতের ফ্যান চায়! হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। বিভক্ত ভারতবর্ষ। পাকিস্তান জিন্দাবাদ এলো। লাল চীন। পাকিস্তানী তাড়াও। শেখ মুজিব। ১৯৭১। যুদ্ধ। নদীতে নদীতে ভেসে আসা অচেনা মানুষের লাশ। বাংলাদেশ। জয় বাংলা। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। সোভিয়েত-মার্কিন ঠাণ্ডা লড়াই। চিৎপাত পরাক্রান্ত সোভিয়েত। চীনে সামরিক শাসন। সৌভাগ্যবশে বাংলার নতুন শতাব্দী আর ইংরেজি নতুন সহস্রাব্দের শুরু দেখাও হলো।

কাচের ওপর দিয়ে ছবিগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছিলেন এবারক হোসেন। *'বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই, নেই...'*। তাঁর মনে হলো, কাচের নিচের হাসিমুখগুলোকে ছোঁয়া যায় না। সত্যিই আর যাবে না!

সব প্রিয় মানুষের ছবি সামনে নেই, অ্যালবামে তোলা আছে। অনেকগুলো মুখের ছবি কোনোদিন ছিলো না, মনের ভেতরে আছে। তাঁর বাবার মৃত্যুর সময় বয়স হয়েছিলো একশোর ওপরে। বাপজান চলে গেছেন ছাব্বিশ বছর হয়, তখন তাঁর নিজেরই বয়স পঞ্চাশ। মা-কে হারিয়েছিলেন তিনি অনেক অল্প বয়সে, মায়ের স্মৃতি খুব বেশি নেই। *'মাকে আমার পড়ে না মনে। ... / কোলের 'পরে ধ'রে কবে দেখত আমায় চেয়ে, / সেই চাহনি রেখে গেছে সারা আকাশ ছেয়ে...'*।

সাত ভাইবোনের মধ্যে তিনি সবার ছোটো। চার ভাইয়ের বড়ো দু'জন চলে গেছে, তিন বোনের একজনও আর নেই। ওদের সবার সারাজীবন গ্রামে কাটলো, এক তিনিই লেখাপড়া শিখে শহরবাসী হয়েছিলেন। বাপজান আর ভাইদের আশ্রয়-প্রশ্রয় না হলে

তাঁর এ পর্যন্ত আসা হতো না। দূরের শহরে যাননি বলে যাওয়া-আসাও ছিলো। বড়ো ভাইদের ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি ছোটোবাবা। ওদের কাছে তিনি একজন সফল মানুষ, ওদের কেউ কেউ ছোটোবাবার মতো হয়ে উঠতে চেয়েছে।

বোনদের কারো ছবি নেই তাঁর কাছে। এখন মনে হলো, নেই কেন? কোনোদিন ওদের কারো ছবি রাখার কথা মনে হয়নি! যে মুখগুলো হারিয়ে গেছে, তারা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। দুটি অস্পষ্ট সুদূর মুখ তাঁর আচমকা মনে পড়ে। বিয়ের দু'বছরের মাথায় একটি মেয়ে হয়েছিলো, বেঁচেছিলো মাত্র কয়েকদিন। দুই ছেলেমেয়ের পরে এসেছিলো আরেকটি ছেলে, নাম রেখেছিলেন ফারুক, মারা যায় দেড় বছর বয়সে। ওদের কোনো ছবি কোথাও নেই। আজ এখন ওদের মুখ মনে করে বুক হু হু করে ওঠে।

বাপজান আর ভাইদের ছবি অ্যালবামে আছে। কোথায় আছে, তিনি জানেন না। জোহরা বেগমকে ডেকে বললে ঠিক বের করে দেবে, ওসব তার হেফাজতে থাকে। এখন হঠাৎ অ্যালবাম বের করার জন্যে ওপর থেকে ডেকে আনা যায় না। কী ভেবে বসবে, কে জানে!

জ্যোৎস্নার কথা মনে আসে, জ্যোৎস্নাময় কুণ্ডু। খঞ্জনপুর হাই স্কুলে সহপাঠী-বন্ধু। কলেজের পড়াও শুরু হয়েছিলো একসঙ্গে, দেশভাগ জ্যোৎস্নাকে নিয়ে গিয়েছিলো অন্য এক দেশে। বহুবছর পর তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিলো, মাঝেমধ্যে চিঠিপত্র লেখালেখি হতো। দেখা হলো সেবার কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে গিয়ে। আগেই চিঠিতে জানিয়েছিলেন, জ্যোৎস্না সস্ত্রীক দমদম এয়ারপোর্টে উপস্থিত। কিছুতেই হোটেলে উঠতে দেবে না, নিজেদের বাড়িতে নিয়ে তুলেছিলো। জ্যোৎস্না ভারতীয় আর্মিতে কর্নেল হয়ে রিটায়ার করেছে বেশ ক'বছর আগে। তাদের তিনটি মেয়ে, সবাই ডাক্তার। জ্যোৎস্না পুরনো বন্ধুদের কথা জানতে চেয়েছিলো, দেওয়ান মহসীন আলী এখন কোথায়?

ও তো নেই।

জ্যোৎস্না বলে, কী হয়েছিলো?

যুদ্ধের সময় মিলিটারিরা গুলি করে মেরে ফেলে, একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলো তখন ও।

একটু চুপ করে থেকে জ্যোৎস্না জিজ্ঞেস করে, আর আমাদের মুজিবর?

ওর এখনকার খবর ঠিক জানি না। ও পাগল হয়ে গিয়েছিলো। ঠিক পুরোপুরি পাগল নয়। অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলো পড়তে। ওর সাবজেক্ট ছিলো অঙ্ক। ফিরে এসে করাচি ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করে। তারপরে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি। মাঝে মাঝে হঠাৎ আসতো, চিঠিপত্রেও যোগাযোগ ছিলো। আমি রাজশাহীতে কোনো কাজে গেলে দেখা হতো। শিক্ষক হিসেবেও খুবই ভালো করছিলো। বিয়ে-টিয়ে করেনি। হঠাৎ করে সে আবোল-তাবোল কথা বলতে শুরু করলো। পাকিস্তান আমলের শেষদিকের কথা। মাথায় কী ঢুকলো, কে জানে, সে নিজের নাম ঘোষণা করে বসলো – দেবদাস। আগে-

পিছে কিছু নেই, শুধু দেবদাস। শুধু ইউনিভার্সিটি নয়, সারা রাজশাহীতেই হৈ চৈ, মুসলমানের ছেলে দেবদাস হয় কী করে? ওর তখন রীতিমতো জীবনসংশয়, মোল্লারা ওকে মেরে ফেলবে বলে শাসাচ্ছে। রাজশাহী ছেড়ে যেতে হলো ওকে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার দিনকয়েক আগে হঠাৎ ধুম জ্বর গায়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। দিনকয়েক থেকে একটু সুস্থ হয়ে চলে গেলো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আর্মি ওর ভবঘুরে ভাবভঙ্গি দেখে ধরে নিয়ে যায়। নাম জিজ্ঞেস করলে নির্বিকার বলে, দেবদাস। নাটোর জেলে ছিলো মাসকয়েক, তারপর ওকে ওরা ছেড়ে দেয় বোধহয় পাগল ভেবেই। পরেও মাঝেমধ্যে হঠাৎ হঠাৎ দিনকয়েকের জন্যে আসতো। চাকরি-বাকরি তো গেছে কবে, কোথায় থাকে, কী করে বললে কোনো জবাব দেয় না। এমন অবস্থা যে, ও নিজে থেকে দেখা না দিলে ওর ভালোমন্দ জানারও কোনো উপায় নেই। অনেকদিন হয়ে গেলো, কোনো খবর পাইনি। বেঁচে আছে কি না, তা-ও জানি না।

জ্যোৎস্না একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কী ব্রিলিয়ান্ট ছিলো ও।

রাতে খাওয়ার পরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে জানতে চেয়েছিলো খঞ্জনপুরের কথা। স্কুলটা কি আগের মতোই আছে? কাছেই ছোটো নদীটি এখন আর খেয়া নৌকায় পারাপার করতে হয় না, তার ওপরে পাকা ব্রীজ হয়ে গেছে শুনে বলেছিলো, যে রাতে আমরা দেশ ছেড়ে চলে আসি, খেয়ানৌকার মাঝি আমাদের কাছে কোনো পয়সা নেয়নি। শুধু বলেছিলো, সাবধানে যাবেন, বাবারা!

জ্যোৎস্না তাদের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করেনি। একবার বলেছিলো, জানিস, এই শেষ বয়সে পৌঁছে আমার খুব ইচ্ছে করে সেই গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই। মরে গেলে যেন আমার দাহ করা হয় খঞ্জনপুরে ওই নদীর ধারের শ্মশানে। কিন্তু সে তো আর হবার নয়। নিজের গ্রামেই তো আমি এখন বিদেশী...

জ্যোৎস্নার জন্যে তাঁর সেদিন কষ্ট হয়েছিলো। রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ মানুষের ছোটো ছোটো ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেও কতো অসম্ভব অবাস্তব করে দেয়! জ্যোৎস্নার তুলনায় নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয়েছিলো। এখন মনে মনে বললেন, আমার সময় হলো, জ্যোৎস্না। আমি ফিরে যাচ্ছি দোগাছিতে। সবাইকে বলা আছে, আমার বাবা আর ভাইদের পাশে আমার জায়গা হবে। যাত্রাশুরুর জায়গায় ফিরে যেতে পারলে তবেই তো যাত্রা সম্পূর্ণ হয়, তাই না? কিন্তু তোরটা যে সম্পূর্ণ হওয়ার নয় রে, জ্যোৎস্না! রাষ্ট্রের দম্ভের কাছে, শক্তির কাছে তোর-আমার ক্ষমতা যে কিছুই নয়!

পড়ার টেবিল থেকে উঠে আবার ইজিচেয়ারে এসে বসলেন এবারক হোসেন। আলো জ্বালতে ইচ্ছে করেনি, অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে ছিলেন। বুকের ব্যথা এখন আর ততো তীব্র নয়, কিন্তু চাপ ধরা ভাবটা একটুও কমেনি। শীতের সন্ধ্যায় এই ঘরের ভেতরের দিকের দরজা-জানালাগুলো এখনো খোলা, তবু তাঁর একটুও শীত করছে না। বন্ধ চোখের সামনে দিয়ে চলচ্চিত্রের ছবির মতো একেকটা মুখ, একেকটা ছবি মুহূর্তের জন্যে আসে, মিলিয়ে যায়। অনেক দিনের ভুলে যাওয়া কতো মুখ আসছে। তিনি বোধহীন

দর্শকের মতো শুধু দেখে যাচ্ছেন...

৩.

'নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে
আমার লুকায় বেদনা অধরা অশ্রুনীরে
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে...'

দিনরাত্রি তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে সুর খেলা করে, অথচ গলায় সুর নেই। সবার থাকে না। কিন্তু গান শুনতে বা ভালোবাসতে নিজের গলায় সুর না থাকলেও চলে, কোনো ঊনিশ-বিশ হয় না। এই অন্ধকারে রবির পাশে রিকশায় বসে যখন বুকের তীব্র ব্যথার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে, সেই সময়েও এবারক হোসেনের মাথার ভেতরে তাঁর প্রিয় কবির গান বেজে যায়।

হাজীপাড়া ছাড়িয়ে রিকশা কানচগাড়ির রাস্তায় উঠেছে। হাতের ডানে একটি ছোটো একতলা বাড়ির দিকে চোখ পড়ে এবারক হোসেনের। কোনো আলো নেই বাড়িতে, ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তার অন্ধকার বাড়িটিকে আরো ভুতুড়ে চেহারা দিয়েছে। বাবুদের বাড়ি। সাতমাথায় সপ্তপদী মার্কেটে দোকান আছে বাবুর। আলাপ-পরিচয় তেমন ছিলো না। এক বিকেলে এই রাস্তায় হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন এবারক হোসেন। আকাশ গাঢ় মেঘলা, এই বাড়ির সামনে আসতেই ঝেঁপে বৃষ্টি নামে। গা বাঁচাতে বাবুর বাড়ির বাইরের বারান্দায় গিয়ে উঠেছিলেন, বৃষ্টি থামলে চলে যাবেন। একটা খালি রিকশা পেলেও উঠে পড়া যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিলেন, এইসময় হঠাৎ তাঁর পেছনে দরজা খুলে যায়। তাকিয়ে দেখেন, ছোট্টো একটি বাচ্চা মেয়ে, বছর ছয়-সাতেকের হবে, দরজায় দাঁড়িয়ে। আধা-চেনা কারো বাড়ির বারান্দায় উঠে একটু অস্বস্তি হচ্ছিলো, এখন দরজা খুলে যেতে তা আরো বাড়ে। মেয়েটি অসংকোচে বেরিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে ফেলে, ভেতরে এসে বসো, দাদু। বৃষ্টিতে ভিজে যাবে যে! বাবুরই মেয়ে হবে। একটু ইতস্তত করছিলেন, মেয়েটি একরকম টানতে টানতেই ভেতরে এনে তাঁকে বসিয়েছিলো। খানিক পরে ওর মা এলে জানা যায়, মেয়েটিকে দাদু ডাকতে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। ও যে দরজা খুলে কাউকে ঘরে নিয়ে বসিয়েছে, ভেতরে কেউ জানেও না। মায়া পড়ে গিয়েছিলো, সেদিনের পরে আরো অনেকবার এসেছেন এ বাড়িতে। বাচ্চা মেয়েটি কী সুন্দর পুটপুট করে কথা বলে! আজ রিকশায় বসে ওদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে এবারক হোসেন মনে মনে বললেন, চলি রে দাদু, আর দেখা হবে না!

রিকশা শেরপুর রোডে উঠে এলে রাস্তায় আলো দেখা যায়। ছোটো শহরের রাস্তার মলিন আলোয় এবারক হোসেনের কাছে সবকিছু বড়ো অবাস্তব লাগে। এই যে রবি ছেলেটি তাঁকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে, এর সঙ্গে কি তাঁর যাওয়ার কথা ছিলো? রবিকে এই সেদিনও চিনতেন না। তরুণ ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ সরকার, স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে বদলি হয়ে এসেছে। ভাড়া বাড়ির খোঁজে এসেছিলো, তখন এবারক হোসেন নিচেরতলার বাড়তি ঘর দুটো ভাড়া দেবেন ঠিক করেছেন। ঘর দুটো প্রয়োজনের তুলনায় ছোটো বলে রবি কাছাকাছি অন্য বাসা নিয়েছিলো। ক'দিন পরে আবার রবি এসে হাজির। বলে, বাসা পছন্দ না হলেও দাদু আর দিদাকে খুব পছন্দ হয়েছে। সেই থেকে ঘরের মানুষ হয়ে উঠলো রবি আর তার বউ ছায়া। দু'জনকে তিনি রবিচ্ছায়া বলে ডাকেন। শুধু ঘরের মানুষ হয়ে থাকলো না সে, দাদু-দিদার ডাক্তারিও সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলো। ব্লাড শ্যুগার দেখা, হার্ট চেক-আপ করানো তাগিদ দিয়ে দিয়ে সে-ই করাতে থাকে। এবারক হোসেন বরাবর খানিকটা চিকিৎসাবিমুখ, কখনো কখনো রবির অবাধ্য হওয়ারও চেষ্টা করেছেন। সেইসব সময়ে রবি একেবারে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেললে এবারক হোসেন নিরুপায় হয়ে পড়েছেন।

এই শেষ যাত্রায় এবারক হোসেনের সঙ্গী যে মানুষটি, তার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই। ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-পরিজন কে কোথায়, কেউ এখনো জানেও না তিনি চলে যাচ্ছেন। ভাগ্যের লিখন? না হলে আর কী, জোহরা বেগমও এই সময়ে পাশে নেই। সারা জীবনভর যখন যেখানে গেছেন, দু'জন একসঙ্গে। বেড়ানো, দেশ দেখার নেশা তাঁর চিরদিনের, রিটায়ার করার পর সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, নেপাল ভুটান বেড়াতে গেছেন। দিল্লী-আগ্রা-জয়পুর-কলকাতা-দার্জিলিং মিলিয়ে ইন্ডিয়াতে অনেকবার। তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলেন, শত শত বছর পরেও মানুষের কীর্তি কী গৌরবে দাঁড়িয়ে আছে! সোভিয়েত ইউনিয়নে গেছেন ছোটো ছেলের কাছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও অখণ্ড। লেনিনগ্রাডে গিয়ে মনে হয়, এই দেশের মানুষগুলো পৃথিবীতেই স্বর্গ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলো। আমেরিকায়ও দু'বার যাওয়া হয়েছে বড়ো ছেলের কাছে। নায়াগ্রা ঘুরে এসে ছেলের বউকে বলেছিলেন, জানো মা, পূর্ণিমার রাতে জলপ্রপাতের ওই অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য দেখে মন ভরে গেলো। এমন সুন্দর কোনোকিছু আমি জীবনে দেখিনি। মনে হচ্ছিলো, এখন আমার মরে যেতে একটুও দুঃখ হবে না।

সবসময় সবখানে দু'জনে একসঙ্গে ছিলেন, আজই আলাদা হতে হলো! এই তবে বিচ্ছেদের শুরু?

বুকের ব্যথাটা অসহ্য হয়ে উঠেছে এখন, খানিক পরপরই একেকটা দংশন আসছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মুখ খুলে হাঁ করে শ্বাস নিতে হচ্ছে। কোনোমতে বললেন, হাসপাতাল পর্যন্ত বোধহয় যাওয়া যাবে না, রবি।

রবি নিজেও খুব একটা ভরসা পায় না। তবু বলে, এই তো এসে গেছি, দাদু। পৌঁছে গেলেই আর ভয় নেই।

রবির মুখে ঘুরে তাকিয়ে এবারক হোসেনের একটা অদ্ভুত কথা মনে এলো, শেষ যাত্রায়ও তাঁর সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ! রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে তাঁকে এই দুয়ারটুকু পার হতে হবে!

৪.

রবির সঙ্গে এবারক হোসেন চলে যাওয়ার পরে জোহরা বেগম কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। দিনের বেলা হলে পায়ে হেঁটেই হাসপাতালে চলে যাওয়া যেতো, খুব বেশি দূরের পথ নয়। মজিবর গেছে রিকশা খুঁজতে, এখনো ফেরেনি। তিনি ওপরতলায় উঠে অসীমদের দরজায় টোকা দিলেন। ওরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আরো জোরে ধাক্কা দিলেন এবার, লজ্জা-সংকোচের সময় নয় এখন। আরো বার দু'তিনেক ধাক্কা দিতে ঘুমচোখে দরজা খুলে দেয় রীতা। জোহরা বেগমের ভেজা চোখ দেখে কী বুঝলো, কে জানে। বললো, কী হয়েছে? কাকার শরীর...

রবির সঙ্গে হাসপাতালে গেলো একটু আগে।

মজিবর ফিরলো রিকশা নিয়ে। শব্দ পেয়ে জোহরা বেগম নিচে নেমে এলেন। মজিবর তাঁকে একা কিছুতেই ছাড়বে না, সে-ও উঠে আসে রিকশায়।

এবারক হোসেনকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। জোহরা বেগম কাছে আসতেই তাকিয়ে দেখলেন একবার। বড়ো ক্লান্ত লাগে তাঁর, ঘুম পায়। অথচ বুকের ভেতরের ক্রমাগত অসহ্য দংশন তাঁকে জাগিয়ে রাখে। হাত বাড়িয়ে জোহরা বেগমের একটা হাত তুলে নিলেন। *'আজি কোনোখানে কারেও না জানি / শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে...'*। *'মুখের পানে তাকাতে চাই, দেখি দেখি দেখতে না পাই...'*।

এবারক হোসেন চোখ বুজলেন। ভেবে রেখেছিলেন, *''আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা ব'লে / যাব আমি চলে'*।

হলো না। হয় না, তা-ও জানাই ছিলো।

পৃথিবীর দুই কন্যাসন্তান

রানু ফেরদৌস

বিরক্তিকর শব্দগুলোকে অনেকক্ষণ উপেক্ষা করেছি। কিন্তু নাছোড়বান্দা কেউ একজন, আমাকে তার চাই-ই। শেষমেষ ফোনটা ধরলাম। হ্যালো রেবা... গাডার স্বরে উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে। ও জানতে চায় সবকিছু ঠিক আছে কিনা। কেন আমি মেয়েকে নিয়ে পার্কে যাচ্ছি না? ব্যস্ত থাকায় ওকে বললাম, হ্যাঁ আজ আসছি পার্কে। তখন কথা হবে। দ্রুত ফোন রেখে দেই।

অবশেষে দীর্ঘ শীতের খোলস ছেড়ে প্রকৃতি বেরিয়ে পড়েছে। বসন্তের আমেজে চারদিকে সাজসাজ রব। গাছে গাছে নতুন পাতার বাহার, রঙ-বেরঙের নতুন ফুলের সমাগম। স্কুল-ফেরত বাচ্চাদের বায়না মেটাতে মা-বাবাকে হিমশিম খেতে হয়। আর ঘরে নয়, বাইরে চলো, পার্কে চলো। আমিও আমার ছয় বছরের মেয়েকে নিয়ে প্রায় রোজ বিকেলে বের হই। কখনও বড় পার্কে, কখনো ছোট পার্কে নিয়ে যেতে হয়। কালকাকলিতে মেতে ওঠে অন্য বাচ্চাগুলোর সঙ্গে।

মেয়েকে নিয়ে গত তিনদিন আমার পার্কে যাওয়া হয়নি। স্বভাবতই মেয়ে আমার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। টিভি, কম্পিউটার গেম, দাবার গুটির চাল–কোনোটিই কাজে আসছে না। আজও বের হব কি হব না–কিছুটা দোমনা ছিলাম, তখনই গাডার ফোন এল।

এমন হয় আমার মাঝেমধ্যে। কোথাও যাওয়া হয় না। ভালো না-লাগার মাপকাঠি বাড়তে বাড়তে যখন সীমা ছাড়ায়, তখন এমনটি হয়। এই জীবনযাপন ও অনেককিছুই অর্থহীন, অসাড় বলে ভ্রম হয়। তখন বারান্দাবিহীন এই বাড়িটির জানালাগুলি আমাকে সারাদিনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেয়। বাইরের পৃথিবী ও প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি দৃষ্টিপথে। দৃষ্টি দিগন্ত মেলে আকাশের নীল পর্যন্ত। কাঠবেড়ালির হুটোপুটি, কবুতরের দানা সংগ্রহ, মেয়েদের ছবি আঁকা–এসব দেখতে দেখতে কখন যেন মন ভালো হতে শুরু করে। বিষাদ মুছে স্বাভাবিকতা ফিরে পাই।

বিশেষভাবে রান্নাঘরের জানালাটির সঙ্গে আমার পরম বন্ধুত্ব। নিত্যদিনের অভ্যাস বলা যায়, রান্নাঘরে ঢুকে প্রথমেই দৃষ্টি ছড়াই বাইরে। ফুলবাগান, প্রতিবেশীর হেঁটে যাওয়া, কুকুরপ্রেমীদের মাতামাতি, অফিস-ফেরত কিছু লোকজনের আসা-যাওয়া--সব এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

গাডার সঙ্গে পরিচয়ের আগে এই জানালাপথেই আমি ওকে প্রথম দেখতে পাই। সামনের খোলা চত্বরের ওধারে যেখানে কয়েকধাপ সিঁড়ি নিচে নেমেছে অথবা উপরে

উঠেছে, ঠিক ওখান থেকেই একটি মাথা উপরে উঠতে উঠতে একসময় একজন স্কার্ট টপ পরিহিত পুরো মানুষে রূপান্তরিত হল যেন। ওকে সবসময় স্কার্ট টপ পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। আবিষ্কার করি ওর সমস্ত স্কার্টের লেন্থও সমান মাপের। গোড়ালি থেকে উপরদিকে এক-বিঘত পরিমাণ পা দেখা যায়। পা দুটো মোটেই সুদৃশ্য নয়, খানিকটা মোটা-গোবদা টাইপের। অফিস-ফেরত ওর এক-কাঁধে থাকে ঝুলন্ত ভ্যানিটি ব্যাগ। অন্য হাত কখনো খালি, কখনো বা পেটমোটা দু-একটি গ্রোসারি ব্যাগ বহণ করে। খেয়াল করি কোনো তাড়াহুড়ো নেই, ধীরগতিতে সমান পদক্ষেপে এগিয়ে এসে চত্বরটা পার হয়ে ডানদিকে মোড় নেয় এবং কয়েক-মুহূর্তেই আমার দৃষ্টিসীমার আড়াল হয়ে যায়।

জানালাপথে ওকে দেখে-দেখে ওর সম্বন্ধে আমার ধারণা হয় এরকম–ও একটা ছিমছাম পরম নিশ্চিন্ত সুখী জীবনযাপন করে। ও অনেক ধের্যশীল–এও আমার মনে হয়।

আমি আমার কথা ভাবি। আমি নানারকম পোশাক পরিধান করি। কিছুটা ধীরস্থির প্রকৃতির হলেও কখনও বা চঞ্চল। অমন এক সমান তাল আমার ভেতরে নেই। ঐ সিঁড়িগুলো আমিও ব্যবহার করি। তবে লাফিয়ে লাফিয়ে পার হতে পছন্দ করি। তাড়া থাকলে দ্রুত হেঁটে বা মৃদু দৌড়ে চত্বর পার হই।

ছোট পার্কেই ওর সঙ্গে একদিন প্রথম পরিচয়। ওর মেয়ে আর আমার মেয়ে, প্রায় সমবয়সী। গাডা আদতে পিরামিডের দেশ মিশরের মেয়ে। তিন-বোনের ভেতরে ও হচ্ছে মধ্যমটি। নয় বছর বয়সে এদেশে এসেছে, এখন বয়স একচল্লিশ।

এরপর সুন্দর আবহাওয়ার দিনগুলিতে রোজই প্রায় আমরা পার্কে যাই বাচ্চাদের নিয়ে। আমাদের আলাপের পরিধি ও বিস্তৃতিও সমানতালে বাড়তে থাকে। মাঝে মাঝে পার্কে আরো দুটি বাচ্চা আসে। একটি আমেরিকান-ফিলিপিনো বাবা-মায়ের সন্তান অন্যটি আমেরিকান সিঙ্গেল মায়ের সুদূর চীনদেশ থেকে আনীত পালিত সন্তান। আশ্চর্য! আমাদের সবারই কন্যাসন্তান এবং এদের বয়স প্রায় কাছাকাছি। কাজেই এদের বন্ধুত্ব জমে চূড়ান্ত। ওদের মহাআনন্দে মায়েদের মুখেও আনন্দ-স্বস্তির রেখা ধরা দেয়। তবে গাডার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে।

গাডা প্রতিমুহূর্তে মেয়েকে নিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকে। মেয়েটি প্রচণ্ড চঞ্চলপ্রকৃতির। এমন ধীরস্থির স্বভাবের মায়ের মেয়ে হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি চঞ্চল মেয়েকে কিছুটা বাগ মানাবার উদ্দেশে পাতা সারাক্ষণই তটস্থ। গাডার হাঁকডাকে খুব-একটা কাজ হয় বলে মনে হয় না।

যখন অন্যরা আসে না, শুধু আমি আর গাডা বাচ্চাসহ পার্কে আসি, তখন আমাদের আলোচনা হয় কিছুটা পারিবারিক, ব্যক্তিগত, স্বামী-সন্তান, মা-বাবা, ভাইবোন--সবই অন্তর্ভূক্ত হয় এতে। খুব আপনজনের মতো আমরা একে অপরের সুখ-দুঃখের দিনপাত নিয়ে কথা বলি। গাডা নির্দ্বিধায় বলে, দেখ না কী চঞ্চল, অস্থিও, বেয়াদব আমার মেয়েটি। ওকে নিয়ে কী করব ঠিক বুঝতে পারি না। বাবাহীন মেয়েদের এমন অবস্থা

হওয়াই স্বাভাবিক, একা সামলে নিতে হিমশিম খাচ্ছি।

সুযোগ বুঝে প্রশ্ন ছুড়ে দেই, ওর বাবা কোথায় বা কী হয়েছে? ও জানায়, বছর-তিনেক আগে ছাড়াছাড়িপর্ব সমাধা হয়েছে। এখন মা ও ছোটবোনকে নিয়ে ওর নিজের সংসার। গাডার বাবা নেই, গত হয়েছেন কয়েক বছর হল। ওর বাবা ছিলেন ডাক্তার। তিনটি মেয়েকে নিয়ে ওদের ছিল চমৎকার সাজানো সংসার।

ও বলে যায়, জানো আমার বাবা ছিল অত্যন্ত ভালো মানুষ। সংসারে আমার মায়ের সম্মান ছিল ঈর্ষণীয়। মা একসময় খুব সুখী মানুষ ছিল, অথচ এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের কারণে তার সুখের অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে।

কি রকম?

এই আমাদের দুই বোনের বিয়ের পরেই সব যেন গরবর হয়ে গেল। মিশর থেকে পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে আমাদের দুই বোনের বিয়ে হল। বিয়ের অনুষ্ঠানও করা হল মিশরে, আত্মীয়স্বজনসহ মহাধুমধামে। স্বামীদেরকে ইমিগ্র্যান্ট করে একসময় নিয়ে এলাম এদেশে। কী দুর্ভাগ্য দেখ, দুটি বোনের কপালেই জুটল স্বামীদ্বারা নির্যাতন, পদে পদে অপমান লাঞ্ছনা। ধীরে ধীরে গায়ে হাত তোলা শুরু করল। এসব একসময় রোজকার ঘটনায় পরিণত হয়। নিজেকে ঘৃনা করতে শুরু করলাম। নিজের দোষক্রুটি খুঁজে বের করা, সংশোধনের চেষ্টা করা–কোনোটা বাদ রাখিনি।

ওর চোখে জল চিকচিক করে, কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে।

পারলাম না, বের হয়ে এলাম সংসারের বাঁধন ছিঁড়ে। একলা চলার পথটি বেছে নিলাম। কিন্তু আমার বড়বোনটি তিনটি সন্তানের জননী এখন। ও আমার মতো পারেনি, প্রতিনিয়ত শারীরিক-মানসিক নির্যাতন ওর সহসাথী। কপাল-লিখন বলে সংসার আঁকড়ে বেঁচে আছে। আমাদের দুই বোনের মোট তিনটি কন্যাসন্তান, ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি শঙ্কাহীন দিন কাটাতে পারি না এখন আর। দুর্ভবনা সারাক্ষণ ঘিরে রাখে আমায়।

যেন আশ্চর্য হয়ে পৃথিবীর হাজার মেয়ের প্রতিদিনের দিনযাপনের গল্প শুনি আমি। এক্ষেত্রে মিশর, বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশের মেয়েদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না আর।

খুব কৌতুহল নিয়ে গাডা একদিন প্রশ্ন করে, তোমার স্বামী কেমন লোক? সংক্ষিপ্ত জবাব দেই– বেশ ভালো। আমার উত্তর শুনে ও বলে, তুমি তাহলে খুব লাকি মেয়ে। মেয়েদের স্বামী ভালোলোক হলে পৃথিবীটাই বদলে যায় তাই না?

অবশ্যই। বলে সায় দেই আমি।

আমার জবাব শুনে ও খুশি হয় নাকি হতাশ হয় কিছু বোঝা যায় না। বলে, তাহলে তুমি খুব-একটা বুঝবে না আমাদের মতো মেয়েদের প্রকৃত অবস্থা।

এ সময় আমার আর চুপ থাকা হয় না। শুরু করি, কেন বুঝব না? এই দেখ না আমার ছোটবোনটি, ওরও একইরকম অবস্থা। সংসার সন্তান স্বামী আঁকড়ে বেঁচে থাকাটাই যার

সুখের চাবিকাঠি। সেই মেয়ে সংসারে কোণঠাসা অবহেলিত মূল্যহীন একটা মানুষ। যখন-তখন লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, নির্যাতন ওর জীবনের নিত্যসহচর। তোমার মতো সংসারচক্র ছিন্ন করার ইচ্ছা বা সাহস কোনোটি ওর নেই। ভীষণ নিরূপায় বোনটি আমার।

আমি একটার পর একটা ঘটনা বলে যাই। আমি যখন থামি ও তৎক্ষণাৎ শুরু করে। ওর ঘটনা, ওর বোনের ঘটনা, আমার বোনের ঘটনা ক্রমান্বয়ে সার বেঁধে এগোয়, যেন মহা-উপাখ্যান। আমরা আমাদের দুঃখ-ব্যথা ভাগাভাগি করে কিছুটা স্বস্তিও পাই। বন্ধুত্বের মাত্রা বেড়ে যায় দিন দিন। ওর মা প্রায়ই কোনো মিশরীয় খাবার রান্না করে আমাকে পাঠায়। প্রচণ্ড ভালো লাগে আমার। পাশাপাশি নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে, মন খারাপ হয়। কতদিন মায়ের হাতের রান্না খাওয়া হয়নি! পাশে বসে দুটো কথা বলা হয়নি!

হিসেব করে চমকে উঠি। কতবছর এদেশে এসেছি! মা হয়েছি। সেই তরুণী-মেয়েটি এখন একজন ভারিক্কি মায়ে রূপান্তরিত হয়েছি। আজ পর্যন্ত মেয়েকে নিয়ে দেশে যাবার সুযোগ হয়নি। আদৌ কবে হবে–কেউ আমরা জানি না।

কিছুক্ষণ আগেই জানালাপথে অফিস-ফেরত গাডাতে দেখেছি। চত্বরটি পার হচ্ছে সেই সমান তালে, ধীরপদক্ষেপে। ঘরে ফিরে চা-পর্ব শেষ করেই বোধহয় আমাকে ফোন করেছে।

ঘড়ি দেখে দ্রুত হাতের কাজ শেষ করি। আমার মেয়ের অবয়বে খুশির মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। আর মেয়ের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হই, বলো তো মা আজ কে কে পার্কে আসবে, সবাই আসবে তো? নাকি...

আমার আগেই মেয়েসহ গাডা হাজির হয়েছে পার্কে। সোনালি রোদ ও মৃদু বাতাসে আজ চমৎকার বিকেল। পার্কে ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক বিস্ময়ে। যেন জানতে চায় কী কী হয়েছে আমার? ও হঠাৎই প্রশ্ন করেঃ এই যে রেবা তোমার বোন কেমন আছে? তার খবর কী?

শব্দহীন ক্লিষ্ট হেসে আমি ওকে জানাই, আমার কোনো বোন নেই। আমি একা। গাডার কণ্ঠে তখন অবাক বিস্ময়। তোমার কোন বোন নেই? আমাকে সান্তনা দেবার উদ্দেশ্যেই মিথ্যে গল্প বলেছ এতদিন?

না, না, গল্পগুলো মিথ্যা ছিল না, আমার জীবনেরই ঘটনা।

আমি বুঝতে পারি আমার চোখ-মুখ বসে যাওয়া বিরস চেহারা ও কপালের একপাশে কালো দাগের স্পষ্ট আভায় ওর চোখ আটকে আছে।

এরপর আমরা পৃথিবীর দুই কন্যাসন্তান পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ বড় নিঃশব্দে।

জীবন ও সংগ্রাম : শহীদ জননী জাহানারা ইমাম

লুৎফর রহমান রিটন

জুডু ওরফে জাহানরা ইমামের জন্ম ১৯২৯ সালের ৩রা মে। মুর্শিদাবাদ জেলার সুন্দরপুর গ্রামে। ত্রিশ ও চলি-শের দশকের রক্ষণশীল বাঙালি মুসলমান পরিবার বলতে যা বোঝায়, সে রকম একটি পরিবারেই জুড়ু জন্মেছিলেন। নানী, ছোট ফুপু আর সুন্দরপুর গ্রামের এক মহিলার কাছে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় রূপকথা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, রাজা-রাণী, রাজপুত্তর আর রাজকন্যের গল্প শুনতে শুনতে, পুকুরে সাঁতার কাটতে কাটতে বেড়ে ওঠে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে জুড়ু।

জুড়ু'র বাবা সৈয়দ আবদুল আলী ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক। কিন্তু জুড়ুর দাদাজান সেকালের আলেমদের মতোই বিশ্বাস করতেন যে মেয়েদের বাংলা লেখাপড়া শেখানো রীতিমতো গুনাহ্‌র কাজ। আর সে কারণেই তাদের বাড়ির মেয়েদের কেবলমাত্র কোরান শরীফ রিডিং পড়তে শেখানো হতো। আর কিছু নয়। খুব গোপনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা জুড়ুর মা সৈয়দা হামিদা বেগমকে বাংলা পড়া ও লেখা শিখিয়েছিলেন। দাদাজানের কাছে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়লে এই 'নাফরমানী' কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। স্ত্রীকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন সমস্ত পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে।

জুড়ুর প্রধান আশ্রয় ছিলো বই। নভেল। বাড়িতে কলের গান ছিলো। আর ছিলো হারমোনিয়াম। সপ্তাহে দুদিন গানের মাস্টার এসে গান শিখিয়ে যেতেন। এ সময় জুড়ুর সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা ছিলো মাস্টার দিয়ে ঠাঁসা। একজন মাসলা-মাসায়েল শরা শরীয়তে হেদায়েত করেন তো আরেকজন আসেন উর্দু পড়াতে। পাঠ্য বইয়ের মাস্টার তো আছেনই। দুরন্ত কিশোরী জুড়ুর জীবনটা বন্দিনী রাজকন্যের জীবনের মতো হয়ে উঠলো। এ সময় জুড়ুর জীবনে বিনোদন বলতে শুধু কলের গান। জুড়ুর বাবা হিজ মাস্টারস ভয়েস-এর চকোলেট কালারের একটা গ্রামোফোন রেকর্ড কিনে আনবার পর আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, হরিমতী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কমলা ঝরিয়া, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, কনক দাস, শাহানা দেবী, যুথিকা রায় হয়ে উঠলেন বিনোদনের সঙ্গী।

শিক্ষা জীবন

জাহানারা ইমাম মাট্রিক পাস করেন ১৯৪২ সালে। ১৯৪৪ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে আই.এ পাস করে ১৯৪৫ সালে ভর্তি হন কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে বি.এ পাস করেন ১৯৪৭ সালে। ১৯৬০ সালে বি.এড ডিগ্রি অর্জন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৬৪ সালে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে ১৯৬৫ সালে বাংলায় এম.এ পাস করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

কর্ম জীবন

জাহানারা ইমামের কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতার মাধ্যমে। ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুল, ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলসহ তিনটি স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন টানা ১৪ বছর। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ এই দু'বছর অধ্যাপনা করেন ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে।

লেখক জাহানারা ইমাম

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে লেখক জাহানারা ইমামের আত্মপ্রকাশ। প্রথমে তাঁর পরিচয় ছিলো একজন শিশু সাহিত্যিক হিসেবে। ছোটদের জন্যে খুব প্রয়োজনীয় কয়েকটি বই তিনি অনুবাদ করেন। বইগুলো পাঠকসমাদৃত হয়। তবে 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনা করে তিনি পৌঁছে যান পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে।

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় লিটল হাউস সিরিজের অনুবাদ 'তেপান্তরের ছোট্ট শহর'। একই সিরিজের 'নদীর তীরে ফুলের মেলা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। রূপকথা 'সাতটি তারার ঝিকিমিকি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। দ্য টাউন- এর অনুবাদ 'নগরী' প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে, যার মূল লেখক কনরাত রিকটর। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় কিশোর উপন্যাস 'গজ কচ্ছপ'। বিদেশীদের বাংলা শেখার বই 'এন ইনট্রুডাকশন টু বেঙ্গলী' প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে। শৈশব এবং যৌবনের স্মৃতিকথা 'অন্য জীবন' প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় সাতজন বীরশ্রেষ্ঠকে নিয়ে জীবনীগ্রন্থ 'বীরশ্রেষ্ঠ'। ডায়রি আকারে লেখা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভয়াল দগ্ধ অবিস্মরণীয় স্মৃতিকথা 'একাত্তরের দিনগুলি' প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। এই গ্রন্থটির কারণে দেশে-বিদেশে ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করেন জাহানারা ইমাম। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোটগল্পের বই 'জীবন মৃত্যু' প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয় একাত্তরে দিনগুলির কিশোর সংস্করণ 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি'। শেক্সপীয়রের ট্রাজেডির কিশোর সংস্করণ 'চিরায়ত সাহিত্য' প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর উপন্যাস 'বুকের ভিতর আগুন'। বয়স্কজনপাঠ্য উপন্যাস 'নাটকের অবসানে', 'দুই মেরু', 'নিঃসঙ্গ পাইন' এবং 'নয় এ মধুর খেলা' প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয় আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'ক্যান্সারের সাথে বসবাস'। ১৯৯০ সালে একাত্তরের দিনগুলির ইংরেজি অনুবাদ 'অব ব-াড এন্ড ফায়ার' প্রকাশিত হয়। ডায়রি আকারে লেখা স্মৃতিকথা 'প্রবাসের দিনলিপি' প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে।

সংসার জীবন এবং লেখক জীবনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে জাহানারা ইমাম নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। সাংবাদিকতার সংগেও যুক্ত ছিলেন। কলাম লিখতেন দৈনিক বাংলায়। টিভি সমালোচনা লিখেছেন সাপ্তাহিক বিচিত্রায়। টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করে দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন মিষ্টভাষী সুদর্শনা জাহানারা ইমাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে অর্থাৎ পাকিস্তান টেলিভিশনে প্রায় নিয়মিতই টিভি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন; কিন্তু স্বাধীনতার

পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করেননি।

১৯৯০ সালে সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাহানারা ইমাম অর্জন করেন বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার।

পরিবারের সদস্যরা

সাত ভাইবোনের মধ্যে জাহানারা ইমাম সবার বড়। এক ভাই সৈয়দ ওবায়েদুল আকবর ১৯৬৪ সালে মারা যান। অপর দুই ভাই প্রকৌশলী সৈয়দ মহিউদ্দিন আহমেদ এবং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট সৈয়দ মোস্তফা কামাল যথাক্রমে কানাডা এবং লন্ডনে বসবাস করছেন। জাহানারা ইমামের ছোট তিন বোন তাহমিদা সাঈদা, শামসুন্নাহার আজিজ এবং উম্মে সালমা চিশতি পরিবার পরিজন নিয়ে ঢাকায় বসবাস করছেন।

জাহানারা ইমামের বাবা সৈয়দ আবদুল আলী মৃত্যুবরণ করেছেন ১৯৬৬ সালের ৬ মে। মা সৈয়দা হামিদা বেগম ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে মৃত্যুবরণ করেছেন স্টমাক ক্যান্সারে।

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় ১৯৫১ সালের ২৯ মার্চ জাহানারা ইমামের কোলজুড়ে আসে শাশী ইমাম রুমী। এই রুমীই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন দুঃসাহসী গেরিলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করে শাহাদৎ বরণ করেন। স্বাধীনতার পর শহীদ রুমী বীরবিক্রম (মরণোত্তর) উপাধিতে ভূষিত হন। প্রাণপ্রিয় সন্তান রুমীকে ঘিরেই জাহানারা ইমাম রচনা করেন অমর গ্রন্থ 'একাত্তরের দিনগুলি'।

জাহানারা ইমামের স্বামী শরীফ ইমামকেও পাকিস্তানী হানাদাররা নির্মম নির্যাতন করে আহত অবস্থায় মুক্তি দেয়। বিজয়ের মাত্র দুদিন আগে শরীফ ইমাম ইন্তেকাল করেন। জাহানারা ইমামের জীবিত একমাত্র সন্তান সাইফ ইমাম জামীর জন্ম ১৯৫৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর। জামী বর্তমানে বিদেশিনী স্ত্রী ও দুই কন্যাসহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

রাজনৈতিক জীবন

একাত্তরেরর মুক্তিযুদ্ধ কেড়ে নিলো তাঁর বুকের মানিক রুমীকে। প্রিয়তম স্বামী শরীফকে। পুত্র এবং স্বামী হারানোর কষ্টকে বুকে ধারণ করে বেঁচে ছিলেন তিনি। আশির দশকের শুরুতে, ১৯৮২ সালে তিনি আক্রান্ত হলেন দুরারোগ্য ব্যাধি ওরাল ক্যান্সারে। প্রতি বছর একবার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হতো তাঁকে। এভাবেই যাচ্ছিলো তাঁর দিন। মুখের ক্যান্সার কেড়ে নিয়েছিলো অপরূপ লাবণ্যময়ী এই নারীর মুখশ্রীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য।

মরণব্যাধি ক্যান্সারের সংগে লড়াই করতে করতে অন্য আরেকটি লড়াইয়ের জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন জাহানারা ইমাম। বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের লোভ এবং

অদূরদর্শিতার কারণে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র একাত্তরের ঘাতক দালাল রাজাকার আলবদরদের ক্রমশঃ উত্থান তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিলো। ধর্মান্ধ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী- মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির এই উত্থানকে রুখে দিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন জাহানারা ইমাম, আশ্চর্য সাংগঠনিক দক্ষতায়। মাতৃত্ব থেকে অবলীলায় তিনি চলে এলেন নেতৃত্বে।

১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর একাত্তরের চিহ্নিত নরঘাতক গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামী তাদের দলের আমীর ঘোষণা করলে সচেতন দেশবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিলো সেই নাগরিকত্বহীন গোলাম আযমকে প্রকাশ্যে দলের আমীর ঘোষণা করা– একটি স্বাধীন দেশের জনসাধারণের স্বপ্ন-বিশ্বাস অস্তিত্ব এবং আবেগের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের শামিল। এই ধৃষ্টতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি ১০১ সদস্যবিশিষ্ট 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠিত হয় জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে। তিনি হন এর আহ্বায়ক। এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী প্রতিরোধ মঞ্চ, ১৪টি ছাত্র সংগঠন, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক জোট, শ্রমিক-কৃষক-নারী এবং সাংস্কৃতিক জোটসহ ৭০টি সংগঠনের সমন্বয়ে পরবর্তীতে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠিত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন জাহানারা ইমাম। দেশের লাখ লাখ মানুষ শামিল হয় নতুন এই প্ল্যাটফর্মে।

এই কমিটি ১৯৯২ সালে ২৬ মার্চ 'গণআদালত' এর মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একাত্তরের নরঘাতক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক বিচার অনুষ্ঠান করে। গণআদালাতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে দশটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ১২ জন বিচারক সমন্বয়ে গঠিত গণআদালতের চেয়ারম্যান জাহানারা ইমাম গোলাম আযমের ১০টি অপরাধ মৃত্যুদন্ডযোগ্য বলে ঘোষণা করেন। সমবেত লক্ষ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে জাহানারা ইমাম গণআদালতের রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। এই গণআদালতের সদস্য ছিলেন: সর্বজনাব এডভোকেট গাজিউল হক, ডঃ আহমদ শরীফ, স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, বেগম সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, শওকত ওসমান, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) কাজী নুরুজ্জামান, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী এবং ব্যারিস্টার শওকত আলী খান।

গণআদালত অনুষ্ঠিত হবার পর সরকার ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ জাহানারা ইমামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে অজামিনযোগ্য মামলা দায়ের করে। পরবর্তীতে হাইকোর্ট ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করেন। এরপর লাখো জনতার পদযাত্রার মাধ্যমে জাহানারা ইমাম ১২ এপ্রিল ১৯৯২ সালে গণআদালতের রায় কার্যকর করার দাবিসংবলিত স্মারকলিপি নিয়ে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে পেশ করেন। চিন্তায় চেতনায় মননে ও মেধায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালনকারী ১০০ জন সাংসদ গণআদালতের রায়ের

পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করলে আন্দোলনে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। এরপর শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় দেশব্যাপি গণস্বাক্ষর, গণসমাবেশ, মানববন্ধন, সংসদ যাত্রা, অবস্থান ধর্মঘট, মহাসমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে আন্দোলন আরো বেগবান হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ৩০ জুন ১৯৯২ সালে সংসদে ৪ দফা চুক্তি করতে বাধ্য হয়। তবে, এ চুক্তি কার্যকর হয়নি আজও।

২৮ মার্চ ১৯৯৩ সালে নির্মূল কমিটির সমাবেশে হামলা চালায় বিএনপি সরকারের পুলিশ বাহিনী। পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জে আহত হন জাহানারা ইমাম। তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান রাজপথে। সহযোদ্ধারা তাঁকে ধরাধরি করে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যান পিজি হাসপাতালে। ক্যান্সার আক্রান্ত বর্ষীয়ান শ্রদ্ধেয়া জননেত্রী চিকিৎসকদের আন্তরিক সেবায় সেরে ওঠেন।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি বিদেশেও গঠিত হয় নির্মূল কমিটি এবং শুরু হয় ব্যাপক আন্দোলন। পত্র-পত্রিকায় সংবাদ শিরোনাম হয়ে উঠলে আন্তর্জাতিক মহলেও ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করেন জাহানারা ইমাম। গোলাম আযমসহ একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবির আন্দোলনকে সমর্থন দেয় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট। আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে।

২৬ মার্চ ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা দিবসে গণআদালত বার্ষিকীতে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণতদন্ত কমিটি ঘোষিত হয় এবং আরো আটজন যুদ্ধাপরাধীর নাম ঘোষণা করা হয়। এই ঘৃণ্য আটজন যুদ্ধাপরাধীর নাম: আব্বাস আলী খান, মতিউর রহমান নিজামী, মোঃ কামরুজ্জামান, আবদুল আলীম, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মওলানা আবদুল মান্নান, আনোয়ার জাহিদ এবং আবদুল কাদের মোল-া।

২৬ মার্চ ১৯৯৪ সালে স্বাধীনতা দিবসে গণআদালতের ২য় বার্ষিকীতে গণতদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান কবি বেগম সুফিয়া কামাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে রাজপথের বিশাল জনসমাবেশে জাহানারা ইমামের হাতে জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট হস্তান্তর করেন। গণতদন্ত কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেনঃ সর্বজনাব শওকত ওসমান, কে এম সোবহান, সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, অনুপম সেন, দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, খান সারওয়ার মুরশিদ, শামসুর রাহমান, শফিক আহমেদ, আবদুল খালেক এবং সদরুদ্দিন। এই সমাবেশে আরো আটজন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে তদন্ত অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়।

এ সময় খুব দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে ২ এপ্রিল ১৯৯৪ সালে চিকিৎসার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান ডেট্রয়েট হাসপাতালের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন জাহানারা ইমাম। ২২ এপ্রিল চিকিৎসকরা জানান, চিকিৎসার আওতার সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেছেন তিনি। তাঁর মুখগহ্বর থেকে ক্যান্সারের বিপজ্জনক দানাগুলো অপসারণ করা আর সম্ভব নয়। এরপর শুধু অপেক্ষা, মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঢলে পড়ার।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত থেকেও মনোবল হারাননি জাহানারা ইমাম। হাসপাতালের শুভ্র বিছানায় শায়িত থেকেও কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট হাতে ডায়রি লিখতেন। বাকশক্তি হারিয়ে কথা বলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাঁর। এ সময় ছোট ছোট চিরকুট লিখে প্রিয়জনদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চালিয়ে যেতেন। সুলিখিত চিঠিতে গুরত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতেন আন্দোলন বিষয়ে। রসিকতাও করতেন ঐ চিরকুটের মাধ্যমেই। ২২ জুনের পর থেকে শহীদ জননীর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করে।

সব ধরনের খাবার গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসকরা বন্ধ করে দেন ওষুধ প্রয়োগও। কাউকে চিনতে পারছিলেন না তিনি। এমন কি অতি নিকটজনদেরও না। এ সময়, ২২ জুন জামাতীদের খপ্পরে মুঠোবন্দি থাকা বাংলাদেশের সদাশয় গণতান্ত্রিক (!) সরকার কুখ্যাত গণধিকৃত নাগরিকত্বহীন গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব উপহার দেয়। কিন্তু সরকারি এই সিদ্ধান্তের খবরটি জাহানারা ইমাম জানতে পারেননি। তিনি তখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। অচেতন তিনি। অপেক্ষা শুধু মৃত্যুর নির্মম নিষ্ঠুর হিমশীতল স্পর্শের জন্যে।

অবশেষে দেশবাসিকে অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে ২৬ জুন ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় মিশিগানের ডেট্রয়েট নগরীর সাইনাই হাসপাতালের ডেবে ৬৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। শহীদ জননীর মৃত্যু জাতিকে শোকার্ত করে তুললেও অপ্রত্যাশিত ছিলো না তাঁর মৃত্যু সংবাদ। তাঁর মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি ২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত শোক সপ্তাহ এবং ৬ জুলাই জাতীয় শোক দিবস পালন করে।

৪ জুলাই বিকেলে বাংলাদেশে যায় শহীদ জননীর মরদেহ। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শহীদ জননীর লাশ গ্রহণ করেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ৫ জুলাই সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শহীদ জননীর কফিন রাখা হয় জনগণের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে। লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, আইনজীবী, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী, গৃহবধু, মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন পেশাজীবী, সর্বস্তরের জনগণ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহীদ জননীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ থেকে চার বছরের শিশু পর্যন্ত নানা বয়েসী মানুষের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য - ফুলে ফুলে ভরে ওঠে শহীদ মিনারের পাদদেশ। দুপুরে যোহরের নামাযের পর জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর নামাযে জানাযা। জানাযা শেষে শহীদ জননীকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযোদ্ধা গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। এ সময় মুক্তিযুদ্ধের আটজন সেক্টর কমান্ডার শহীদ জননীকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। বিভিন্ন মহল থেকে শহীদ জননীকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করার দাবি উত্থাপিত হলেও তা কার্যকর হয়নি।

বাংলা একাডেমী জাহানারা ইমামকে সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করেছিল। বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য এবং ফেলো হওয়া সত্ত্বেও শহীদ জননীর মৃত্যুর পর জাতির

মেধা ও মননের প্রতীক বাংলা একাডেমী যথাসময়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার সাহস পায়নি।

শহীদ জননীর মৃত্যুর প্রায় দেড় মাস পর বাংলা একাডেমী একটি শোক সভার আয়োজন করেছিলো। শহীদ জননীর ওপর থেকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা প্রত্যাহার না করা হলেও বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে পত্রিকায় বিবৃতি দেন। একজন ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’র মৃত্যুতে সরকার প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রীর এই শোকবাণী নিয়ে সচেতন মহলে ক্ষোভ ও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

নেশার তালিকায় ইন্টারনেট

শামীম তুষার

শেষবার যখন ইন্টারনেটে ঢুকেছিলেন তখন কি ঘটেছিল কিংবা এরপরে যখন ইন্টারনেটে ঢুকবেন তখন কি কি করবেন সেসব নিয়ে কি চিন্তাভাবনা চলতে থাকে আপনার মাথায়?

নিজেকে পুরোপুরি তৃপ্ত করার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের সময়টুকু ধীরে ধীরে বাড়াতে হচ্ছে আপনাকে?

ইন্টারনেট ব্যবহারের সময়টাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, কমিয়ে আনতে বা একেবারে বন্ধ করে দিতে একাধিকবার চেষ্টা করেও কি আপনি সফল হননি?

ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় কমিয়ে আনতে বা বন্ধ করে দিতে চাইলে কি আপনার অস্থির, উৎফুল্ল, বিষণ্ন বা খিটখিটে লাগতে থাকে?

যতোক্ষণ ইন্টারনেটে থাকবেন ভেবে শুরু করেন, তার চেয়ে কি বেশি সময় চলে যায়?

কোনো গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, কাজ, লেখাপড়া বা চাকরির সুযোগ কি আপনি হারাতে বসেছিলেন ইন্টারনেটের কারণে?

ইন্টারনেটের সঙ্গে আপনি কতোটা জড়িয়ে গেছেন সেটা গোপন করার জন্য কি চিকিৎসক, পরিবারের লোকজন বা আরো দশ জনের কাছে আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন?

অপরাধবোধ, দুশ্চিন্তা, হতাশা কমানোর জন্য কিংবা সমস্যা ভুলে থাকার জন্য কি ইন্টারনেট ব্যবহার করেন আপনি?

৫টি বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে আপনি ইন্টারনেট আসক্তিতে ভুগছেন বলে ধরে নেয়া যায়।

আসক্তির জগতে ইন্টারনেট হলো সবচেয়ে আধুনিক সংযোজন। এতো বেশি আধুনিক যে, মনোবিজ্ঞানী আর মনোচিকিৎসকদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব আছে এ আসক্তির অস্তিত্ব নিয়ে। ইন্টারনেট নিয়ে খুব বেশি সময় কাটানো হয়তো সাধারণ মানুষের চোখে একটু অন্য রকম লাগতে পারে। যে লোকটা ইন্টারনেট নিয়েই পড়ে থাকে তার বন্ধু-বান্ধবও কম থাকতে পারে। কিন্তু এতে এমন কি দোষের আছে যে একে নেশা করার পর্যায়ে ফেলতে হবে? আর নেশা বা অ্যাডিকশনের ক্ষেত্রে শারীরিক নির্ভরতার যে বিষয়টা থাকে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর নেশার দ্রব্য না নিলে নানান রকম উপসর্গ দেখা দিতে থাকে—ইন্টারনেট অ্যাডিকশনের ক্ষেত্রে সেসব কোথায়?

এ সমস্ত প্রশ্নের জন্য তৈরি আছেন ডা. কিমবার্লি ইয়ং। আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ-ব্র্যাডফোর্ডের সাইকোলজি বিভাগের এই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর গত প্রায় ৫ বছর ধরে সেন্টার ফর অনলাইন অ্যাডিকশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন এবং ই-মেইলের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ ইন্টারনেট আসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা দিয়েছেন। তার মতে, নেশার মতো ইন্টারনেট ব্যবহার করা এতো নতুন একটা বিষয় যে অধিকাংশ ডাক্তারই এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তাই এর চিকিৎসাও তারা করতে পারেন না। আসলে ইন্টারনেট সম্পর্কেই ভালো ভাবে জানেন না অনেক ডাক্তার। এটা যে কতো বড় নেশা হয়ে দাঁড়াতে পারে তা তাদের মাথাতেই আসে না। একে মনের অসুখ হিসেবে স্বীকারই করতে চান না তারা। কিছু দিন আগে প্রকাশিত স্টুডেন্ট ব্রিটিশ মেডিকাল জার্নাল-এর সম্পাদকীয়তে কথাগুলো লিখেছেন ডা. ইয়ং।

নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাই এবারে ডাক্তার সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা করছেন তিনি। জুয়াড়িদের আসক্তি নির্ণয়ের জন্য আমেরিকায় যে ধরনের মেডিক্যাল টেস্ট প্রচলিত আছে তার ধাচে তৈরি করেছেন ইন্টারনেট অ্যাডিক্টদের জন্য প্রথম মেডিকাল টেস্টের খসড়া। জুয়াড়িদের নেশার ধরণ আর ইন্টারনেট আসক্তিকে মেলানোর পেছনে অবশ্য বেশ কিছু যুক্তিও আছে ডা. ইয়ংয়ের। খুঁজে দেখেছেন তিনি, আদতে এ দুটোই হলো ইমপালস কন্ট্রোল ডিজঅর্ডার। মনের তাগিদ মেটাতেই এখানে সব কিছু করতে বাধ্য হয় মানুষ। কোনো নেশাদ্রব্যের কারণে নয়। জুয়ায় আসক্ত কোনো লোক যেভাবে নির্ঘুম রাত কাটিয়ে একটানা জুয়া খেলে, সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেলে, সেই একই বিষয় ঘটে ইন্টারনেট আসক্তদের ক্ষেত্রেও। কমপিউটার স্ক্রিনের সামনে একটানা বসে থাকে তারা। পিঠ ব্যথা আর চোখ জ্বালা নিয়ে যখন এক সময় বেরিয়ে আসে ইন্টারনেট ছেড়ে, তখন তারা নিজেরাও বলতে পারে না মাঝে কতোটা ঘণ্টা সময় কেটে গেছে।

জুয়াড়িদের সঙ্গে ইন্টারনেট আসক্তদের আরো একটা মিল পাওয়া গেছে ইওরোপিয়ান ইউনিয়ন পরিচালিত এক সাম্প্রতিক গবেষণায়। দেখা গেছে, প্রতিদিন যারা চার ঘন্টা বা তার বেশি সময় ধরে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাদের ডোপামিন নামের রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায় মস্তিষ্কে। জুয়াড়িদের শরীরেও দেখা যায় একই ধরনের পরিবর্তন। অর্থাৎ কেবল মানসিক নয়, শারীরিক রসায়নের দিক থেকেও এ দুটো দল অনেক কাছাকাছি।

ডা. ইয়ংয়ের মেডিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে বোঝা যাবে কারা সত্যিই কাজের জন্য কমপিউটার ব্যবহার করেন আর কাদের কমপিউটার বন্ধ করে দিলে—মন মেজাজ বিগড়ে যায়। ইন্টারনেট আসক্তদের তখন সহজেই চিনতে পারবেন ডাক্তাররা। আর ইন্টারনেট অ্যাডিকশনও স্থায়ী ভাবে জায়গা পাবে মেন্টাল ডিজঅর্ডারের তালিকায়।

ইন্টারনেট আসক্তিকে মানসিক গোলমাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে আসলে আসক্ত লোকদেরই স্বার্থে। দিনের পর দিন বাড়ছে এ ধরনের লোকের

সংখ্যা। বাড়ছে নিজের পরিচয় আড়াল করে রেখে কমপিউটার গ্যাম্বলিং, পর্নো সাইট ভিজিটিং, সেক্স চ্যাটিং বা পর্নোগ্রাফিক ইমেজ ডাউনলোডিংয়ের কাজগুলো। প্রথমে একবার দুইবার তারপর বার বার। কৌতুহল আর সাময়িক উত্তেজনা পরিণত হচ্ছে অভ্যাসে। নিছক শখের বসে যারা নেট সার্ফিং করতো তারা হয়ে পড়ছে ইন্টারনেট অ্যাডিক্ট। এদের অধিকাংশই সাইবার সেক্সুয়াল এবং সাইবার রিলেশনশিপ অ্যাডিকশনে আক্রান্ত। সাইবার পর্নো বা অনলাইন রোমান্সের বাঁধনে বাঁধা। প্রতিদিন অনলাইন ট্রেডিং, অকশন বা গ্যাম্বলিংয়ে অংশগ্রহণের নেট কমপালশনে ভোগে অনেকে। ওয়েব সার্ফিং বা ডাটাবেজ সার্চিং-এর কাজগুলো করে ইনফরমেশন ওভারলোড গ্রুপের আসক্তরা।

আরেক দল আছে যারা ডুম বা সলিটেয়ার-এর মতো কমপিউটার গেমগুলো প্রতিদিনই খেলে নেশার মতো। এটা সাধারণ কমপিউটার অ্যাডিকশন। তবে ইন্টারনেট অ্যাডিকশন যে দলেই পড়ুক না কেন, এদের সবার জীবনেই ডিভোর্স, চাকরি খোয়ানো, ধার-দেনা বা পড়াশোনায় ব্যর্থতা ঘটতে থাকে। নিজেদের হতাশা কাটাতে আরো বেশি করে ইন্টারনেটকে আঁকড়ে ধরে তারা। বাধা দিলে মারমুখী হয়ে উঠতে পারে। এমনি এক ঘটনায় ১২ বছরের এক ছেলে প্রথমে নিজের মাকে গুলি করে খুন করার পর আত্মহত্যা করে। কারণ ছিল সামান্য। তার মা হঠাৎ করেই কমপিউটার কেড়ে নিতে চেয়েছিল তার কাছ থেকে।

মনের গোলমাল হিসেবে ইন্টারনেট অ্যাডিকশনকে স্বীকৃতি দেয়া হলে এ নিয়ে গবেষণা আর চিকিৎসার পথগুলো খুলে যাবে। কোন ধরনের আসক্তির জন্য কি ধরনের চিকিৎসার দরকার তাও পরিষ্কার ভাবে জানা যাবে।

ইন্টারনেট আসক্তি এখন আর পশ্চিমা বিশ্বের কোনো বিত্তবান জনগোষ্ঠীর সমস্যা নয়। দেশ, ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক সঙ্গতি নির্বিশেষে যে কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীই এতে আক্রান্ত হতে পারে। আমেরিকার ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে শতকরা ৬ জন ইন্টারনেট অ্যাডিক্টেড। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, আগামী দশকে গোটা ব্রিটেনে ইন্টারনেট আসক্তের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪ লাখ। এদের অনেকেই হবে ইউনিভার্সিটির ছাত্র। ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটির ১০ শতাংশ ছাত্রই প্রতিদিন গড়ে ২২৯ মিনিট করে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়সী শিক্ষিত এসব তরুণ-তরুণীরাই ইন্টারনেট আসক্তির সবচেয়ে সহজ শিকার হতে পারে।

প্রায় ৩০ হাজার ইন্টারনেট ব্যবহারকারী আছে এখন আমাদের দেশে। এরা সবাই শিক্ষিত। অধিকাংশই কম বয়সের। আমাদেরও কি সাবধান হওয়া উচিত নয়?

রবীন্দ্রনাথের গল্প : নারী প্রসঙ্গ

সাদ কামালী

বান্দার দাসত্বরীতি বান্দাকে বানিয়েছে দাস

সুয়োরানীর মনে তবুও মরণবিষ, তুষের আগুনে অন্তর পোড়ে, কিছুতেই স্বস্তি মিলে না, দুয়োরানীর তিনমহলার বাড়ি হজম করেও না, দুয়োরানী যে নদীর ধারে চাঁপা গাছের ছায়ায় কুঁড়েঘর তুলে অপরাজিতার রূপ আর শঙ্খচক্রের আলপনায় নিবিড় সুখে আছে ! গজদন্তের দেয়াল, মুক্তার ঝিনুকে পদ্মের মালা এবং শঙ্খের গুঁড়ায় সফেদ মেঝের কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলেও সুয়োরানীর মনে সুখ এলো না। দুয়োরানীর মতো কলস কাঁখে জল তুলেও শান্তি হলো না, শালুক ফুল বনের ফল ক্ষেতের শাক তুলে এনে খাওয়ালেও না। সুয়োরানীর মনে মরণকষ্ট। রাজার কাছে অতঃপর তার আব্দার, দুয়োরানীর দুঃখ তার চাই। যে দুঃখের বাঁশিতে বাজবে সুখের সুর। সুয়োরানী তো জানে না পরশ্রীকাতর, ঈর্ষাপর মন নিয়ে সোনার বাঁশীতে ফুঁ দিলেও সুর খেলে না, বরং গলাবিষ করে। নারীকে আধার করে রবীন্দ্রনাথ নীতিগল্প 'সুয়োরানীর সাধ' লিখেছেন ১৩২৭ সালে। ইন্তেকালের বছরে লেখা আরও একটি নীতিগল্প 'রাজরানী'। জনৈক রাজা রানী তালাশ করছেন, কোথায় মিলবে রাজার পছন্দমাফিক রানী ! মন্ত্রী, দূত কারও ওপর তার ভরসা নাই। নিজেই যাচাই বাছাই করে নেবেন। রাজা জানে দূত সকল তোষামোদে অভ্যস্ত, বাড়িয়ে বলার প্রবৃত্তি তাদের জন্মগত। তিনি বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ, সেবক, দূর দেখতে পারেন অর্থাৎ দূরদর্শী, প্রজার অভিভাবক, প্রায় ঈশ্বরতুল্য। দরবেশ-সন্ন্যাসীর সঙ সেজে রাজা বের হলেন, প্রথমেই অঙ্গদেশে। সে-দেশের রাজকন্যা সন্ন্যাসীর কাছে আব্দার করল চোখ-ভোলানো সাজ যাতে রাজ রাজেশ্বরের দিলে-আঁখিতে ধাঁধা লেগে যায়। সন্ন্যাসী জানতে চায় আর কিছুই চাই না ? রাজকন্যার আর কিছুর দরকার নেই। ছদ্মবেশে রাজা গেলেন বঙ্গদেশে। সন্ন্যাসীর নামডাক শুনে রাজকন্যা সন্ন্যাসীকে দর্শন দিয়ে মনের কথা জাহির করে। তার আব্দার এমন কণ্ঠের যার মাদকতায় "কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা..। আমি যা বলা-ই তাই বলেন।"

রাজা গেলেন কলিঙ্গে। কলিঙ্গের রাজকন্যা মন্ত্রণা করছে কী করে কাঞ্চী জয় করে সে-দেশের মহিষীর মাথা হেঁট করে তাকে বাঁদি বানিয়ে পায়ে তেলমর্দনের কাজে লাগিয়ে দেবে। সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে রাজকন্যা তাকে ডেকে পাঠায়, তার আব্দার বেশ জোরালো। রাজকন্যা যাকে বিয়ে করবে "তাঁর পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা

হাতজোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা বন্দিনী হয়ে কেউবা চামর দোলাবে, কেউবা ছত্র ধরে থাকবে।"[১] সন্ন্যাসী পথে বেরিয়ে বললেন, ধিক্। মেকি, স্বার্থপর, হিংস্র, ঈর্ষাতুর নারীর জন্য তার মনে করুণা হলো। মানবীয় নেতি-দুর্বলতা প্রকাশে নারীই বুঝি যোগ্যপাত্র। তবে ওই রাজা চলতে চলতে এক বনে এসে সন্ধান পেয়েছিলেন পর্ণ কুটিরের এক বালিকার, যার হৃদয়ে রয়েছে অকৃত্রিম স্নেহ মমতা, প্রিয়া বা ভগ্নির চিরন্তনী রূপ। অপ্রতুল শাকান্ন আগন্তুকের সাথে ভাগ করে খেতে সে প্রস্তুত।

বাংলা ছোটগল্প শুধু নয়, বিশ্ব সাহিত্যের গল্পের উৎস হিসেবে অনেক পশ্চিমা গবেষকও 'জাতক' 'পঞ্চতন্ত্র'-কে অগ্রে গণনা করে থাকেন। জাতক, পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ ইত্যাদি উত্তমর্ণের কাছ থেকে ইউরোপ গ্রহণ করেছে। ম্যাক্স্ মূলার, বেনফি, কেলার ও কীথ প্রমুখ গবেষক এ-সম্বন্ধে মোক্ষম সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করেছেন। "১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক থিয়োডোর বেনফি, লীপজিগ থেকে পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ করে ইউরোপীয় লোকসাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক ব্যাপক আলোচনা আরম্ভ করেন। অবশ্য অনুবাদ ও আলোচনা আরো পূর্বেই সূচিত হয়েছিল ওরিয়েন্টালিস্টদের হাতে।" "That the migration of fables was originally from East to West and not vice versa — "[২]

সে যাইহোক, এ-প্রবন্ধে সেই বিস্তার খুব জরুরি নয়, এটুকুর উল্লেখ এজন্যই যে রবীন্দ্রনাথও জাতক পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদির উত্তরাধিকার বহন করেন এবং তিনি যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। জাতক পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহের নীতিগল্পসমূহ প্রাণী ও মনুষ্য-ভিত্তিক। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন ওই দু'রকম। ছোটগল্পের ইতিহাস ও সৌন্দর্যতত্ত্বের ওপর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অসাধারণ গ্রন্থ 'সাহিত্যে ছোটগল্প' উৎসর্গ করেছেন 'গল্পগুরু মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে।' সেই গ্রন্থে নারায়ণ উল্লেখ করেছেন, "আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেও জাতকের প্রভাব কতখানি তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। বৌদ্ধ-সাহিত্যের এই মণি-মঞ্জুষা থেকেই তিনি তুলে নিয়েছেন 'কুশ জাতক' গড়ে উঠেছে 'রাজা' 'অরূপরতন' ;*-* 'শ্যামা জাতক' থেকেই জন্ম নিয়েছে 'পরিশোধ' 'শ্যামা'।[৩] এর কয়েক পৃষ্ঠা আগেই নারায়ণ বলছেন, "নীতিগল্পের সহজ ও সরল গল্পগুলির পাশে সমাজস্থিতির কেন্দ্রবর্তিনী নারীচরিত্র স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে, জাতকেই হোক আর পঞ্চতন্ত্রেই হোক, এই কাহিনীগুলি নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধক নয়। নারী নিন্দায় পঞ্চতন্ত্রে পঞ্চমুখ হয়েছেন গৃহী বিষ্ণুশর্মা (পঞ্চতন্ত্রের রচনাকার ও সঙ্কলক) ; সুতরাং বৈরাগ্যব্রতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও যে স্ত্রী-জাতিকে বিষবৎ পরিহার করেন এ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।"[৪] প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞতায় পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ শুধু 'জাতকথ বন্ননা' বা 'পঞ্চতন্ত্র'র প্রভাবেই ওই ধরনের নীতিগল্প ফাঁদেননি, তাঁর দার্শনিকতা, সমাজ সংসার সম্পর্কে ধারণা, ভারসাম্য রক্ষার নিজস্ব সমীকরণও ছিল। অন্য গল্পের অন্তর প্রদেশ দেখার আগে তাঁর চিন্তামূলক প্রবন্ধের তত্ত্বতালাশ করে নেয়া যাক যেখানে তিনি নারীর শিক্ষা, মন, উচিৎ অনুচিৎ নিয়ে বিস্তর লিখেছেন।

'লিপিকা' 'গল্পসল্প'র গল্পগুলো লেখার অল্পকিছু আগে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ১৩২২ সালে *স্ত্রীশিক্ষা* বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। অভিজ্ঞতার বৈভবে আর যুক্তির জালে স্ত্রীশিক্ষার স্বরূপ তিনি সুনির্দিষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন ওই প্রবন্ধে। বর্তমানের অতি-আধুনিক বাজার-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা যেমন সবধরনের কাজকেই বিশেষীকরণ করে ফেলেছে, সময়ের তুলনায় অগ্রসর কবি রবীন্দ্রনাথও চারকুড়ি বছর আগে শিক্ষাকে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে মেয়েকেও জানিতে হইবে। শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জন্যই।"[৫] জানতে চাওয়া মানুষের ধর্ম। ওই লব্ধজ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই প্রয়োগ করবে। সমাজে মেয়েদের সেই শিক্ষা প্রয়োগ করার সুযোগ নাই। "বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব"[৬] নষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা তিনি করছেন না। ওই মেয়েলিভাবটা খুব জরুরি ! মেয়েলিভাব জিনিসটা কেমন ? যা কিছু জানবার তা জানবার অধিকার মেয়েদের দিলেও এ-কথা স্মরণ করে দিতে ভুলেননি, "তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোন ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপর মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে।"[৬] সমাজে "মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে। তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এটাই তাদের আদর্শ। সংসারকে সে ভালোবাসুক আর না বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে । ভালোবাসার ধর্মই আত্মসমর্পণে, সুতরাং তার গৌরব তাহাতেই। সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোন অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।"[৬] রবীন্দ্রনাথের পশ্চাতে সহস্র সহস্র বছর ধরে আচার বিধানের দড়িতে ফাঁসলাগা আহাজারি ধ্বনিত সংসার সমাজে নারী নিজেকেই নিজে এনে তুলেছে ! সে দায় নারীর! সেখানে নারী ভালোবাসার দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে ! কবি ফরহাদ মজহারের *এবাদতনামা*'র একটি শ্লোক এখানে বেশ যুৎসই, "বান্দার দাসত্বরীতি বান্দাকে বানিয়েছে দাস।"[৭] রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন নারীর সামাজিক অবস্থা নারীর শরীরের মতোই বিধাতার হাতে গড়া। বাইরের কোন অত্যাচার তাকে বাধ্য করায়নি। রবীন্দ্রনাথের জন্মের বহু আগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রামমোহন তাঁর কালের

চিন্তা থেকে অনেক দূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। শাস্ত্রের আগুন থেকে নারীকে বাঁচিয়েছেন, লৈঙ্গিক রাজনীতিতে নারীর পরাভূত কোণঠাসা অবস্থাও তাঁর অজানা নয়। তিনি সেই কালেও মনে করেননি, নারী নিজেই নিজের ভাগ্যের জন্য দায়ী। রামমোহন লিখেছেন, "স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহাদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে দুই উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগের পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন। পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে।"[৮] আর রবীন্দ্রনাথের যখন নিতান্ত বালক বয়স, সেই ১৮৭১-এ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীর অধীনতা সম্পর্কে লিখেছেন, "স্ত্রীজাতি সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরূপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সামাধান করেন।"[৯]

স্ত্রীশিক্ষা লেখার সাত বছর পর লেখা গল্প *পুনরাবৃত্তি*, যুদ্ধের মন্দ খবরে বিমর্ষ রাজা বাগানে বেড়াতে বেরিয়ে দেখেন একটি ছেলে ও মেয়ে রামসীতার বনবাস খেলছে। স্বেচ্ছায় রাক্ষস সেজে তিনি বালক বালিকাকে প্রচুর আনন্দ দেন। খেলা শেষে রাজা তাদের পরিচয় জেনে নিলেন। মেয়েটি রুচিরা, মন্ত্রীর কন্যা। ছেলেটি কৌশিক, পিতা গরিব ব্রাহ্মণ। সময় হলে ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিয়ে হোক রাজা এই ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। দেশের নামকরা শিক্ষায়তনের নামকরা অধ্যাপকের কাছে কৌশিককে রাজা পড়াতে পাঠালেন। রাজা কিন্তু একবারও খোঁজ নিলেন না মেয়েটি পড়ে কিনা বা কোথায় পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মানসরাজা উদার, বিবেচক, প্রজাবৎসল, তিনি তো পুরুষকে বিশুদ্ধ শিক্ষার জন্য পাঠাবেনই, যদিও রুচিরাও ওই অধ্যাপকের কাছে পড়ে। একই পাঠশালায় রুচিরা কৌশিককে পেয়ে মোটেই খুশি হলো না। বরং লজ্জা-অপমানে সে কুণ্ঠিত। এই অপমানবোধ মেয়েলিভাবের আর একটি দিক, তা হলো, কুল বৈষম্য, শ্রেণী সংস্কার। তা যাই হোক, রাজার আশীর্বাদধন্য কৌশিক যতো না পড়ে তার চেয়ে বেশি খালে বিলে বন-পাথালে ঘুরে বেড়ায়। গান গাওয়া, যন্ত্র বাজানো, সাঁতার কাটায় তার মহাফূর্তি। অধ্যাপক বিদ্যার প্রতি কৌশিকের তত অনুরাগ দেখতে পান না। রুচিরা বরং অনেক পড়ে, অনেক এগিয়ে যাবে। কিন্তু রুচিরাকে নির্মাণের কারিগর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সময়কালে রাজা যেন নিশ্চিত হয়েই বিদ্যার পরীক্ষায় দু'জনকে বসিয়ে দেন। অযোগ্য কৌশিককে রুচিরার পছন্দ নয়। কৌশিক যোগ্যতা প্রমাণ করবে। পাঠশালার পড়ায় সে খেয়ালি হলেও অধ্যাবসায়ী রুচিরাকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলে বিদ্যার দাপটে। রাজা আনন্দিত। আর অধ্যাপক রুচিরার ওপর গোসা করে বলেন, "কপিল-কণাদের নামে শপথ করে বলছি, আর কখনো স্ত্রীলোক ছাত্র নেব না।"[১০] রুচিরা কিন্তু ওই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বিদ্যাশিক্ষায় আরও মনোযোগী হয়ে ওঠে না, বরং পাঠশালার শিক্ষায় অসীম অনীহা। খেলাঘরের সীতা থেকে সংসারের সীতা হয়ে খেলার রাজাকে বরণ করে নিতে পারলেই সে বাঁচে ; জৈবিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কোন মনুষ্যবোধ তার লুপ্ত !

লিখতে শিখে তার চেয়ে বড়ো কথা গোপনে কাব্য সাধনা করতে যেয়ে বালিকা উমা'র বিপদও কম হয়নি। *খাতা* গল্পের প্রথম বাক্যটি এই, "লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে।"[১১] আশা-ভরসা দান দূরে থাক, নতুন লিখতে শেখার উত্তেজনায় যেখানে সেখানে লেখা নিয়ে সংসারে 'বিষম উপদ্রব' উপস্থিত হলো। তবুও উমা লেখে, কপি করে, মনের কথা যত অনায়াসে পারে প্রকাশ করে। সেই করার জায়গাটি হতে পারে হিসাবের খাতা অথবা দাদার লেখার পৃষ্ঠা। সাত বছরের উমা অতো বোঝে না। লেখার বাতিক দেখে দাদা যদিও একটি বাঁধান খাতা কিনে দিয়েছিলেন। উমা'র আনন্দফূর্তির সীমা নাই। খাতা তার প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। ধীরে ধীরে ওই খাতার কোন কোন পরিসরে দু'একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে শুরু করল। এর মধ্যেই নয় বছরের উমা'র বিয়ে হয়ে গেল প্যারীমোহনের সাথে। প্যারীমোহন নব্যভাব থেকে দূরে অবস্থান করে পুরাতন ধ্যান ধারণায় প্রবল আস্থা বজায় রেখে কাগজে লিখে থাকে। বালিকা উমা লেখার প্রবৃত্তি নিয়েই শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল, বিয়ে এবং নতুন সংসারে একটু অভ্যস্ত হয়ে আবার সেই বাঁধানো খাতায় লিখতে শুরু করে। তবে গোপনে, ঘরের দরজায় খিল দিয়ে। গোপন করার অর্থই হলো অচিরে তা জনগোচরে আসবে। যথারীতি ননদত্রয়ী তিলক-কনক-অনঙ্গমঞ্জুরী বৌদির গোপন চর্চা সংসারের হাটে ফাঁস করে দেয়। ফুটোতে চোখ লাগিয়ে তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে অসুবিধা হয়নি। প্যারীমোহন জানতে পেরে বিষম অমঙ্গল বোধে রেগে যায়। স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখে সংসারে যে ভয়াবহ বিপদ আনতে পারে তার এক যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বও সে আবিষ্কার করেছিল। প্যারীমোহনের সেই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে জেনে নিই, "স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়, কিন্তু লেখাপড়ার শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্বারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্ত্বা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়।"[১২] রমণী যে বিধবা হয়, দ্বন্দ্ব-সজ্ঘাতে সংসারে ঘটে কত অনাসৃষ্টি সে সব প্যারীমোহন কোন দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখায়নি। তবে, রবীন্দ্রনাথ ওই তত্ত্ব হয়তো প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন 'ঘরে বাইর' উপন্যাসে। মেয়েদের মেয়ে হওয়ার জন্য বরাদ্দ শিক্ষা বিমলা পেয়েছিল বাবার বাড়ি থেকে, স্বামী নিখিলেশের কাছ থেকেও। যখন ওই শিক্ষার বাইরে যা একেবারেই পুরুষ-পাঠ্যক্রমের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতে, স্বদেশবোধ ইত্যাদির শিক্ষায় সে আগ্রহী কৌতূহলী

এবং সাহসী হয়ে ওঠে এবং তার অভিঘাত পড়ে তার আচরণে, তখনই তথাকথিত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাবে সংসারে ঘটে মহা বিপদ। তত্ত্বের প্রমাণ মিলে, বিমলা বিধবা হয়। সে যাইহোক, প্যারীমোহন আপাততঃ উমাকে গালমন্দ করে শাসিয়ে দিল, এ চেষ্টা যেন সে আর না করে। তারপরেও যখন অন্যদিন গোপনে বসে আবার লিখবার চেষ্টা করে তখন সবার সামনে অপদস্থ করে খাতাটি কেড়ে নেয়। উমা'র সাধনার সেখানেই শেষ। রবীন্দ্রনাথ অতঃপর বলেন, "প্যারীমোহনেরও সূক্ষ্মতত্ত্বকণ্টকিত বিধি প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেহ ছিল না।"[১৩] সমাজে মানবহিতৈষীর খোঁজ হয়তো সহজে মিলে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন ! তিনি কি অন্যকোন উমার হাতে শিক্ষাসাধনার খাতাটি তুলে দিয়েছিলেন ! অথবা প্যারীমোহনের খাতাটি প্রবল দর্পে কেড়ে নিয়েছিলেন ? এই গল্প তিনি লিখেছিলেন ১৩০০ থেকে ১৩০১ সালের মধ্যে। পুরুষের সংসারে স্ত্রীগণের শিক্ষার প্রবল বাধা সঙ্কট তিনি দেখতে পেয়েও প্রহসন করে গেলেন। এই *খাতা* গল্পটি লিখবার বছর দুই আগে প্রহসন নয় সুগ্রন্থিত 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নিবন্ধে লিখলেন, "... আমাদের পুরুষদের শিক্ষার বিকাশলাভের পূর্বেই যদি আমাদের অধিকাংশ নারীদের শিক্ষার সম্পূর্ণতা প্রত্যাশা করি তাহলে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার প্রয়াস প্রকাশ পায়।"[১৪] ঘাস খাওয়ার প্রয়াস তিনি করেন নাই, পুংশক্তির তত্ত্ব কি শুধু কাল্পনিক প্যারীমোহনের ! প্রথাগত সংসারে যেখানে পুংশক্তির সঙ্গে পুংশক্তির বিরোধ ঘটেনি সেখানেই রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন নারী ও সংসার খুব সুখে আছে। 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'তেই লেখেন, "... আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দু'টি বাহুতে দু-গাছি বালা প'রে সিঁথির মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে সদাপ্রসন্নমুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে রেখেছেন। ... আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা তো বেশ সুখে আছি এবং তাঁরা (স্ত্রীগণ) যে বড়ো অসুখী আছেন এমনতরো আমাদের কাছে তো কখনো প্রকাশ করেননি...।"[১৪] প্যারীমোহন বিদ্যার্থী কিশোরীবধূটির খাতাটি সকলের সামনে অপদস্থ করে কেড়ে নিলে যদি স্বামীর দুর্বৃত্ত আচরণ প্রকাশও পায় তাতে তো অন্যকে দোষ দেওয়া যাবে না। এরকম হয়ই। সবই ওই রমণীটির অদৃষ্টের দোষ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "রমণীর অদৃষ্টক্রমে দুর্বৃত্ত স্বামী এবং অকৃতজ্ঞ সন্তান পৃথিবীর সর্বত্রই আছে ; বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায় ইংল্যাণ্ডেও তার অভাব নাই।"[১৪]

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪, ষাটোর্ধ রবীন্দ্রনাথ এক বালিকার শুভেচ্ছাচিঠি পান। এই বালিকা কবির শিলংবাসের ওপর একটি পদ্যময় বর্ণনার জন্য তাড়া দিয়েছিল। এই চিঠিকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ নারী সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করার প্রয়াস পান *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি* প্রবন্ধে। কোন এক আশ্চর্য কারণে তিনি মনে করতেন নারী কোন পাথরখণ্ডের মতো প্রবাহহীন, গতিহীন স্থিরবস্তু, এর যা নিয়তি তা নির্দিষ্ট হয়ে

গেছে, অপরিবর্তনীয় শরীয়তের মতো নারী। প্রকৃতি তাকে নির্মাণের কাজ শেষ করে ফেলেছেন। আর কোন ভাঙ্গা-গড়া, দ্বন্দ্ব সজ্ঘাতের মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হবে না, সে স্থিত ও প্রতিষ্ঠিত। আর প্রকৃতি পুরুষকে নিরন্তর গড়ে চলেছেন, পুরুষকে গড়া কখনো শেষ হবে না। পুরুষশক্তি অনবরত জ্ঞান-সাধনার অন্তহীন তৃপ্তিহীন পথে সদাসক্রিয়। "অজানার মধ্যে কেবলই সে (পুরুষ) পথ খনন করছে, কোন পরিণামের প্রান্তে এসে আজও সে অবকাশ পেলে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানেনি। পুরুষকে অসম্পূর্ণই থাকতে হবে। সাহিত্য কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হলো পুরুষের সৃষ্টি।"[১৫] আর "নারীপ্রকৃতি আপনার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ। সার্থকভাবে সন্ধানে তাকে দুর্গম পথে ছুটতে হয় না। জীবনপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার (নারীর) মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে। সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী ; তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোন দ্বিধা নেই।"[১৫] ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি আবার লিখেছেন ওই একই ডায়েরীকে, "আসলে কথা হচ্ছে, প্রকৃতির ব্যবস্থায় মেয়েরা একটা জায়গা পাকা করে পেয়েছে, পুরুষরা তা পায়নি। পুরুষকে চিরদিন জায়গা খুঁজতে হবে। খুঁজতে খুঁজতে সে কত নতুনেরই সন্ধান পাচ্ছে। মেয়েদের জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সার্থকতা হচ্ছে প্রেমে। এই প্রেমে সে স্থিতির বন্ধনরূপ ঘুচিয়ে দেয় ; বাইরের অবস্থার সমস্ত শাসনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। যে মেয়ের মধ্যে সত্য আছে সে আপন বন্ধনকে স্বীকার করেই প্রেমের দ্বারা তাকে অতিক্রম করে ; বন্ধনকে ত্যাগ করার চেয়ে এই মুক্তি বড়ো।"[১৬]

যখন প্রেম থাকে না, পরস্পরে অবিশ্বাস, একজন আরেকজরকে টেক্কা দিতে চায়, অশান্তিতে সংসার ভরে ওঠে, তখন রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নায়িকা স্বামীর নিন্দা না করে, স্বামীর অসত্য কথার প্রতিবাদ না করে, সুযোগ মতো নিজেই আত্মবিসর্জনের আয়োজন করে নেয়। *শাস্তি* গল্পের 'চন্দরা' বা *ঘাটের কথা*'র 'কুসুম'-এর জীবনে সে-রকম করুণ পরিণতি ঘটেছিল। শ্রাবণ ১৩০০-তে *শাস্তি* লেখা। দু'ভাই দু'জার সংসারের গল্প লিখতে প্রথম বাক্যেই দু'জা সম্পর্কে লেখেন, "দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছে।"[১৭] পাঠক শুরুতেই কলহ-কোলাহল প্রিয় দুই নারীর খবর জানতে পেল। বড় জা রাধা ছোট চন্দরা। চন্দরা'ই গল্পের কেন্দ্রে। চন্দরা'র বর্ণনাতে এক জৈবিক নারীর রূপ ধরা পড়ে, "মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল ; শরীরটি অনতিদীর্ঘ ; আটসাঁট ; সুস্থসবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে চলিতে-ফিরিতে নড়িতে-চড়িতে দেহের কোথাও কিছু বাধে না। একখানি নতুন তৈরি নৌকার মতো ; বেশ ছোট এবং সুডৌল।"[১৮] চন্দরার স্বামী ছিদামের বর্ণনায় প্রকাশ পায় অন্যরকম তারিফ, "আর ছিদামকে একখানি চকচকে কালো পাথরে কে যেন বহু যত্নে কুঁদিয়া

গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্য বর্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।”[১৮] বড়ভাই দুখিরাম ক্রোধের বশে দায়ের কোপে বউ রাধাকে খুন করে ফেলে। ছিদাম ভাইকে বাঁচাতে উপস্থিত মতো বলে ফেলে তার বউ চন্দরা বড় জা'কে খুন করেছে। পাড়া-প্রতিবেশী, থানা-পুলিশ বিশ্বাস করে নেয়। এই ঘটনা ঘটার আগে চন্দরার প্রতি অবিশ্বাসে ছিদাম মনে মনে তার মৃত্যু কামনা করেছিল। অবচেতনায় সুপ্ত ইচ্ছার প্রভাবেই কি ছিদাম নিজের বউকে মিথ্যা দোষী করে ? কিন্তু চন্দরা এই মিথ্যা অভিযোগ অস্বীকার করে না। ফাঁসির হুমকিতেও না। চন্দরার সাথে ব্যবহার এবং অন্য নারীর প্রতি আসক্তি সন্দেহে ছিদামকেও সে খুব সহ্য করতে পারছিল না। যদিও গোপনে ছিদামের মতো স্বামীর মৃত্যু কামনা করেনি। প্রেম ও ভালোবাসার জন্য জীব প্রকৃতির তৈরি নারী কী করে সেই অবাস্তব কামনা করতে পারে ! স্বামীর মিথ্যা ভাষণকে জনসম্মুখে তুলে ধরার চেয়ে ওই অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নেওয়াই শ্রেয়। তাতেই জগতের সবাই ধন্য ধন্য করবে। সতের আঠার বছরের সুস্থ সবল এক জোয়ান নারী ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়লে ত্যাগের মহান আদর্শ প্রমাণ করার সুযোগ মিলবে বৈকি ! এমন কি হতে পারত, সত্যের খাতিরে না হলেও মৃত্যুর ভয়ে চন্দরা প্রকৃত ঘটনা পুলিশ-আদালতকে জানিয়ে জীবনের “ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।”[১৯] লেখকের দায় কি শুধু বাস্তবতার দাসত্ব করা ? যা ঘটে, যা ঘটে আসছে, সংস্কার যার অনুমোদন করে, লেখক শিল্পী সে সবের নকল না করে তার স্বপ্ন, প্রত্যাশা, বোধকে প্রকাশ করে অচলায়তনকে ধাক্কা দেবেন এই তো স্বাভাবিক।

ঘাটের কথা'র কুসুম পত্রযোগে জানতে পেরেছিল তার বৈধব্যের খবর। বিদেশে চাকরিরত স্বামী, চাটুজ্জেদের বাড়ি ছোটবাবু যে মরেছে, সেই খবরে সন্দেহহীন হয়ে কুসুম বিধবার সাজে আবার বাবার বাড়ি চলে আসে, বাবার বাড়ির সেই বাঁধান ঘাটেও চলে যাওয়া-আসা, কিন্তু এবার তার পায়ে মলের সুর তরঙ্গের বদলে বড়ো বিষণ্ন সুর। একদিন হঠাৎ, পূর্ণিমা তিথিতে দেখে ফেলে সম্প্রতি আসা খুব আলোচিত সন্ন্যাসীকে। কুসুমের আগে যারা তাঁকে দেখেছে, দেখে চেনা মনে হয়েছে তাদের একজন মন্তব্য করল, “ওলো এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী !”[২০] অন্যজন সন্ন্যাসীর প্রতি কোনরকম মনোযোগ না দিয়েই বলল, “আহা সে কি আর আছে। সে কি আর আসবে। কুসুমের কি তেমন কপাল।”[২০] গ্রামের ওই মহিলাগণ রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী ঠিকই বুঝেছিল কুসুমের তেমন কপাল নয়, কুসুমদের তেমন কপাল হতে নেই। কুসুমও যেদিন জ্যোৎস্নামুখে নিয়ে সন্ন্যাসীকে দেখে, দেখে আত্মায় কেঁপে উঠলেও প্রণাম করে সেদিনের মতো চলে যায়। পরদিন থেকে সে আসতে শুরু করে মন্দিরের কাজে, সন্ন্যাসীর খেদমতে। সন্ন্যাসী কি কুসুমকে চিনতে পেরেছিল ? প্রথম দেখার পর সন্ন্যাসী কিন্তু সেই সন্ধ্যায় ওই ঘাটে অনেকক্ষণ বসেছিল। কে জানে, দশ বছর আগে দেখা আট বছরের বালিকার রূপ আর কতটাই বা স্মৃতিতে টিকে থাকে। কুসুমের হয়তো ভুল হয়নি। সন্ন্যাসীর শাস্ত্রবয়ান শুনতে শুনতে এবং মন্দিরের দেখভাল করতে করতে একরকম জৈবিক অনুভূতি তাকে দিশেহারা করে দেয়। সে আর যায় না। একদা কিশোরহৃদয় যে স্বামীদেবতার পায়ে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেছিল, সেই দেবতা যখন নাগালের মধ্যে তখন তো তরুণ কুসুম বিহ্বল হবেই। সে তাকে স্বপ্নে ও জাগরণের মধ্যে দেখতে থাকে। এই দেখা ঠিক কিনা তা বুঝতে না পেরেই কুসুম সন্ন্যাসী ও মন্দির দর্শনে যেতে গাফিলতি করছিল। সন্ন্যাসীর ডাকে এবং নির্দেশে যখন সে বাধ্য হলো মন্দিরে আসতে এবং তার সঙ্কটের কথা প্রকাশ করে দিতে, তখন সন্ন্যাসী তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিতে কালক্ষেপ করে না, বলল, “আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে।”[২১] সমাজে নারী তো স্থিত, প্রতিষ্ঠিত, তার নিয়তি নির্ধারিত। সে ভালোবাসবে, এই একটি কষ্টিপাথরেই তাকে যাচাই করা হবে। কুসুমের অবাধ্য হৃদয় যুবক সুদর্শন স্বামীকে ভুলে থাকবার নির্দেশ কড়ায় গণ্ডায় মানতে পারবে না, আবার অধিকার নিয়ে এমনকি ধর্ম নিয়ে, স্বামীর মিথ্যাচারের (মরার সংবাদ দেয়া) বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না, অনুমতিও দিবে না কেউ কারণ আদর্শ নারীর সেটা শোভা পায় না। সেই ঘাটের একটি একটি সিঁড়ি অতিক্রম করে আবাল্য যে জলের সাথে খেলা করত সেই উদ্ধারহীন জলের স্রোতে তলিয়ে গিয়ে সব সঙ্কট নিভিয়ে কাঙ্ক্ষিত নারীর দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল করে তুলতে পারল ! মাত্র আট বছর বয়সে কুসুম নিজ গ্রামে ফিরে এসেছিল বিধবার বেশে। তারপর দশ বছর বাদে এই সন্ন্যাসীর আগমন এবং কুসুমের সলিল-সমাধি। এই অতি কিশোরবিধবার জীবন মৃত্যুতে ঠেলে দেয়ার আগে সমাজে বিধবা বিবাহের তোড়জোড়, অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা কিছুই রবীন্দ্রনাথকে আলোড়িত করেনি ! বিদ্যাসাগরের হিন্দু বিধবা বিবাহের নানা কসরৎ অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। তবে তা সাগরের আকাঙ্ক্ষিত পথে নাও হতে পারে। গোঁড়া হিন্দু, সংস্কারপন্থী অনেকেই বিধবার পতিগ্রহণ সুনজরে দেখেনি। ঠাট্টা মশকরাসহ বিদ্যাসাগরের জীবনের ওপর হুমকিও এসেছিল। এক অকাল বিধবাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথও গল্প লিখেছেন, সমাজের আলোড়ন তাঁকে স্পর্শ করেছে বৈকি। তবে তা কিভাবে সেটা ভিন্ন বিষয়। বিদ্যাসাগরের এই মানবিক সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ কখনো সরব সক্রিয় হতে পারেননি। বিধবার ব্রহ্মচর্য পালন রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ নয়। আর বিদ্যাসাগর ১৮৮৫তেই চেয়েছেন বিধবাকে পূজার ঘর থেকে বের করে রক্তমাংসের নারীর স্বীকৃতি দিতে। তিনি লিখেছেন, “দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, উহা বোধ করি চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠক মহাশয়বর্গ ! আপনারা অন্ততঃ

কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্বক, বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করা এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত...!"[২২] বেগম রোকেয়া বলেছেন, "আশরাফগণ সপ্তম বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে চির-বিধবা রাখিয়া গৌরব বোধ করেন।"[২৩]

প্রতিবেশিনী গল্পে বাল্যবিধবার প্রতি এক অব্যাখ্যাত কারণে গল্পের কথক দুর্বলতা অনুভব করে। সে জানে না এই আকর্ষণ কতটা জৈবিক, কতটা সামাজিক, অর্থাৎ সংক্রমিত। তার বন্ধু নবীনমাধব তখনো কিছু জানত না। কথক ওই বিধবাকে আশরাফ রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রভাবে বাসর ঘরের ফুলশয্যার চেয়ে "দেবপূজার জন্যই উৎসর্গ করা"[২৪] মনে ভাবত। কথকের হৃদয়ে তবুও আবেগের জোয়ার, বাধাহীন সেই আবেগ জনসমক্ষে প্রকাশ করা অনুচিৎ। ঠিক তখন বন্ধু নবীনমাধবের হৃদয়েও কাব্যজোয়ার বাধাহীন হয়ে ওঠে। কোথায় এই কাব্যের উৎস সে সম্পর্কে সে খুব সতর্ক। কথক নবীনমাধবকে আশ্রয় করে নিজের আবেগ প্রকাশ করতে পারে। কথকের প্রত্যক্ষ পণ্ডিতিতে নবীনমাধবও মনের ভাব লিখতে পারে, এবং যার জন্য এই উতলাভাব তাকেও তার ভাইয়ের দুতিয়ালিতে পাঠাতে পারল। তাতে কাজও হয়। দুই যুবা কোন এক বাল্যবিধবা প্রতিবেশীকে নিয়ে এই ভাবাবেগ-রোমান্টিকতায় মেতে ওঠে। যেন বিধবা মাত্রই এমন আকর্ষণের বিষয়, যখন সমাজে আইন হয়েছে, বিধবা বিবাহে বিপত্তি নেই। গল্পের শেষে, কথক জানতে পারে যার প্রণয়ে এমন আবেগ-কাতর তার বন্ধু নবীনমাধবও হৃদয়ের বার্তা পদ্যাকারে তাকেই পাঠাতে ব্যাকুল। নবীনমাধব তাতে সফলও হয়। বিধবা সবার সম্মতিক্রমে নবীনমাধবকে বিবাহ করতে সম্মত। কথক এই তথ্য অবগত হয়ে যারপরনাই বিস্মিত। সীমিত পরিসরে বিধবাকে নিয়ে এই কৌতুক-নক্সা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন গল্পের আঙ্গিকে। কবি রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল হৃদয় ও দৃষ্টিতে অকালবিধবার 'সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দু-গাছি বালার' অনুপস্থিতি, সিঁথির মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখার' শূন্যতা কোনো হাহাকার সৃষ্টি করে না। সকলদাবীহীন, অনুগত, অসহায় বিধবার মনের কি শরীরের কোনো দাবী থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন সংসারের ঝি-গিরি করে অন্যের সন্তান লালনপালন করে সুখ ও ইচ্ছার পূরণ ঘটে চমৎকারভাবে, "ইংরেজ ড়ষফ সধরফ-এর সঙ্গে আমাদের বালবিধবাদের তুলনা বোধহয় অন্যায় হবে না। ... বাহ্য সাদৃশ্যে আমাদের বিধবা য়ুরোপীয় চিরকুমারীর সমান হলেও প্রধান একটা বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের বিধবা নারীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনো শূন্য থাকে না, বাহু দু'টি কখনো অকর্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না। তিনি কখনো

জননী কখনো দুহিতা কখনো সখী। এইজন্যে চিরজীবনই তিনি কোমল সরস স্নেহশীল সেবাতৎপর হয়ে থাকেন। ... গৃহকার্যের ভার স্বভাবতই মেয়েরা ভালোবাসে, তাও তাঁর অভাব নেই। ... ওরই মধ্যে রামায়ণ মহাভারত দুটো-একটা পুরাণ পড়বার কিংবা শোনবার সময় থাকে। ... একজন বিবাহিত রমণীর বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে, কিন্তু বিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোণটুকুও উদ্বৃত্ত থাকতে প্রায় দেখা যায় না।"[২৫]

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি*-তে লিখেছেন পুরুষ সম্পর্কে কিছু দ্বিধা, তারাও কখনো মন্দ আচরণ করে থাকতে পারে, "পুরুষ কখনো কখনো এমন এমন কাণ্ড করে যেন নারীর মধ্যে অনির্বচনীয়তার কোন আভাস নেই, যেন তার মাটির প্রদীপে কোন আলোই জ্বলেনি...। ফেউ সাক্ষ্য দেয় বাঘেরই অস্তিত্বের।"[২৬] তারপর তিনি নারী সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাহীন চিন্তা প্রকাশ করেন। "সেই একই কারণে মেয়ে সংসারস্থিতির লক্ষ্মী, আবার সংসার ছারখার করবার প্রলয়ঙ্করীও তার মতো কেউ নেই।"[২৬] 'সংসার ছারখার করবার প্রলয়ঙ্করী' নারীর গল্প রবীন্দ্রনাথ ফেঁদেছিলেন ওই ডায়ারি লিখবার আগে বাংলা ১৩০৫ সালে। কুচবিহারের মহারানী ভূতের গল্প বড়ো ভালবাসতেন, তার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ *মণিহারা* গল্পটি বলেন। ভূতের গল্প বলতে যেয়েও তিনি একটি মেয়েভূতের গল্পই শুধু বলেন না, বলেন গয়নালোভী এক নারী যে সংসার ও বাণিজ্য ধ্বংস করে কিভাবে স্বামীর জীবনেরও সর্বনাশ করে তার গল্প। রানীকে একটু আনন্দ দেয়ার জন্য অথবা আস্থা বাড়াবার জন্য মূল গল্পটি যে কেউ নয় স্কুলমাস্টারের বয়ানে তিনি শোনান। অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া স্কুলমাস্টার আবেগ মিশিয়ে দাম্পত্যনীতি, স্ত্রী, পুরুষ সম্পর্কে অনেক মতামত দিতে কার্পণ্য করেন না। নায়িকা মণিমালিকা, স্কুলমাস্টার তাকে এভাবে পরিচয় করান, "একে কলেজে পড়া তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমনকি, ব্যামো হইলে অ্যাসিস্টেন্ট সার্জনকে ডাকা হইত।"[২৭] মাস্টারের মতে, "স্ত্রীজাতি কাঁচা আম ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে।"[২৭] তা যাইহোক, নায়ক ফণিভূষণ সফল ব্যবসায়ী, স্ত্রীকে ভালোবাসেন, কিন্তু মোটেও কড়া স্বামী নয়। মণিমালিকা সোহাগ ও অলঙ্কার কোনরকম আব্দারের আগেই পেত। যখন কোন কারণে ফণিভূষণের কারবারে ভীষণ ফাঁড়া উপস্থিত, নগদ একথোক টাকা অচিরেই দরকার, তখন সে ঋণ-মহাজনের কাছে বদনামের ভয়ে টাকা না চেয়ে মণিমালিকার গয়না কিছুদিনের জন্য বন্ধক রেখে নগদ সমস্যা মিটাতে চেয়েছিল। কিন্তু সম্মতি মিলল না, বরং মণিমালিকা ফণিভূষণের আড়ালে গ্রামের দূরসম্পর্কের আত্মীয় মধুকে ডেকে পাঠায় পরামর্শের জন্য। মধু মণিমালিকার আশঙ্কারই প্রতিধ্বনি করে। ফণিভূষণ ব্যবসায়ের কাজে অন্যত্র আর মণিমালিকা সারারাত ধরে সব গয়না গায়ে জড়িয়ে, চাদর দিয়ে, শরীর ঢেকে মধুর আনা নৌকায়

চড়ে বসল, গয়না সব নিরাপদ আশ্রয়ে বাপের বাড়ি রেখে আসবে। গয়নাপ্রীতি একটি মেয়েলি স্বভাবেরই অংশ, মেয়েদের মেয়ে হবার শিক্ষার জন্যও জরুরি, আর এই প্রীতির নেপথ্যে রয়েছে গয়নার সরবরাহকারী ফণিভূষণ বা রাম-রহিম। তাদের দৃষ্টিতে আরও রমণীয়, আরও কামাতুর দেখাতে এত গয়নার গড়াগড়ি। এক সময় নারীও আপন অধিকারের, একান্ত কাম্যসামগ্রী বিবেচনা করতে থাকে। গয়না হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক স্মারক। গয়নার প্রতি নিঃসঙ্গ সন্তানহীন সুন্দরী মণিমালিকার লোভও দুর্নিবার, অন্তত রবীন্দ্রনাথ তাকে সে-ভাবেই তুলে ধরেছেন। "মণিমালিকার দেহপ্রাণের সঙ্গে দেহপ্রাণের অধিক গয়নাগুলিও আচ্ছন্ন ছিল।"[২৮] অতিলোভের ফল শুভ নয়। এই আপ্তবাক্য এখানে খাটে। মধুও লোভমুক্ত সন্ন্যাসী নয়। বহুমূল্যের গয়না সেই বা হাতছাড়া করবে কেন। মণিমালিকা নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারল না। বাক্সভর্তি গয়না কেড়ে নিতে হয়তো খুন না করলেও চলত। কিন্তু শরীরের অঙ্গে অঙ্গে গাঁথা গয়না তো শরীর বধ না করে লওয়া সম্ভব নয় ! ফণিভূষণ যখন মণিমালিকা বা মধুর কারও খবরই পেল না, শোক ও আঘাতে বিমর্ষ, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকারে, রাতে মণিমালিকার কণ্ঠস্বর, গয়নার ঝমঝম শুনতে এবং তার ছায়াও দেখতে শুরু করল। "ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, কঙ্কালের আট আঙ্গুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, অলঙ্কারগুলি ঢিলা, ঢল ঢল করিতেছে, সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব ; সেই কালো তারা সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা ।"[২৯] আঠার বছর আগে মণিমালিকাকে ফণিভূষণ নহবতের সাহানা-আলাপে যেমন প্রথম দেখেছিল, এই ভূত মণিমালিকার অস্থি'র ভিতরও সেই চোখ সে দেখতে পায় এবং তার 'অঙ্গুলিসঙ্কেতে' ধীরে ধীরে নদীর সর্বনাশা স্রোতে মুখ থুবড়ে পড়ে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় বক্তব্যের গল্প *সংস্কার* (১৩৩৫), শেষ বয়সে লেখা এই গল্পেও সঙ্গতিহীনভাবে রবীন্দ্রনাথ গয়নাপ্রীতির খোঁচা দেন। কলিকা এবং গল্পের কথক তার স্বামী স্বদেশী ভাব, খদ্দর ইত্যাদি নিয়ে তর্ক করছিল। কলিকার গলায় ছিল উত্তেজনা। সেই গলা দাসী শুনে ভাবল "ভার্যাকে পুরো ওজনের গয়না দিতে ভর্তা বুঝি ফাঁকি দিয়েছে।"[৩০] গয়না ছাড়া মেয়ের দল কী বিষয় নিয়েই বা ঝগড়া করবে ! যখন মেয়েরা যুক্তি দিয়ে, বিবেচনা দিয়ে, নিজের মতামত প্রকাশ করতে প্রয়াস পায় তখনই হয়তো শুনতে পাবে, এ-সব কোন পুরুষ পণ্ডিতের কথা, কোনরকম শুনেই তা উগরে দিচ্ছে। কলিকা স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গে খদ্দর পরা নিয়ে কথা বলছিল। তখন তার স্বামী বলল, "আচারজীর্ণ দেশে খদ্দর-পরাটা সেই রকম মালা তিলকধারী ধার্মিকতার মতোই একটা সংস্কারে পরিণত হতে চলেছে বলেই মেয়েদের ওতে এত আনন্দ।"[৩০] কলিকা পাল্টা যুক্তি দেয়, "দেখো, খদ্দর-পরার শুচিতা যেদিন গঙ্গাস্নানের মতোই দেশের লোকের সংস্কারে বাঁধা পড়ে যাবে সেদিন দেশ বাঁচবে। বিচার যখন স্বভাবের সঙ্গে এক

হয়ে যায় তখনই সেটা হয় আচার, চিন্তা যখন আকারে দৃঢ়বদ্ধ হয় তখনি সেটা হয় সংস্কার ।"[৩০] তখন স্বয়ং গল্পকার রবীন্দ্রনাথ পাঠককে দ্রুত জানিয়ে দেন, "এই কথাগুলো অধ্যাপক নয়ন মোহনের আপ্তবাক্য।"[৩০] কলিকার পক্ষে বুদ্ধির কথা বলা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, খদ্দর-পরাটা কথক মনে করছে অন্য অন্য ধর্মাচারের মতোই সংস্কার বলেই মেয়েদের আনন্দের বিষয়, দেশপ্রেম বা রাজনৈতিক চেতনার বিষয় নয়। তবে এই মনে-করা'টাকে আরও প্রামাণ্য করার জন্য নতুন একটি ঘটনার অবতারণা করে কলিকার সংস্কারান্ধ চরিত্রকে নিশ্চিত করে দেয়।

কলিকা ও তার স্বামী দাওয়াতে বন্ধুবাড়ি যাওয়ার পথে মটর ভিড়ে আটকে যায়। ঘটনা এ-রকম ঃ এক সরকারি মেথর গোসল সেরে ধোয়া কাপড় পরে হলেও যেতে যেতে কারও গায়ে ছোঁয়া দিয়ে ফেলেছে। এই অপরাধে মাড়োয়ারি ব্যবসায়িরা মারমার করে মেথরকে পিটাতে শুরু করে। কলিকার স্বামী এই অনাচারে খুবই মর্মাহত হয়ে মেথরকে তার মটরে তুলে নিতে চায়। তখন কলিকা স্বামীর হাত চেপে ধরে, "করছ কী! ও যে মেথর।"[৩১] কলিকা দেখতে পায় মেথরটারই দোষ, ও কেন রাস্তার মধ্য দিয়ে যাবে। ওর মতো একটা দলিত পাপীর ছোঁয়ায় অন্যদের তো মেজাজ খারাপ হবেই। জাতপাতের মতো ব্যাপ্ত সংস্কারের কালিতে কলিকাকেও কালিমালিপ্ত করা ভুব জরুরি ছিল !

পাত্র পাত্রী গল্পের (১৩২৪) পাত্র সনৎকুমারের ষোল বছর বয়সে আচার সংস্কারনিষ্ঠ মা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিশুমেয়ের সঙ্গে সনৎ-এর বিয়ের সম্বন্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, "কারণ, সে শিশুও বটে, সুশীলাও বটে, আর কুলশাস্ত্রের গণিতে তার সঙ্গে অঙ্কে অঙ্কে মিল। তাছাড়া ব্রাহ্মণের কন্যাদায়মোচনের পারমার্থিক ফলও লোভের সামগ্রী।"[৩২] কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা সেই বিয়ে ভণ্ডুল করে দেয়। সনৎকুমার এম.এ. পাশ করে যখন পাত্র হয়ে উঠল, তখন ডেপুটি তার যোগ্য বিত্তশালী ব্রাহ্মণ কন্ট্র্যাক্টরের মেয়েকে পাত্রের অমতেই ঠিক করে ফেলে। মেয়েটির মা সম্পর্কে গল্পের কথক সনৎকুমার কলছে, "তার মা পাথুরে কয়লা পর্যন্ত গঙ্গার জলে ধুয়ে তবে রাঁধেন ; তাঁর অধিকাংশ ব্যবহার জলেরই সঙ্গে, কারণ জলচর মৎসরা মুসলমান বংশীয় নয় এবং জলে পেঁয়াজ উৎপন্ন হয় না। তাঁর মেয়েটিকেও তিনি স্বহস্তে সর্বাংশে এমনি পরিশুদ্ধ করে তুলেছেন সে ছায়া সম্বন্ধেও বিচার করতে শিখেছে।"[৩৩] পাত্র সনৎকুমারের স্বাধীন মত প্রকাশের কারণে এই বিয়েও হয় না। সনৎকুমারের মা ব্রত পালন, পূজা-আহ্নিক, ব্রাহ্মণের ভোজন দক্ষিণা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, আর ব্রাহ্মণ কন্ট্র্যাক্টরের স্ত্রী, তার মেয়ের সংস্কারের নমুনাও দেখা হলো, শুধু ডেপুটি এবং কন্ট্র্যাক্টরের সংস্কার নিয়ে তেমন জানতে পারিনি, তবে পাত্র সনৎকুমার

যখন আরও সাবালক হয়ে নিজেই সফল ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে সমাজের উঁচু তলার মেয়েদের সাথে ওঠবস করার মওকা পেল, তখন মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা অর্থাৎ গল্পের কথকের অভিজ্ঞতা শোনা যেতে পারে। বিশেষ করে তার এই অভিজ্ঞতা আরও জোরাল এজন্য যে, সে তখনো পাত্র, পাত্রী সন্ধান এবং সে-সম্পর্কে কৌতূহলও বেশ স্পষ্ট। আচারসর্বস্ব নারীদের সাথে শহরের সাহেবী কায়দা-কানুনে অভ্যস্ত নারীদের তুলনা করছে, "সেই যে আমার ব্রতচারিণী নিরর্থক নিয়মের নিরন্তর পুনরাবৃত্তির পাকে অহোরাত্র ঘুরে ঘুরে আপনার জড়বুদ্ধিকে তৃপ্ত করত, এই মেয়েরাও ঠিক সেই বুদ্ধি নিয়েই বিলিতি চালচলন আদব-কায়দার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপসর্গগুলিকে প্রদক্ষিণ করে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, অনায়াসে অক্লান্ত চিত্তে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারাও যেমন ছোঁয়া ও নাওয়ার লেশমাত্র স্খলন দেখালে অশ্রদ্ধায় কুণ্ঠিত হয়ে উঠত, এরাও তেমনি অ্যাকসেন্টের একটু খুঁত কিংবা কাঁটা-চামচের অল্প বিপর্যয় দেখলে ঠিক তেমনি করেই অপরাধীর মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তারা দিশি পুতুল, এরা বিলিতি পুতুল।"[৩৪] গল্পের চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর যত নেতি, যত তার কুস্বভাব, হীনম্মন্যতা সবই সাধু ভাষায় আকর্ষণীয় বর্ণনায় প্রকাশ করেও যেন বলা শেষ হয় না, বলতে বলতে সনৎ বাবু (অথবা রবীন্দ্রনাথ) কিছুটা দিশেহারা, বলছে, "একরকম জীবাণু আছে সে ক্রমাগতই ঘোরে। কিন্তু, মানুষ ঘোরে না, মানুষ চলে। সেই জীবাণুর পরিবর্ধিত সংস্করণের সঙ্গেই কি বিধাতা হতভাগ্য পুরুষ মানুষের বিবাহের সম্বন্ধ পাতিয়াছেন।"[৩৪] রবীন্দ্রনাথের পুরুষচরিত্র শেষ পর্যন্ত নারী প্রজাতিকে মানুষ হিসেবে মানতে নারাজ। গল্পের পুরুষেরা রাজা, জগতের সকল শিক্ষার সুযোগ্যপ্রাপ্ত, তারা আমলা, কণ্ট্র্যাক্টর, গবেষক, ব্যবসায়ী, পুরোহিত, এবং সংসারের নৈতিক ও অর্থব্যবস্থার অভিভাবক। সমাজে জ্ঞানীগুণী মহৎপ্রাণদের ঘিরে বহু গবেষক-ৰব জন্ম নেয়, সে-সব ৰব মহৎপ্রাণকে এমন অসীমে নিয়ে যায় যেখানে তাঁদের আর মানবসন্তান মনে হয় না, মনে হয় অতিমানব। তাদের মানবিক এবং স্থান-কালের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতাকে বোঝার ক্ষমতা লুপ্ত হয়। অথচ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় মহৎপ্রাণ ও সাধারণ পাঠকের মধ্যে একধরনের সত্য-সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সুযোগ হয়, মায়ায় বিভ্রান্ত হতে হয় না। ভাষা, শিল্প, সাহিত্য শুধু নয়, বাঙালির শিল্প-আত্মা তৈরিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা জনকের মতো। তবুও কি জনকের প্রতি মোহমুক্ত খোলা চোখে তাকাতে পারব না! স্থান-কাল পরিবেশের বিবেচনা থেকেও !

আজকের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে, চিন্তা ও দর্শনের নতুন নতুন দিক উন্মোচনে তাঁর কোন কোন ধারণা বিশ্লেষণ তো সমালোচিত হতেই পারে। এখন তো মনে করা সম্ভব নয়, জীবপ্রকৃতি চূড়ান্তভাবে নারীকে স্থিত ও প্রতিষ্ঠ করে দিয়েছে বা বিনা তর্কে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপ্রণালী বা যাচাই করার একটিমাত্র কষ্ঠি পাথরকে সত্য বলে গ্রহণ করে নেব, যেহেতু তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ! এই প্রবন্ধের অধিকার শুধু গল্পে নারীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর দৃষ্টিপাত করা, এবং প্রবন্ধের সমর্থনে নারী বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামতকে উদ্ধৃত্ত করা মাত্র। বিষয়ান্তরে যাওয়ার সুযোগ নাই অতএব আরও কিছু গল্প ও মতের খোঁজে যাওয়া যাক।

মাংসের চেতনা থেকে বয়স্ক বুদ্ধিতে বেড়ে ওঠা নারীর খোঁজে।

বাংলা ১৩৪৩-এ নিখিলবঙ্গ-মহিলা কর্মী সম্মিলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ *নারী* নিবন্ধটি লেখেন এবং ওই সম্মিলনে পাঠ করেন। ওই কর্মীসম্মিলনেও তিনি *পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি*, *স্ত্রীশিক্ষা* ইত্যাদি প্রবন্ধে যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করেন নিবন্ধের অর্ধেক জুড়ে, "প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে নারীর হৃদয়ে। এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিত্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্ত ভাবে। গৃহে নারী যেমনি প্রবেশ করেছে কোথা থেকে অবতীর্ণ হল গৃহিণী, শিশু যেমনি কোলে এল মা তখনই প্রস্তুত। পুরুষের রচিত সভ্যতার আদিকাল থেকে এইরকম ভাঙ্গাগড়া চলছে। ইতিমধ্যে, নারীর মধ্যে প্রেয়সী, নারীর মধ্যে জননী প্রকৃতির দৌত্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন কাজ করে চলেছে। প্রকৃতি তাকে যে হৃদয় দিয়েছেন নিত্য কৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসায়ে পরখ করতে দেওয়া হয়নি *নারী পুরাতনী*।"[৩৫] এই '*নারী পুরাতনী*' আবিষ্কারের অল্প আগে ১৩৩৯ সালে তিনি '*দুইবোন*' বড় গল্পটি লেখেন। নারীর জননী ও প্রেয়সী রূপ আখ্যানের ভিতর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। গল্পের শুরুতেই নারীর জাতবিচার চূড়ান্ত হয়ে যায়, "মেয়েরা দুই জাতের, ... এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।"[৩৬] মা এবং প্রিয়াকে তিনি আমাদের ষড়ঋতুর মধ্যে শুধু দুই ঋতুর সঙ্গে যথার্থ তুলনা করে দেখাতে পারেন। মা অবশ্যই বর্ষা ঋতু জলদান, ফলদান, তাপ-নিবারণী, শুষ্কতা দূর করেন। প্রিয়া বসন্ত ঋতু "গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছায় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নারীর, ঝংকারের অপেক্ষায়...।"[৩৬] দুই ঋতুর এই দুই রূপ একই নারীর চিত্তবৃত্তি হৃদয়বৃত্তিতে সমন্বিত হতে পারে না! প্রিয়া যেমন তাপনিবারণী সুশীতল পরম আশ্রয় হতে পারে না, তেমনি মা'র চিত্তে থাকবে না মধুর মায়ামন্ত্র, গভীর রহস্য ! খণ্ডিত নারীই নারী পুরাতনী!

তবুও নারী রবীন্দ্রনাথের কল্পপ্রকৃতির বরাদ্দ ভূমিকায় বসে নেই, উঁচু তলায় বসে শুধু জাতের নারীদের হৃদয়ের আবেগ আর আচারের অন্ধতায় বন্দী দেখা যায়, এবং বংশীয় কোন নারী পালকির দরজা খুলে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সাহস দেখলে উঁচু তলা থেকে মনে হয়, এই বুঝি গেল। যে ভাষার তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও শিল্পী সেই ভাষাভাষির শতকরা আশিভাগ জনতার অর্ধেক নারী নিজের ও সংসারের অন্য সদস্যদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। হৃদয়বৃত্তির সঙ্কটে 'কুসুম' 'চন্দরা' শুধু আত্মাহুতি দেয় না,

তাদের মতো গ্রামবাংলার সহস্র নারী সংসারের ভার বহন করে আসছে। তিনি যেমন কর্মোদ্দীপনায় উৎসাহী বর্মী নারীদের দেখেছিলেন, বাংলার নারীদের সেই উদ্দীপনা দেখার সুযোগ তাঁর কম হয়েছিল, তিনি স্বীকার করেছেন, নারী নিবন্ধেই, "বহুদিনের যে-সব সংস্কারজড়িমাজালে তাদের চিত্ত আবদ্ধ বিজড়িত ছিল যদিও আজ তা সম্পূর্ণ কেটে যায়নি, তবুও তার মধ্যে অনেকখানি ছেদ ঘটেছে, কতখানি যে, তা আমাদের মতো প্রাচীন বয়স যাদের তারাই জানে। আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে।"[৩৭] নারী সম্মিলনে তিনি যেমন পড়লেন, "এই যে মুক্ত সংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়েছে, এতে করে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্য তাদের বিশেষ করে বুদ্ধির চর্চা বিদ্যার চর্চা একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল ।"[৩৭] একি সম্মিলনের মেজাজ-অনুকূল নিবন্ধ পাঠ না তাঁর শেষ বয়সের উপলব্ধি! যদিও তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক কোন প্রবন্ধ আর লেখেননি, তবে সংস্কার (১৩৩৫), রাজরানী (১৯৪১) ইত্যাদির মতো গল্প লিখেছেন।

১৯৪০-এ লিখেছেন বড় গল্প *ল্যাবরেটরি*, সংলাপে ঠাসা, এর আঙ্গিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ থেকেই উদ্বৃত্ত করা যাক, "সাহিত্যে বড়ো গল্প বলে যেসব প্রগলভ বাণীবাহন দেখা যায় তারা প্রাকভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণীদের মতো তাদের প্রাণের পরিমাণ যত দেহের পরিমাণ তার চারগুণ, তাদের লেজটা কলেবরের অত্যুক্তি।"[৩৮] যাইহোক, *ল্যাবরেটরি*'র সোহিনী বা তার মেয়ে নীলিমার মধ্যে সম্ভাবনা ছিল জীবপ্রকৃতির প্রাকৃতিক মেয়ের বদলে মুক্তবুদ্ধিচর্চায় বিকাশমান চরিত্র সৃষ্টি হবার, শেষ পর্যন্ত তা হলো না। সোহিনীর স্বামী নন্দকিশোর বৃটিশের বৈষম্যের কারণে উপযুক্ত পদ পায়নি, সেই আফসোস তার ছিল বলে পুষিয়ে নিত কিছু নিয়মবহির্ভূত আয়ে, তার চাকরিও চলে যায় একদিন। স্বাধীন ব্যবসার উদ্দেশ্যে পুরাতন লোহালক্কড়ের ব্যবসা শুরু করে। এর সাথে চলে শখের বৈজ্ঞানিক গবেষণা। সেই গবেষণায় ছিল ষোলআনা মনোযোগ। স্ত্রীকেও পড়া লেখা শিখিয়েছে। কতদূর কী পড়েছে তার কোন হদিস ওই দীর্ঘ গল্পে নাই। নন্দকিশোর মারা যাওয়ার পর সোহিনী সব ব্যবসা গুটিয়ে দিয়ে চিন্তিত হলো ল্যাবরেটরি নিয়ে। স্বামীর একান্ত ভালোবাসা সাধনার ল্যাবরেটরিতে গবেষণা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারল না, বিজ্ঞান শিক্ষা তার নাই। তার মেয়ে নীলিমা কিন্তু বেশ বড়, তাকেও যোগ্য পাত্রে পাত্রস্থ করতে হবে। বিত্তবান সোহিনী নীলিমাকে বিজ্ঞান শিখাতে ব্যস্ত হচ্ছে না। তরুণ রেবতী ভট্টাচার্যের প্রতি তার দৃষ্টি পড়েছিল। মেধাবী, "এরই মধ্যে সায়েন্সের ডাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে।"[৩৯] সোহিনী চায়, রেবতী ল্যাবরেটরির দায়ভার বুঝে নিক। এই চাওয়ার মধ্যে সেই মেয়েলি বুদ্ধি, সোহিনী নিজেই বলছে, "মেয়েলি বুদ্ধি বিধাতার আদি সৃষ্টি, যখন বয়স অল্প থাকে মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপে ঝোপে, যেই রক্ত আসে ঠাণ্ডা হয়ে বেরিয়ে আসে সনাতনী পিসীমা।"[৪০] প্রিয়া

আর জননীর বাইরে নারীর অন্য কোন রূপ নাই। রেবতীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সোহিনী, সঙ্গে নীলিমা। মাতৃতুল্য সোহিনী রেবতীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, শত হলেও সে ছত্রির মেয়ে আর রেবতী ব্রাহ্মণের ছেলে। ল্যাবরেটরিতে তাকে নিমন্ত্রণ জানাতে এলেও নীলিমাকে সাজিয়ে এনেছে খুব রমণীয় সাজে। তরুণ রেবতীকে তার চাই, মেয়ের জন্য, ল্যাবরেটরির জন্য। নীলিমাকে "পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসি শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বাসন্তী রঙের কাঁচুলি।"[৪০] জৈবিক নারী আর সংস্কার ভিন্ন সোহিনী নীলিমার ভিতর থেকে আর কোন আলোর ছটা অন্ধকার পথে এসে পড়ে ? সোহিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায় কালোয় মিশানো খাঁটি রিয়ালিজম, অথচ তলায় তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজমই হলো সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।"[৪১]

নারী নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, "প্রকৃতির কাছ থেকে তারা (নারী) পেয়েছে অশিক্ষিত পটুত্ব, মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাদের সহজে লাভ করা। যে মেয়ের স্বভাবের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই রসটি না থাকে, কোন শিক্ষায় কোন কৃত্রিম উপায়ে সংসার ক্ষেত্রে সে সার্থকতা পায় না।"[৩৭] অসার্থকদের অর্থাৎ অশিক্ষিত পটুত্বহীনদের অবস্থা হয় মৃণালের মতো। সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। *স্ত্রীর পত্র* (১৩২১)-এর মৃণাল সংসারের অবিচার অন্যায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষদের পরিচয়টা নিজে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তবে তার অভিযোগ যেভাবে বিমূর্ত সমাজ-সংসারের প্রতি, সেভাবে পুরুষের প্রতি নয়। স্বামীর বিরুদ্ধে তো নয়ই। স্বামীর সম্পর্কে বলছে, "তোমার চরিত্রে এমন কোন দোষ নেই যাতে বিধাতাকে মন্দ বলতে পারি।"[৪২] ভাসুর সম্পর্কেও তার অভিযোগ এমন নয় যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়। সমাজের নির্মাতা বিধিবিধান সৃষ্টির কর্তা পুরুষকে সেভাবে অভিযুক্ত করতে পারে না। "ঘরের বউয়ের যতটা বুদ্ধির দরকার বিধাতা অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকটা বেশি দিয়ে ফেলেছেন।"[৪৩] সেই বেশি বুদ্ধির জোরেই মৃণাল আপাত এই সংসারজঞ্জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়াস পায়। কিন্তু কোথায় সে যাবে ! সে এমন কোথাও যেতে পারে না। তার সেই যাওয়া প্রকৃত মুক্তির পথ দেখায় তেমন দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করছেন না। ধর্ম আর পুরুষের অত্যাচারে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা যেমন কাশি বৃন্দাবনে যেয়ে সমাজশৃঙ্খলকে আশ্বস্ত করে, মৃণালও তেমনি গেছে তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে, পুরুষেরই সৃষ্টি জগদীশ্বর তার ভরসা। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন, "যোগাযোগের কুমুদিনী ফিরে যায় রাক্ষসতুল্য স্বামীর গৃহে। 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণালের কাজটাই যা ভিন্ন ধরণের। একান্নবর্তী পরিবারের দেয়াল ঘেরা চিহ্নিত চৌহদ্দিতে সে আর ক্ষয় করবে না নিজের জীবনকে। কিন্তু কোথায় যাবে মৃণাল ? আপাতত গেছে সে তীর্থে, থাকবে হয়তো কোন

ধর্মাশ্রমে। সেওতো এক বন্দিনীরই জীবন।"[৪৪] তবুও মৃণাল রবীন্দ্রনাথের গল্পের চরিত্রগুলোর মধ্যে সামান্য ব্যতিক্রম। তীর্থের সংস্কারে নতুন করে জীবন আটকা পড়লেও সেই অর্গল সংসার থেকে বৃহৎ এবং ব্যাপ্ত। মৃণাল পত্রের শেষে মীরাবাঈ-এর গানের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, "ছাড়ুক বাপ ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু ! তাতে তার যা হবার তাই হোক।"[৪৫]

সৌদামিনীর ভিতরেও ভিন্নরকমের আভাস ছিল, সেই আভা প্রকাশে জোর নাই, বরং স্ববিরোধিতায় ভরা। *বদনাম* (১৯৪১) গল্পের সৌদামিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্প বলি। বিপিন পাল (স্ত্রীর পত্র গল্পের সমালোচনা লিখেছিলেন 'মৃণালের কথা' নামে) তার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু পারবেন কেন? তারপর আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধা পেলুম, ছাড়ব কেন, সুদু'র (সৌদামিনী) মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।"[৪২] সুযোগ মতো বলিয়ে নেয়া যায়, বুদ্ধিমান আত্মসচেতন চরিত্র গড়ে ওঠে না তাতে। সৌদামিনীর স্বামী পুলিশের ইন্সপেক্টর। স্বভাবতই সে পুলিশ বৃটিশ সরকারের পুলিশ। আর এই ইন্সপেক্টর যে ডাকাত খুঁজছে সে আর কেউ নয় একজন বিপ্লবী। সে বিপ্লবী হলেও এবং পুলিশ তাকে ডাকাত বললেও জনসাধারণের কাছে অনিল অবতারের মতো। যত্রতত্র তার পূজা জোটে। সৌদামিনীও লুকিয়ে অনিলকে প্রশ্রয় দেয়। পূজা করে। আর স্বামীর জন্য রাত দু'টা অব্দি খাবার আগলে বসে থাকে। স্বামী অনিলকে খুঁজছে আর সে গোপনে অনিলকে তথ্য দিচ্ছে, পূজা করছে। তার এই পূজা ঠাকুরপূজা ভিন্ন কিছু নয়। যদিও সে জানে অনিল দেশের বিরল সুসন্তানদের একজন, এর বেশি নয়। অনিলকে পুলিশের কাছে, অর্থাৎ তার স্বামীর কাছে সৌদামিনীই ধরিয়ে দেয়, যেহেতু তা স্বামীর আজ্ঞা বা অনুরোধ ছিল। ইন্সপেক্টর বলল, "এবারে একটা সরকারী কাজে তোমার সাহায্য চাই, নইলে আর মান থাকে না।"[৪৬] সৌদামিনীর উত্তর, "শেষকালে আমাকেও তোমাদের চরের কাজে লাগাবে ! আচ্ছা তাই হবে। দু'দিনের মধ্যে সমস্ত রহস্য ভেদ হয়ে যাবে।"[৪৬] হয়েছিলোও তাই। সেই ধরিয়ে দেওয়ার দৃশ্যটা বলার মতো, "ভাঙ্গা দরজা খুলে গেল। ভিতরে একটি মাটির প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে, দেখলেন (ইন্সপেক্টর) শিবলিঙ্গের সামনে তাঁর স্ত্রী জোড় হাত করে বসে, আর অনিল এক পাশে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।"[৪৭]

বারো তেরো বছরের বালিকার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন ভিন্ন রকমের রূপ, সচরাচর যা দেখা যায় না। জমিদারী দেখভাল করতে নৌকায় অনেক ঘুরতে হতো,

সেরকম কালে এক নদীর ঘাটে দেখতে পান ওই বালিকাকে, "বোধহয় বয়স বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনের দেখাচ্ছে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসঙ্কোচে কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। বাংলাদেশে যে এরকম ছাঁদের 'জনপদবধূ' দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করিনি।"[৪৮] সেই জনপদবধূকে রবীন্দ্রনাথ হারিয়ে যেতে দেননি। তাঁর নিজের মতো করে গল্পের নায়িকা করে তুললেন, নাম দিলেন, মৃন্ময়ী। *সমাপ্তি* (১৩০০) গল্পের এই পটভূমি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ছিন্নপত্রে। তবে ওই মৃন্ময়ীকে বিয়ে দিলেন কলকাতার বি.এ. পাশ অপূর্বকৃষ্ণের সঙ্গে। শ্রেণী বিচারে এই সম্বন্ধ খাপ খায় না। অপূর্ব'র মা রাজীও ছিলেন না। সে যাইহোক, ছেলের ইচ্ছা। এ তো আর মৃন্ময়ীর ইচ্ছা নয় যে তা অগ্রাহ্য করাই কর্তব্য। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সাথেই তার ভাব। গাছে চড়া, সাঁতার কাটা নানারকম অমেয়েলি স্বভাবের জন্য সবাই ওর ওপর বিরক্ত। সে যখন বি.এ. পাশ করা যুবকের বাসর ঘরে আটকা পড়ল, স্বভাবতই তার দম আটকে আসে। স্বামী লোকটিকে তার মোটেই পছন্দ হলো না। তার মন চঞ্চল হয়ে থাকে বন্ধু রাখালের জন্য। কিছুটা হতাশায় কিছুটা দরকারে কলকাতায় চলে যাওয়ার সময় অপূর্ব মৃন্ময়ীকে বলল, "যতদিন না তুমি আসবার জন্য চিঠি লিখবে, আমি আসব না।"[৪৯] এই অভিমানে মৃন্ময়ীর কিছু আসে যায় না, এমনকি তুমি "ইচ্ছা করিয়া ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও"[৫০] এই আব্দারও হেসে উড়িয়ে দিল। অপূর্ব কলিকাতা চলে যাওয়ার পর মা'র বাড়িতে মৃন্ময়ীর মনে প্রথম দোলা, এক অপূর্ব শিহরণে তার খুব ফাঁকা লাগে। বিধাতা কখন তাঁর সূক্ষ্ম তরবারি দিয়ে "মৃন্ময়ীর বাল্য যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিল সে জানিতে পারে নাই। আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। এখন শাশুড়িকেও মৃন্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়িও মৃন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন ; তরুর সহিত শাখা-প্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।"[৫১] অর্থাৎ সেই কাঙ্ক্ষিত নারীর আবির্ভাব ঘটল, সমাজ সংসারে যার ভূমিকা জীবপ্রকৃতির দ্বারা স্থির প্রতিষ্ঠ ! মৃন্ময়ী শরীরে যে চেতনা অনুভব করে তা স্বাভাবিক, কিন্তু সে সঙ্গে বুদ্ধিরও কি বয়স বাড়তে নাই ! শরীরের চেতনা ছাড়া ওই একই জৈবিক প্রবৃত্তি ছাড়া মৃন্ময়ীর ভিতর আর কোন বোধের সঞ্চার হতে পারে না ! মৃন্ময়ী কিন্তু নিরক্ষর নয়, সে লিখতে জানে পড়তে পারে, ওই তার সামান্য লিখতে জানা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ কিছু রস তৈরি করেন। মৃন্ময়ীর বাবা ঈশানচন্দ্র দূরে কুশীগঞ্জে একটা ছোট চাকুরি করে। মেয়েকে সে বহুবার চিঠি লিখেছে, মেয়ে চিঠির অপেক্ষাও করে। কিন্তু মেয়ে মৃন্ময়ী যখন চিঠি লেখে, তার ভাষা যাইহোক না কেন, সে কি জানবে না, 'লেফাফায়' নাম ঠিকানা লিখতে হয় ! মৃন্ময়ীর এই ঠিকানা লিখবার বুদ্ধি থাকাটা কি খুব

অস্বাভাবিক হতো! যৌবনপ্রাপ্ত নারীর ওই একটিই কাম্য, কখন অন্ধকারে স্বামীর আলিঙ্গনে আটকা পড়বে এবং তার মাধ্যমে ঘটবে কৈশোর-কুমারীকালের সমাপ্তি, নারী জীবনেরও সমাপ্তি কি! বিখ্যাত বিদুষী রমাবাইয়ের বক্তৃতা শুনতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন। নারীর অধিকার মর্যাদা বিষয়ে রমাবাই তাঁর বক্তৃতা পুরুষ শ্রোতাদের মারমুখী গণ্ডগোলে শেষ করতে পারেননি। অসমাপ্ত বক্তৃতার কথা, বিশেষ করে "মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষদের সমকক্ষ কেবল মদ্যপানে নয়"[৫২] মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ বড়ো বিব্রতবোধ করেন। ঘরে ফিরে তিনি দিলীপ কুমার রায়কে চিঠি নিবন্ধ লেখেন. "মেয়েরা সকল বিষয়েই যদি পুরুষের সমকক্ষ, তাহলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অন্যায় অবিচার বলতে হয়।"[৫২] "রূপ এবং অনেকগুলি হৃদয়ের ভাবে মেয়েরা"[৫২] শ্রেষ্ঠ হলেও পুরুষ বুদ্ধি, প্রতিভা, শক্তিতে শ্রেষ্ঠ। "শারীরিক বিষয়ে আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই রূপে শ্রেষ্ঠ ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমরা যেমন বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ। ... মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই। মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল একটা বুদ্ধি থাকলে হবে না, আবার সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের একটি বল চায়। মেয়েদের একরকম চটপটে বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধারণত পুরুষদের মতো বলিষ্ঠ বুদ্ধি নেই।" রবীন্দ্রনাথের এই 'বিশ্বাস' এবং তত্ত্বানুসারে মৃন্ময়ীর ঠিকানা লিখবার বুদ্ধিও হয় না।, 'ল্যাবরেটরি' গল্পে যেমন মেয়েলি বুদ্ধি ও হৃদয়ের ভাবে ল্যাবরেটরি হলেও বিজ্ঞান গবেষণার ল্যাবরেটরি চালানোর প্রতিভা শক্তি জোটে না নায়িকাদের। 'হৃদয়ের ভাব' এবং 'চটপটে বুদ্ধি'র প্রভাব প্রবল না হলে সোহিনী মেয়ে নীলিমাকে পাত্রস্থ করার সাংসারিক বুদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার প্রয়াসও দেখা যেত। 'সংস্কার' গল্পের কলিকার রাজনৈতিক বুদ্ধি অস্বীকৃত হয়, ওই রকম বুদ্ধিদীপ্ত কথা কলিকার হতেই পারে না, পুরুষ অধ্যাপকটির কাছ থেকে শোনা কথা কপি করছে মাত্র!

দ্বিতীয় শা-মামুদের আড়াই শত বৎসর প্রাচীন প্রাসাদের ঘরে ঘরে যে প্রেত-আত্মাদের বিলাপ আহাজারি, সেই প্রেতগুলোও নারী, বিলাপ আহাজারি অন্য কোন অত্যাচারের কারণে নয়, আরব ইরানী রমণী অতৃপ্ত কামনার জ্বালায় মরে যেয়েও পুড়ছে। *ক্ষুধিত পাষাণ* (১৩০২)-এর বৃদ্ধ করিম খাঁ জানাচ্ছে, " ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত, সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ (পুরুষ) পাইলে তাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়।"[৫৩] গয়নালোভী ভূত মণিমালাকে দেখেছি। নারী মরে যেয়েও অতৃপ্ত কামনার জ্বালায় কেমন ভয়ঙ্কর 'পিশাচী' হয়ে উঠতে পারে তার বর্ণনা পেলাম *ক্ষুধিত পাষাণ* গল্পে। *ক্ষুধিত পাষাণ*-এর ক্ষুধা রমণীর অতৃপ্তকাম ক্ষুধা 'নারী পুরাতনী।' আদিম জৈব্য-চেতনা বা "মাংসের চেতনা থেকে বয়স্ক বুদ্ধিতে বেড়ে ওঠা"র[৫৫] ফুরসৎ পেল না !

সূত্র-নির্দেশ ঃ

১ *রাজরানী, গল্প সল্প, রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ ১৪০২, পৃঃ ৪৮৬*
২ *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, ডি.এম.লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃঃ ৪২*
৩ *ঐ পৃঃ ৪০*
৪ *ঐ পৃঃ ২৭*
৫ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্ত্রীশিক্ষা, বিচিত্রা বাংলাদেশ সংস্করণ, অল্পকথা, ১৩৯৯, পৃঃ ২২৩*
৬ *ঐ পৃঃ ২২৪*
৭ *ফরহাদ মজহার, এবাদতনামা প্রতিপক্ষ, ঢাকা, ১৩৯৬ ঃ ১৫*
৮ *'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ ১৮১৮' রামমোহন রচনাবলী হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ২০২*
৯ *'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার ১৮৭১' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনাবলী তুলি-কলম, কলকাতা ১৯৮৭, পৃঃ ৮৪৩*
১০ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পুনরাবৃত্তি' ত্রয়োদশ খণ্ড বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ ১৪০২, পৃঃ ৩৫৮*
১১ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'খাতা' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ১৮২*
১২ *ঐ পৃঃ ১৮৪*
১৩ *ঐ পৃঃ ১৮৫*
১৪ *প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ পৃঃ ৫৪২। উল্লেখ্য 'প্রাচ্য ও প্রতীক' প্রবন্ধটি য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারির প্রথম খণ্ডের (বৈশাখ ১২৯৮) দ্বিতীয়াংশ*
১৫ *'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ পৃঃ ৪৫০*
১৬ *ঐ পৃঃ ৪৫৩*
১৭ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শাস্তি' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ১৫৪*
১৮ *ঐ পৃঃ ১৫৭*
১৯ *ঐ পৃঃ ১৬০*
২০ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘাটের কথা' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ৪*
২১ *ঐ পৃঃ ৭*
২২ *'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার ১৮৭১' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনাবলী তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ৮৩৪*
২৩ *'রানী ভিখারিনী' বেগম রোকেয়া রচনাবলী বাংলা অ্যাকাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ ২৯১*
২৪ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রতিবেশিণী' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ৩৮১*
২৫ *প্রাচ্য ও প্রতীচ্য. রবীন্দ্র রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৫৪০, ৫৪১*
২৬ *'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' রবীন্দ্র রচনাবলী দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, পৃঃ ৪৫৫*
২৭ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মণিহারা' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ৩৩৫*
২৮ *ঐ পৃঃ ৩৩৯*
২৯ *ঐ পৃঃ ৩৪৩*
৩০ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংস্কার' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ৬৪৭*
৩১ *ঐ পৃ ঃ ৬৪৮*
৩২ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পাত্র-পাত্রী' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ৬২৭*
৩৩ *ঐ পৃঃ ৬৩১*
৩৪ *ঐ পৃঃ ৬৩৩*
৩৫ *'নারী' কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ পৃঃ ৬২২*
৩৬ *দুইবোন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ পৃঃ ৪২৭*

৩৭ *'নারী' কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ পৃঃ ৬২৩*
৩৮ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছোটগল্প' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ৭৫১*
৩৯ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ল্যাবরেটরি' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ৬৯৭*
৪০ *ঐ পৃঃ ৭০২*
৪১ *ঐ পৃঃ ৭০৩*
৪২ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গ্রন্থ পরিচয়' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ৮৬৫*
৪৩ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ৮৭৫*
৪৪ *সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'বাঙালির সংস্কৃতিতে নারী' বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা ২য় সংখ্যা পৌষ ১৪০৫, পৃঃ ১৮*
৪৫ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্ত্রীর পত্র' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ৫৭৬*
৪৬ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বদনাম' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ৭৩১*
৪৭ *ঐ পৃঃ ৭৩২*
৪৮ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গ্রন্থ পরিচয়, গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ৮৫৮*
৪৯ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সমাপ্তি' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃঃ ১৭২, ১৭৩*
৫০ *ঐ পৃঃ ১৭৩*
৫১ *ঐ পৃঃ ১৭৮*
৫২ *রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে, রবীন্দ্র-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ পৃ; ৬৭৮*
৫৩ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পগুচ্ছ বিশ্বভারতী, ১৩৯৮*
৫৪ *ফরহাদ মজহার, এবাদতনামা প্রতিপক্ষ, ঢাকা, ১৩৯৬, পৃঃ ৮*

আমিষ খনিজ লবন এবং কালজিরা

সালেহা চৌধুরী

দরজায় একবার বেল বাজতেই দরজা খুলতে এগিয়ে আসে পলা। ও ভেবেছিল বান্ধবী পাপিয়া হয়ত এসেছে। না হলে অত্রি। পলা যাকে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, চমকে যায়। একটু সামনে গিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া মেটাতে সাহায্য করে। নিজের হাতে সুটকেস তুলে নিয়ে বলে–তুমি! কোন খবর না দিয়ে?

কেন আমাকে আশা করিসনি বুঝি?

মা'র কথার ধরণ থেকে পলা কিছু বুঝতে পারে না।

না। কারণ হুট করে তুমি বাড়ি ফেলে চলে আসবে ভাবিনি। কখনো তো কোথাও একা যেতে দেখিনি তোমায়। মাকে এসে সযত্নে বসায় বসার ঘরে। এক টুকরো ফ্ল্যাট বাড়িতে বাস তার। মোটামুটি একটি বেডরুম আর একটি লিভিং রুম। সারে ছয়শো স্কয়ার ফুটের একটি পায়রার খোপ বাড়ি। যা ও কিনে ফেলেছে নিজের রোজগার ও সঞ্চয়ে, কারো সাহায্যে নয়। যেখানে নিজের শোবার ঘর আছে তার সঙ্গে আছে একটি পায়রার খোপ। বক্সরুম। মা হয়ত সেখানে থাকতে পারবেন। প্রথমে থাকার চিন্তা মাথায় আসে পলার। সেই ঘরে দেয়াল আলমারিতে ওর বই পত্র। লেখার বিবিধ জিনিষ। ইজেল, তুলি, ব্রাশট্রাশ। একটি ইলেকট্রিক বিছানা বাতাস ভরলেই ঘুমানোর উপযুক্ত হয়। যেটা এমনি সময় খাটের নিচে রাখে ও। ওটা পলা কিনেছে পাপিয়া, মিমিদের জন্য। অত্রি? না অত্রির জন্য নয়।

মা বলেন– বাথরুমটা দেখিয়ে দে আগে।

মা হাত মুখ ধুয়ে সুন্দর হয়ে যখন গুছিয়ে বসেন পলা এসে মার কোলের কাছে বিড়াল ছানার মত চুপটি করে বসে। পলার বয়স বত্রিশ বছর ছয়মাস। মায়ের বয়স আটান্ন। গত বিশ বছর মা একজন মানুষের কারণে বাড়ির বাইরে যান নি। মানে বাড়ি থেকে কোনখানে রাত্রি যাপন করতে বা যাকে বলে বেড়াতে যাওয়া হয়নি তার। মা বাবার সেবা যত্ন করেছেন একটানা বিশ বছর। পলা ঢাকাতে। মা আর বাবা রংপুরে। পলার যাওয়া হয়নি বার বার সেই বাড়িতে যদিও তার ছেলেবেলার বাড়ি। কলেজে ঢোকার আগে পর্যন্ত ও বাড়িতে ছিল। মাঝখানে কলেজ, য়্যুনিভার্সিটি শেষ করে ও দেশের বাইরে ছিল। তারপর ফিরে এসেও নিয়মিত যাওয়া হয়নি। বাবার সঙ্গে চিরকালই দূরত্ব ছিল ওর। ফলে বাবার এই অসুস্থতায় তাকে দেখবার যে হৃদয়গত তাগিদ থাকবার কথা ছিল তেমন কোন তাগিদ অনুভব করেনি পলা। তবে কর্তব্যের খাতিরে মাঝে মধ্যে। যখন জেনেছিল বাবার মৃত্যুর কথা একটু অবসন্ন হয়ে পা দুটো একটু থমকে গিয়েছিল। বেশ

কিছুসময় হাঁটতে পারছিল না ও। তারপর হেঁটে এসে কোনমতে লেপের তলায় ঢোকার পর লেপটা কয়েকবার কেঁপেও উঠেছিল। পলার মনে পড়েছে মিরসল্টের আউটসাইডারের কথা। যে মায়ের মৃত্যুদিনে কাঁদতে পারে না তার ফাঁসি হওয়া উচিত। লেখা ছিল উপন্যাসে। ও সবসময় ভাবতো ওর ঘটনাটিও অমন হবে। বাবার মৃত্যু খবর পাবে ও কাঁদতে পারবে না। কিন্তু ও কেঁদেছিল কেন বাবার সঙ্গে ওর একটা চমৎকার সম্পর্ক হল না হয়ত সে কথা ভেবে। যখন বাবার বুকে মুখ রেখে কাঁদা যেত, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যেত, তখন বাবা রইলেন এমন কঠিন হয়ে পলা তাকে ছুঁতে পর্যন্ত ভয় পেত। স্কুলে দিয়ে বাবা গাড়িটা নিয়ে শাঁ করে চলে যেতেন। পলা কয়েকবার একটা অপসৃয়মান ছায়াকে ধরবার জন্য দুহাত বাড়িয়েছিল কিন্তু বাবা তখন অনেকদূরে। এমনি ঘটনাগুলো লেপের তলায় পড়ে থাকা পলার মনে পড়তে লাগলো। লেপটা স্থির হল ঠিক ওর মত। একটা কঠিন ঈস্পাতের তলায় পলার শরীরটা ঢাকা পড়ে গেল।

পরদিন একা মায়ের সঙ্গে কথা বলবার সময় তার কণ্ঠস্বর হয়ত একটু বাষ্পভেজা ছিল। কিন্তু মাও তো মেয়ের কণ্ঠস্বরে ফোনের ওপারে কেঁদে ভাসাননি। মাকি কেবল দায়িত্ববোধে? পলা কি করে বলবে। মা কখনো এসব নিয়ে কিছু আলোচনা করেন না। ফোনের ওপারে মার গলার স্বরটা ছিল চাপা। নিরুত্তাপ ও আবেগশূন্য। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করেছিল–মা আমি কি আসবো?

তোমার নতুন বুটিক শপ কেবল শুরু করেছ। এখন কি আসতে পারবে?

পারবো। তখন পলা যদি বলতো সে আসতে পারবে না মা খুব বেশি আবাক হতেন বলে মনে হয় না। তারপর একটু গতানুগতিক কথাবার্তা। এরপর ফোন রেখে ও ভাবে ওকে যেতে হবে। মাকে দেখতে। সেই সময় ও একটা প্রশ্ন করেছিল মাকে – মা বাবার শেষ কথা কি ছিল?

ঘুমের ভেতরে মারা যান। আগের রাতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন তীব্রভাবে বলতে চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি বলতে। ওটাই তো ওর চরিত্র। যা বলতে চেয়েছে পারেনি। সারাজীবন এইতো দেখলাম।

তারপর গভীর রাতে মাকে আবার ফোন করেছিল – মা তোমার কি ঘুম হবে? একেবারে একা।

ওরা আছে না। তাছাড়া আগামীকাল তো তুই আসছিস!

ঢাকা থেকে প্লেনে সৈয়দপুর। তারপর রংপুর। তাও মাত্র দুদিনের জন্য। বাবার বিছানাটা খালি। সাদা সফেদ শূন্য একটি বিছানা। সেই বিছানার পাশে বসে বাবার এক দূর সম্পর্কের বোন কোরনশরিফ পড়ছেন। লোবানের সুবাস ঘরে। পবিত্রতা চারপাশের আবহে। মার পরণের সাদা শাড়িটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। তার নাকের হিরের ঝিকমিক নাকফুলটা ছিল না। ওই হিরের ফুলটা পলার বড় পছন্দ ছিল। মার হাতে এখন

অখন্ড সময়। কি করবেন মা তার সময় দিয়ে? ভেবেছিল ও একবার। মার পায়ের কাছে বেড়ালছানার মত বসে কোলে মাথা রেখে কেঁদে উঠেছিল একবার। এবং মাও।

এখন মাকে বড় সাবলীল মনে হয়। যেন বিশ বছরের বোরখা খুলে একটি নারী শরীর বেরিয়ে এসেছে। মা বরাবর স্লিম। এখন তার পরণের শাড়িটা কালো আর খয়েরিতে মেশানো বলে তাকে আরো স্লিম মনে হয়। তার হাতে দুটো সরুবালা। নাক ও কান খালি। গলার সেই চেনটা আছে। যেখানে ছোটবেলায় পলা কামড়ে লকেটে একটা টোল ফেলে দিয়েছিল। মা খানিকপর তার গলা থেকে সেই বাঁকা চোরা লকেটের চেনটা ওকে পরিয়ে দিয়ে বলেন–এইটা তোর। পলা জানে ও মালা ফালা পরবে না। তবু মাকে খুশী করতে বলে–এখন এটা আমার? বাঃ। তারপর বলে–মা তুমি কি আমার এখানে এসেছো? কতদিন পর তুমি বাড়ি থেকে কোথায় বেরুলে মা।

মা উত্তর না দিয়ে পলার চুলে হাত বুলিয়ে দেন। ইস্ কোমর ছোঁওয়া চুল একেবারে বব?

সামলাতে সুবিধা।

বিদেশে গিয়েই এমন কাজটা করলি তুই।

পলা হাসে।

তারপর পলার সঙ্গে মা ঘুরে ঘুরে ওর এক চিলতে সংসার দেখেন। পলার শোবার ঘরে মানানসই বড় বিছানা। পাখি আর হাতির ছবি আঁকা বেডকভার। ওর বুটিক শপের হয়তো। একটি বড় কাডলি ভালুক। যেটা দেখে মা হাসেন। দেয়ালে পলার ছবি। আর একটি মার আর পলার। অন্য দেয়ালে পলার হাতে আঁকা একটি ছবি। পাশের বাক্সের মত ঘরটাতে পলার ছবি আঁকবার ইজেল। একটি কম্পিউটার। একটুও খালি জায়গা নেই। যখন ইলেকট্রিক বেডটাকে ফোলানো হয় ইজেল গোটানো হয়। মা বলেন-এখানেই আমি ঘুমোব।

মোটেই না। তুমি আমার ঘরে ঘুমোবে।

না এখানে। কি আঁকছিলি রে পলা? একটি অর্দ্ধসমাপ্ত ছবির দিকে মা তাকান। পলা বুটিক শপের ফাঁকে খুব চমৎকার ছবি আঁকে। – একটা বইয়ের কভার করছি। দশটা করতে হবে। অত্রির কাঁধে কিছু চাপিয়ে দিয়েছি। ও আজ সন্ধ্যায় আসবে ছবিটা শেষ করতে। মা তুমি কিছু মনে করবে যদি ও আসে?

না। কি মনে করব। মা দু একবার অত্রির নাম শুনেছে। এখনো আলাপ হয়নি।

তুমি না চাইলে ও আসবে না।

কি মুশকিল। আসতে বল। আমি কিছু মনে করবো না।

তারপর মা এক চিলতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। টবে গুটিকয় গাছ। পাতাবাহার আর ক্যাকটাস। তারপর দশতলার ব্যালকনি থেকে আকাশ। চোখে পড়ে নিচের জগতটাও।

তিনি তাকান না। একটু একটু ভার্টিগো আছে তার। পলা প্রশ্ন করে না মা কতদিন থাকবে। মাও কিছু বলেন না। বলে পলা মাকে– এখানে ছোটখালা আছেন যাবে না?

ফোনে কথা বলি আগে। ও একটা নম্বর ওয়ান পাগলি, এই বলে মা একটু স্নেহভরা চোখে হাসেন। পলা ভাবে বেশ লাগছে মাকে দেখতে। যেন দশতলার এই ব্যালকনিতে পলা আর তার বিশেষ কোন বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। পলা মাকে জড়িয়ে বলে – তোমার যতদিন ইচ্ছা তুমি ততদিন থাক মা।

তোর আর একটা বাড়ি হলো রংপুরে। দুটো বাড়ির তোর একটা আমার একটা। মারা যাবার আগে তোর বাবা হাবা করে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলে দুটোই নিতে পারিস।

আপাতত দুটোই তুমি দেখাশোনা কর। তোমার বাড়ি, আমার বাড়ি, সবকিছু। জমিজমা। পুকুর। বাগান। মার চুলের যেটুকু ধূসর পলা সেখানে তাকিয়ে বলে–মা ওই জায়গাটায় ডাই করে ফেললে বেশ হবে। এখনো তোমার অনেক চুল। মা হাসেন। বিশ বছর একটা মানুষ যখন নিজের ইচ্ছেমত সবকিছু করতে পারে তার কাছে সবকিছুই অসাধারণ মনে হয়। কিম্বা সবকিছুতেই অপার কৌতুহল। কিম্বা একটা বোরখা সরে গিয়ে একটি শরীর যখন বেরিয়ে আসে সেকি নিজেকেই বার বার দেখে না? না হলে খোলস খুলে একটা ক্যাটারপিলার যখন প্রজাপতি হয়। এই তুলনাটা পলার ভাল লাগে না। মাকে প্রজাপতি ভাবতে।

গোসল সারা হলে মা যখন আর একটা হালকা নীল শাড়ি পরেন পলা তাকায় মায়ের দিকে। বলে–কাল তোমাকে নিয়ে যাব হেয়ারড্রেসারের কাছে। মা হাসেন।

অত্রি এল সন্ধ্যাবেলাতে। মা চিনতেন না। তিনি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তারার আলো দেখছিলেন। পলা আটটার আগে ফিরবে না। অত্রিও জানতো না মায়ের কথা। পলা বলতে ভুলে গেছে। শব্দ শুনে মা পিছু ফেরেন। একটি মানুষের ছায়া তার চোখের সামনে। ছেলেটি বলে – 'সরি'। ছেলেটা এল কেমন করে? একবার ভাবেন। তারপর বুঝতে পারেন এ বাড়িতে যখন তখন আসবার মত চাবি আছে পকেটে। মা ভেতর থেকে লক করতে ভুলে গেছেন।

তুমি বুঝি অত্রি?

হ্যাঁ আমি তাই।

তারপর বসবার ঘরের আলোর নিচে দাঁড়াতেই অত্রির পাঞ্জাবির উপরের দুটো খোলা বোতাম চোখে পড়ে। যেখানে অত্রির বুকের একটু খানি স্পষ্ট মা সেখান থেকে বেশ কিছুক্ষণ চোখ ফেরাতে পারেন না। অত্রি হয়তো খেয়াল করলো কিন্তু সেই কারণে সাত তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবির বোতাম লাগায় না। অত্রির চওড়া কাঁধ, চমৎকার চুল, সাদা দাঁতের মিষ্টি হাসি, শ্যামল রং, বেশ একটু বাহরি গোঁফ দেখলেন মা। – আমি কি ছবি আঁকতে পারি? পলাকে একটু সাহায্য করা। বেশিক্ষণ লাগবে না শেষ করতে।

হ্যাঁ। মা বলেন। তারপর নিজের ঘরে চলে যান। ছোট বোনটাকে একটা ফোন করতে

হবে। নাম্বার ডায়াল করতেই রিমি ফোন ধরে। –বুবু তুমি ঢাকাতে?

হ্যাঁরে ছোট।

এবারে বল কেমন আছো?

খারাপ নয়।

আমার কথামত আমিষ খাও নিয়মিত? পায়ের ক্রাম্প সেরে যেতে?

খাই।

প্রোটিন তোমার ওষুধ। ও ভাল কথা আমি তোমাকে খনিজ লবন খেতে বলেছিলাম, খাচ্ছো?

বলেছিলাম ক্লান্তি লাগে, তখনই তুই পোটাসিয়াম, ম্যাংগানিজ, আর কি কি সব খেতে বলেছিলি। খাচ্ছি তা।

ও গুলোর ইংরাজি নাম মিনারাল। বাংলা নাম খনিজ লবন। কলা, ছোলা, ফল, এসবে খনিজ লবন আছে। খাচ্ছ?

তোর কথামত খাচ্ছি। হার্বাল মেডিসিনে পিএইডি করবার বাসনা নাকি তোর?

এই ফোক মেডিসিনই আমাদের ভবিষ্যত। জান প্রতিটি অসুখের জন্য একটি গাছ গাছড়া, শেকড়, পাতা, ফল, রস আছে। আমি সেটা প্রমাণ করে ছাড়ব।

তার মানে সত্যি সত্যি তুই পিএইচডি করছিস।

ডিএসসি ইন হার্বাল মেডিসিন বলতে পার বুবু। এবার বল তুমি কালজিরা খাচ্ছো নাকি? হট ফ্লাশ, মুড সুইং মানে মেনোপজের নানা বিধ হাবিজাবি উপসর্গ থেকে বাঁচতে। আমি অনেককেই খেতে বলেছি। সকলেরই কাজ হচ্ছে। মা ফোনের ওপারে হেসে ফেলেন। – তোর কথামত কালজিরা গুঁড়ো করে রুটিতে লাগিয়ে খাই। আসবার সময় এক কৌটো সঙ্গে এসেছি। অভ্যাসও হয়ে গেছে। কখনো ভাতে খাই। গন্ধটা চমৎকার।

শোন বুবু আজকাল অনেক মেয়ে এইচ আর টি নিতে শুরু করেছে। যাকে বলা হয় হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। সেটার নানা সাইডএফেক্ট আছে। অনেক ডাক্তার মেনোপজের পর মেয়েদের বলেন এইচ আর টির কথা। কিন্তু তুমি যদি কালজিরা খাও একই কথা। কারণ কালজিরা আর কিছু নয় পিওর হরমোন। মনে আছে তোমার মেয়ে হওয়ার পর মা তোমাকে কালজিরা ভর্তা করে খাওয়াতেন। কারণ জান?

তা জানি। অনেকদিন আমাকে অস্টারমিল্ক কিনতে হয়নি।

দ্যাটস ইট বুবু। কালজিরা আর কিছু নয় পিওর হরমোন।

আমার এত হরমোন দিয়ে কি হবে রে?

মুড সুইং, হট ফ্লাশেশ, পেসাবে জ্বালা যন্ত্রণা এগুলো খুব এনজয় কর নাকি?

না। তবু।

তবু টবু নেই। কালজিরা খেতে থাক কখনো হরমোন ইমব্যালান্সে ভুগবে না।

প্রেটিন পায়ের ক্রাম্পের জন্য, খনিজ লবন ক্লান্তি দূর করবার জন্য, আর কালজিরা হরমোন ঠিক রাখবার জন্য।

যা বলিস। আর একটু সুগারের মত হয়েছে। তার জন্য কি করবো?

কি করবে? প্রতিদিন মেথি পানিতে ভিজিয়ে এক গ্লাশ করে খাবে। রাতে ভেজাবে সকালে খাবে। মেথির ইংরাজি নাম ফেনুগ্রিক। এই মেথি, মৌরি আর ধনে একই পরিবারের সব। ওদের কাজ হলো কিডনি ঠিক রাখা। ইংরাজিতে যাদের বলে ফেনেল পরিবার। তুমি আপাতত কেবল মেথির পানি খাও। ওতেই কাজ হবে।

মা হেসে ওঠেন। ফোনের ওপার থেকে রিমি বলে–ফর গডস সেক বুবু আমার কথা একটু সিরিয়াসলি নিও।

গত দশ বছর হলো নিচ্ছি।

দেখা হলে আরো কিছু হার্বাল মেডিসিনের কথা তোমাকে বলবো। প্রাচীন মুনি ঋষির মত একশো বছর বাঁচবে। আরে বাবা অর্থব বেদে যত গাছপালা আছে সেগুলোর কথা যদি মানুষ জানতো।

তুই অর্থব বেদ পড়েছিস নাকি?

সাধে বলছি ডি এস সি? যা বলছি করবে। মেয়ের বাড়িতে কয়দিন থেকে আমার কাছে চলে এস। এ বাড়ি বড়। খোলামেলা। ছাদও আছে। তোমার ভাল লাগবে। বাগানে নানা সব গাছপালা। চলে এস। আরো কথা হবে।

এখন করছিস কি?

লতাপাতার গুণাগুণ বা গাছ পাতা বাকলের উপর বই লিখছি। আজ একটা দারুণ চ্যাপ্টার লিখলাম। দারুচিনির উপর।

সে কেমন? উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে মা।

শোন ভাস্কো ডা গামা যখন দ্বীপ অনুসন্ধানে বেরোয় তখন কেপ অফ গুড হোপ পার হয়ে একসময় সিংহলের মাকাও নামের এক জায়গায় যায়। সেখান থেকে যে জিনিষটি তিনি আবিষ্কার করেন তার নাম দারুচিনি। একটি গাছের ভেতরের বাকল হল দারুচিনি। চিনামনিয়াম ভেলুরা এর বোটানিকাল নাম। দারুচিনির গুণের সবচেয়ে বড় কথা হলো এ নারী ও পুরুষের লিবিডো বাড়িয়ে দেয়।

লিবিডো? সে কি জিনিষ?

এল আই বি আই ডি ও। অন্যের বেলায় কাম শক্তি আর তোমার বেলায় কর্ম শক্তি। যেমন কালজিরা।

ছি ছি এসব কি বলছিস।

সারা পৃথিবী চলছেই এই জিনিষের উপর। আর তুমি বলছো ছি ছি। ভায়াগ্রার নাম শুনেছো না শোননি?

তুই না ভারি ফাজিল হয়েছিস।

বইটা বেরুক আগে। ফাজলামির দেখেছো কি? একটু থেমে বলে- জানি বাবা জানি এসব ব্যাপার তোমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে কোটি কোটি বছর আগে। সরি বুবুজান এসব বলার জন্য।

থাক তোর আর সরি করতে হবে না।

তারপর এই দারুচিনি নিয়ে কি হল জান? পর্তুগিজ আর ডাচদের মধ্যে লাগলো গোলমাল। তারপর ওর দাম বাড়ানো হলো। কারণ ততদিনে লোকজন ওর বিশেষ গুণের কথা জেনে গেছে। তুমি কি মনে করেছো ভাস্কো ডা গামা কেবল দ্বীপ আবিষ্কার করতে গিয়েছিল? মসলাপাতিও বটে। এখন আরব বিজ্ঞানীরা এর উপর জোর গবেষণা শুরু করেছে। সে সময় মেয়েরা দারুচিনির পাউডার চুলে মাখত। আর শোবার সময় গালের ভেতর এক কুচি রেখে দিত। জিজ্ঞাসা কোরো না কেন? তুমিও গালের ভেতর এক কুচি রাখতে পার। পেসাবের চিনি কমে যাবে। ওরা কি জন্য খেত?

আমি জানি। এল আই বি আই ডি ও।

ইউ আর গেটিং দেয়ার। তারপর প্রবল হাসি। – এলে আরো নানা গল্প শুনবে। কবে আসছো?

আরো কিছু আবোল তাবোল কিম্বা এমনি কিছু হার্বাল কথাবার্তার পর ফোন রাখে দুই বোন। মা আপনমনে হাসেন। ছোটটা তেমনি আছে। একটু আদর আর ভালোবাসা বোনটির জন্য। একজনের চাইতে আর একজন ষোল বছরের ছোট।

আমি যাচ্ছি। কাজ শেষ করে বলে অত্রি। কাজে গরম লাগছে বলে আর একটি পাঞ্জাবীর বোতাম খোলা তার। চুলগুলো ফ্যানের বাতাসে এলোমেলো। বলে ও –কাল আবার আসতে হবে। একটু কাছে এসে মা দাঁড়ান। ছেলেটার গায়ে বেশ একটু কড়া ডিয়োডোরান্টের গন্ধ। সঙ্গে ঘাম মেশানো। মা ব্লাশ করেন কারণ বিহীন ভাবে। অত্রি বলে–কাল একবার এলে কাজটা শেষ হবে। কাল ছটার দিকে একবার আসবো। আপনি কি বাড়িতে থাকবেন। অত্রি মাকে চিনে ফেলেছে। দেয়ালে মা আর মেয়ের ছবি আছে না।

পলা থাকবে না। আমি থাকব। ও ফেরে রাত আটটায়।

হেসে বলে অত্রি–আমি জানি। তারপর যখন দরজা দিয়ে ওপারে যায় অত্রির স্পর্শ লাগে তার শরীরে। দরজা বন্ধ করে মা। একজন নিটোল তরুণের চেহারা ভাবেন। ঘাম ভেজা ডিয়োডোরান্ট আর চমৎকার শরীর। রিমির কথা গুলো মাথার ভেতর পিং পং বল খেলছে। কি বাজে একটা শব্দ বললো লিবিডো। কারজিরা আর হরমোন। দারুচিনি। ভায়াগ্রা। কি যে বাজে কথা বলে না ও। ছোট বেলা থেকেই অমন। তিনি আঁচলে মুখ

মোছেন।

রাতে মেয়ে বাড়ি ফিরে আসে। – আগামীকাল তোমার চুলে রং আর কাঁচি পড়বে। মনে আছে?

রং বুঝলাম। কাঁচি কেন?

সে যখন পড়বে বুঝবে তখন।

মা কি ভাবতে ভাবতে একসময় বলেই ফেলেন – তুই কি অত্রিকে বিয়ে করবি?

করতেও পারি। এখনো ঠিক করিনি।

তা প্রায় চারবছর হলো জানাশোনা তোদের, এখনো ঠিক করিস নি। এখনো বোঝা হলো না তোদের? বাবাকে পঁয়ত্রিশ বছরেও কি তুমি ঠিকমত বুঝেছিলে মা?

মা এ কথার উত্তর দেন না। তারপর মেয়ে কথার বিষয় বদলে বলে – তোমাকে বলা যায় কাকবন্ধ্যা। ঠিক হলো না। তোর পরে একটা ছেলে সাতমাসে নষ্ট হয়ে যায়। তারপর দোষ পড়লো। মা চুপ করেন। কি মজা হতো আমার একটা ভাই থাকলে।

একটা ছেলের সখ আমারও ছিল। হল না। মা খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন – সেবা ছাড়া তোর বাবাকে আর কিছু দেওয়া গেল না। নেবার ক্ষমতা সবার থাকে না। তারপর মা আর মেয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ। মা বলেন আবার–যদি অত্রিকে বিয়ে করবি বলে মনস্থির করতে না পারিস অন্য কাউকে কর। বয়স তো কবে তিরিশ পেরিয়ে গেছে।

বিয়েটা কি খুব জরুরি?

একার জীবন।

একার জীবন আর কোথায়? কত জন আছে।

মা এতদিন মেয়েকে এত কাছে থেকে এতসময় ধরে দেখেননি। মনে হয় চিন্তা ভাবনায় মেয়েটা এখন অনেক দূরে চলে গেছে। অন্য জগতের একজন। বোধকরি দুই বছর সুইডেনে থাকার ফল।

কতজন দিয়ে কি হবে? ছেলেপুলে চাই না তোর? বলছিলি একটা ছোট ভাই থাকলে বেশ হতো।

সেতো যে কোন সময় হতে পারে। তার জন্য বিয়ে করতে হবে নাকি?

মা এবার স্পষ্ট চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকান। বড় আলোটা জ্বালান। – মতলবটা কিরে তোর পলা? লিভ টুগেদার, সিংগল পেরেন্টে ফ্যামিলির পশ্চিমী রীতি নিয়ে ভাবছিস নাকি? ও সব আমাদের সমাজের জন্য নয়। এবার মাকে জড়িয়ে হেসে ওঠে পলা। –ভয় পেলে তো? আমার জন্য ভয় করতে হবে না, ভাবনাও নয়। শোন

মামনি, কাল প্রথমে তোমার চুল তারপর ফেসিয়াল।

কেন?

আমার ইচ্ছে, তাই। রিলাক্স করবে একটু। মেয়েরা তোমার চুল আর মুখের চেহারা নিয়ে প্যাম্পারিং করবে। ভালো লাগবে দেখ। ক্ষতি নেই এতে। গান শুনবে। তারপর আয়নার দেখবে আর জানবে আর একজন তোমাকে দেখছে।

ঠিক আছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত তোর জন্য কি সাজতে হয় আমাকে।

ছ'টায় যখন অত্রি আসে মাকে চিনতে পারে না। চুলগুলো সুন্দর করে কাটা। মুখের পালিশে রং জ্বলজ্বলে। কাকের পাখার মত কাল চুল। চকচকে। সামনের দিকে কাঁচির শাসনে মনোরম। অত্রি একটু বিস্মিত ও মুগ্ধ মা বুঝতে পারেন। শিশি মালতির হালকা রং তার ঠোঁটে। মার খুব কাছে দাঁড়িয়ে অত্রি গল্প করে। যেন মাকে একটু কমপ্লিমেন্ট করতে চায় সে। যেন মাকে বলা – বেশ লাগছে এখন আপনার পাশে দাঁড়াতে। একটা নতুন গন্ধ অত্রির গায়ে। মা গল্প করতে করতে হেসে ওঠেন। এমন করে হাসতেন তিনি দীর্ঘকাল আগে। তার নখের রং চোখে পড়ে অত্রির। হাত পায়ের যত্ন ও মুখের আভা। অত্রি ভাবে ইজেলে এই মুখটা চমৎকার হয়ে ফুটে উঠতে পারে। সে ছবির নাম হতে পারে নারী। ফলসা শাড়িতে আতরের সুবাস। এবং লাল ব্লাউজের হাতায় ফুল ফুল কাজ চোখে পড়ে। কানে দুটো লাল পাথর। ছোট কিন্তু টলটলে। দুলটা পলার কানে দেখেছে অত্রি। মা ড্রেসিং টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পরেছেন। উপরের তারা ভরা আকাশটায় অর্দ্ধেক পূর্নিমার চাঁদ। আর ব্যালকনির বাতাসে মার শাড়ির আঁচল এসে পড়ে অত্রির গায়ে। দুজনে দাঁড়িয়েই পূর্ণ করেছেন ব্যালকনি। কথা বলতে বলতে একটু নিচে তাকাতেই মার মনে হলো তার মাথাটা ঘুরে গেল। ভার্টিগোর মত কোন ব্যাপার। মা পড়তে পড়তে নিজেকে সামলাতে চান। অত্রি দুহাত বাড়িয়ে মার পতন রক্ষা করে। অত্রির দুই হাতের ভেতর মায়ের দম বন্ধ হয়ে আসে। তার সারা শরীর জেগে উঠে মাকে তার চেনা আবহ থেকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়। মার কি জ্বর আসছে? তারপর একসময় দুই হাতের ভেতর থেকে ফিরে আসেন।

আপনি কি ঘরে যাচ্ছেন বিশ্রাম নিতে? তিনি মাথা নেড়ে বলেন তাই। মা ঘরে এসে সটান শুয়ে পড়েন বিছানায় কাডলি ভালুকটাকে বুকে জড়িয়ে। আলো আঁধারিতে মিশে যান। অত্রি কি বলতে এসে দরজা থেকে ফিরে যায়। মার পানি চাই বা এমনি কিছু। তারপর অন্ধকার থেকে আলোতে এবং নিচে নামে অত্রি। অত্রি আর কোনো কাজ করে না সে রাতে। সিঁড়ি দিয়ে কি ভাবতে ভাবতে পৃথিবীতে নেমে মাটিতে পা রাখে।

তুমি আমাকে না বলে চলে গেলে কেন মা? দিন কয়েকপর পলার ফোন পান।

শরীরটা ভালো লাগছিলো না। তা ছাড়া জরুরি কিছু কাজ মনে পড়ে যায়।

তুমি ছোটখালার বাড়িতে যাওনি।

ওর হার্বাল বই নিয়ে মহাব্যস্ত। বিরক্ত করতে চাইনি। এরপর ওপারে খানিক নিস্তব্ধতা। কি যেন বলতে চায় পলা। তারপর প্রশ্ন করে সে–মা তুমি কি এখন হজ্বে যাবে?

না। এমন প্রশ্ন কেন? পলা কোন উত্তর দেয় না।

খানিকপর বলে–আমি কিছুদিন পর আসছি। ওখানে কিছুদিন থেকে তোমাকে নিয়ে দার্জিলিং যাব। তুমি আর আমি। কতদিন তুমি কোথাও যাও নি। জানো মা দার্জিলিং-এ আজকাল বাস চায়। শিলিগুড়ি থেকে জিপ। সাতদিন তুমি আর আমি সুর্য ওঠা দেখব। মজা হবে খুব। তোমার পা দুটো এখনো হাঁটতে পারে। বাত কাত ধরেনি। ছোটখালা যা যা বলেন খেতে থাক।

কেবল তুই আর আমি? মা ঠিক বুঝতে পারছেন না।

কেবল তুমি আর আমি। মা সেই গল্পগুলো কি তোমার মনে আছে?

যে গুলো তোকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে শোনাতাম?

সেগুলো। মা তোমার মিনারাল, কালজিরার বোয়াম রেখে গেছ। আসবার সময় ওগুলো আনব?

না। থাক। একটা শরীর ঠিক রাখতে এতসব। ওসবে দরকার নেই।

শরীর ঠিক রাখতে চাও না বুঝি?

ও এমনিতেই ঠিক থাকবে। তোর ছোটখালা আমাকে একটা গিনিপিগ বানাতে চায়। ও একটা আস্ত পাগল।

যখন কথা শেষ হয় রাত গভীর। মা সোজা রান্নাঘরে চলে যান। মার মনে আছে আয়নায় ভেসে ওঠা একটা অপরিচিত মুখের কথা। হঠাৎ করে বিশ বছর ঝরে যাওয়া মুখ আর শরীর। ভার্টিগো বলেই কি শোবার ঘরে গিয়েছিলেন? সত্যি কারণ মা ঠিক বুঝতে পারেন না। এখন সব কেমন এলোমেলো। সাটিনের ছল ছল বিছানায় কাডলি ভালুকটাকে বুকে জড়িয়ে অন্ধকারে ঝিম মেরে পরে থাকা মা। দরজায় যখন পায়ের শব্দ? তার শরীরটা ঘেমে নদী হয়ে উঠেছিল। কালজিরা, দারুচিনি, হরমোন, লিবিডো, এখন সব উড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেন। পাখির পাখার মত উড়ছে কালজিরা, তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ। সব। কার মধ্যে যে কি থাকে কে জানে। সেদিন ছিল আর্দ্ধেক চাঁদ। এখন পূর্ণ চন্দ্র। লুনাটিক রাত।

বেদনার কী রং

হাসান ফেরদৌস

নিউজার্সির ইউনিয়ন টাউনশিপ, না শহর-না গ্রাম। নিউইয়র্ক শহর থেকে মাইল বিশেষ দূরে হবে। ঠিক তার বুকের ওপর কয়েক শ’ একর জায়গা নিয়ে কেন্ ইউনিভার্সিটি। ১১ হাজার ছাত্রের ক্যাম্পাস, তাদের অধিকাংশই এ অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে ট্রেনে, বাসে ও গাড়িতে করে পড়তে আসে। সে জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় ‘কমিউটার ক্যাম্পাস’ হিসেবে। ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই শ্বেতকায়। অল্প কিছু দক্ষিণ এশীয় রয়েছে, তাদের মধ্যে জনা কয়েক বাঙালিও।

৯ ডিসেম্বর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাথান ওয়াইজ গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের আমন্ত্রণে আমরা শ’খানেক বাঙালি জড়ো হয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লিটন থিয়েটারে। সঙ্গে আরও পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর জন আমেরিকান। ঘরে তিল ধারণের জায়গা নেই। যারা দেরি করে এসেছে, তারা রইল শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ মাটিতে বসে। অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলোকস্ট ও জেনোসাইড স্টাডিজের প্রধান সমন্বয়কারী এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক প্রফেসর বার্নাড ওয়াইনস্টিন সবাইকে অনুরোধ করলেন, ‘আসুন, আমরা এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত ৩০ লাখ বাঙালির স্মরণে নীরবতা পালন করি।’

মাত্র এক মুহূর্তের নীরবতা; কিন্তু সে মুহূর্তটি আপনাদের কাছে বর্ণনা করি -- সে ভাষাজ্ঞান আমার নেই। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের প্রায় অজ্ঞাত, নিভৃত এক শহরে দাঁড়িয়ে আমরা কেন একাত্তরের শহীদদের কথা স্মরণ করছি? এরা কারা আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে বাঙালি শহীদদের কথা ভেবে উঠে দাঁড়িয়েছে? আমার পাশে দাঁড়িয়ে যে প্রৌঢ় ইহুদি দম্পতি, তাঁরা এই আমন্ত্রণ পাওয়ার আগে বাংলাদেশ নামের এই দেশটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কেবল এর নামের সঙ্গে। ঠিক কোথায় সে দেশ, সে সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা তাঁদের নেই। তিন তরুণী, তাঁদের একজন কৃষ্ণকায়, জানালেন, বাংলাদেশ নামের এ দেশটির কথা তাঁরা জেনেছেন ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ নামের একটি অ্যালবাম থেকে। ব্যস, আর কিছু তাঁরা জানেন না। অধ্যাপক ওয়াইনস্টিনও স্বীকার করলেন, প্রায় অপরিচিত এই দেশে ৩৬ বছর আগে এক অভাবনীয় গণহত্যা ঘটে গেছে, এ কথা তিনি পর্যন্ত ভালোভাবে জানতেন না।

তাহলে, রোববার, শীতকাতর এমন এক বিকেলে, কেন তাঁরা এখানে জড়ো হয়েছেন?

বিশ্ববিদালয়ের সভাপতি, দাউদ ফারাহি, সে কথা ব্যাখ্যা করে বললেন। তিনি নিজে আফগান, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের নাগরিক। ১৯৭২ সালে তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে একবার গিয়েছিলেন বাবার সঙ্গে। তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির অবস্থা নিজ চোখে দেখার সুযোগ হয় তাঁর। তিনি বললেন, '৩০ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে জাতিগত বৈষম্যের কারণে। বিশ শতকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, এমন ভয়াবহ মানবেতর ঘটনা আর ঘটেনি। এ কেমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে আমরা সে ঘটনা মনে রাখব না, অথবা সে ঘটনা থেকে কোনো শিক্ষা নেব না? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সংঘটিত নির্মম হলোকস্টের পর কি আমরা বলিনি, 'আর নয়, আর কখনোই এমন গণহত্যা নয়?'

পৃথিবীর এই বিস্মৃতি, তা আসলে এক গভীর নৈতিক অপরাধ। আমাদের মানবিকতা প্রকাশিত হয় অন্যের প্রতি আমাদের সহমর্মিতায়। ধর্ম নয়, জাতি নয় বা ভাষা নয়; আমরা এক অন্যের সঙ্গে অন্তর্গতভাবে সম্পৃক্ত শুধু আমাদের 'মানুষ' পরিচয়ে। এই সম্পৃক্ততার জন্যই আমরা এক অন্যের কাছে দায়বদ্ধ। এই দায়বদ্ধতা থেকে আমরা নাৎসি হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করি, গৃহহীন ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে মিছিলে নামি, ইরাকি শিশুহত্যার প্রতিবাদ করি। এই মানবিকতাই ১৯৭১ সালে ফিলাডেলফিয়ার অতি সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের প্রেরণা জুগিয়েছিল জীবন বাজি রেখে অতিকায় অস্ত্রবাহী পাকিস্তানি জাহাজ শুধু ডিঙি নৌকা দিয়ে ঠেকিয়ে দিতে।

ড. ফারাহি এবং অধ্যাপক ওয়াইনস্টিন জানালেন, একাত্তরের গণহত্যার ঘটনা যাতে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না যায়, সে জন্য তাঁরা একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলাদেশের গণহত্যা বিষয়ে একটি মাস্টার্স কোর্স চালু করতে যাচ্ছেন তাঁরা। এখনো উদ্যোগটি প্রস্তাব আকারে রয়েছে। এক বছরের মধ্যে পাঠ্যসূচী তৈরি করা হবে, শিক্ষক নিয়োগ করা হবে, কর্মসূচিটি চালু রাখার জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হবে। 'আমাদের চেষ্টার কমতি হবে না', তাঁরা দুজনেই জানালেন।

এ উদ্যোগের পেছনে আসল চেষ্টা প্রবাসী বাঙালিদের। তাদের হয়ে এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন ড. নুরুন নবী। তিনি প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা। যখন যেভাবে সম্ভব, সবাইকে একাত্তরের কথা মনে করিয়ে দেওয়াকে তিনি যেন ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যখনই সুযোগ পান, একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের অপরাধের কথা তুলে ধরেন। তাঁরই চেষ্টায় এ অনুষ্ঠানে একাত্তরের গণহত্যায় যারা নিকটজনদের হারিয়েছেন, এমন ১৫টি পরিবারের সদস্য সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ অনুষ্ঠানে স্বজন হারানোর স্মৃতিচারণা করলেন। কেউ হারিয়েছেন বাবা, কেউ হারিয়েছেন ভাই, কেউ বা হারিয়েছেন চাচাকে। হৃদয়ের সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে উষ্ণ স্থানে সযত্নে তুলে রেখেছিলেন যে স্মৃতি; খুব কাছের নয়, এমন কাউকেও যে কথা তাঁরা সহসা বলেন না; সম্পূর্ণ অপরিচিত – এমনকি ভিন্ন ভাষাভাষী একদল মানুষের কাছে সে ঘটনাই তাঁরা বর্ণনা করলেন। বুক ভেঙে আসে বেদনায়, চোখ ভেসে যায় জলে, ব্যথায় ও ক্রোধে বাক রুদ্ধ হয়ে আসে। তবু তাঁরা স্মৃতি হাতড়ে মনে করলেন সেই ঘটনা। যেন মুহূর্তেই আমরা সবাই এক অজ্ঞাত আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি। ঘুচে যায় ভাষার ব্যবধান, জাতিগত ব্যবধান, ধর্মের ব্যবধান। স্মৃতি হয়ে ওঠে আমাদের সবার অভিন্ন মানবিকতা প্রকাশের মাধ্যম।

ড. বার্নাড ওয়াইনস্টিন এ কথাটি আরো স্পষ্ট করে বললেন – 'দেখুন, আমি নিজে ইহুদি। আমরা বলি, মনে করার ভেতর দিয়ে আসে প্রায়শ্চিত্ত– রিডেম্পশন কামস থ্রু রিমেমব্র্যান্স।' তাঁর সে কথা শুনে আমার মনে প্রশ্ন জাগে, একাত্তরের প্রায়শ্চিত্ত করবে কে? এ কি কেবল পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন এই সব শহীদ পরিবারের সদস্যদের একার দায়িত্ব? আর কী-ই বা হবে সে স্মৃতির ঐশ্বর্য নিয়ে, যদি কোনো শিক্ষাই না পাই তা থেকে? বাংলাদেশ তার ইতিহাসের সাড়ে তিন দশক অতিক্রম করেছে। সময় যত বয়ে গেছে, তত ধুলো জমেছে আমাদের সম্মিলিত চেতনায়। কী আশ্চর্য অবজ্ঞায় আমরা একাত্তরের শহীদদের স্মৃতি মাদুরের নিচে ঠেলে দিয়েছি! কী অবাক প্রতারনায় আমরাই সেই একাত্তরের ঘাতকদের জাতীয় নেতার সম্মান দিয়েছি! এমন স্মৃতিভ্রষ্ট ও মানবিকতাহীন জাতি পৃথিবীতে আর কয়টি আছে?

আমি এই লিটল থিয়েটারের আশপাশে তাকাই। চেনা-অচেনা মানুষগুলোর চোখে জল; কিন্তু সে চোখে এক অস্পষ্ট প্রতিজ্ঞাও ঝিলিক দেয়। সে চোখে আমি এই প্রতিজ্ঞা দেখি– বাংলাদেশ তার ৩০ লাখ শহীদকে যদি ভুলেও যায়, আমরা ভুলব না।

লেখক ও কবি পরিচিতি :

কামরুন জিনিয়া

অমল মিত্র : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস। দীর্ঘ ১৬ বছর আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রে বিজ্ঞানী ও ডাক্তার হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে মিসিসিপির হেটিসবার্গ শহরে ইউনিভার্সিটি অব সাদার্ন মিসিসিপির পাবলিক হেল্‌থ বিভাগের অধ্যাপক। বিশেষ গবেষণা পুরস্কারঃ Innovation Award for Applied Research, 2004. প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'কবোষ্ণ কলাপ'।

আনোয়ার শাহাদাত : একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, চলচ্চিত্রকার ও সাংবাদিক (রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংবাদদাতা, আজকের কাগজ)। প্রকাশিত গ্রন্থ—'হেলে চাষার জোয়াল বৃত্তান্ত' (ছোট গল্প), 'সাজায়া তলে মুরগা' (উপন্যাস)। প্রকাশিতব্য—'ক্যানভেসার গল্পকার' (ছোটগল্প)। শর্ট ফিল্মস—এ্যাজ ইট শুড বি, ফলিং লিভ্‌স, টিকেট, প্রিন্টার পারফেক্ট, ন্যানি। ফিচার ফিল্ম—ওস্তাগারের তালিকা (সারকামসাইজার'স লেজার বুক) (নির্মিতব্য)।

আবদুন নূর : গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তিনটি। তাঁর নাটক হিন্দী ও ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। জন্ম ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯। জীবনের প্রায় পুরোটা সময় অভিবাসী। ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে লেখালেখির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। দেশের বিভি সাময়িকীতে তাঁর রচিত গল্প, উপন্যাস ও বিবিধ রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। বেতার নাট্যও লিখেছেন সে সময় এবং পরবর্তীকালে টেলিভিশনের জন্য। প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্যাগাসাস', 'শূন্যবৃত্ত', 'উত্তরণ' এবং 'বিচলিত সময়' সুধীমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত। তাঁর লেখনী বিস্তৃত থেকেছে জাতিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে। ১৯৭০ সাল থেকে বিশ্বব্যাংকের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে ওয়াশিংটনে কর্মরত।

আবু ওবায়দা আনসারী খান : মূলতঃ কবিতা লেখেন। ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পাশ করেছেন ১৯৭৮ সালে। কানাডার ম্যানিটোবা ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট করেছেন পরবর্তী সময়ে। বর্তমানে মিসিসিপির জ্যাকসন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পদার্থ বিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। স্ত্রী ডঃ শায়লা খান ও দু'কন্যা নিয়ে স্থায়ীভাবে জ্যাকসন, মিসিসিপিতে বসবাস করছেন।

ইকবাল হাসান : একাধারে কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। সত্তরের জনপ্রিয় উল্লেখযোগ্য কবিদের অন্যতম। সম্পাদনাও করেছেন বেশ কিছু। নিরলস লিখছেন আজও। জন্ম বরিশাল, ১৯৫২। পড়াশোনা, অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান)। বসবাস - জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বর্তমানে কানাডার টরন্টো। পেশা, দেশে সাংবাদিকতা এবং বিদেশে কখনো ব্যবসা, কখনো স্রেফ শ্রমজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'অসামান্য ব্যবধান' (কবিতা ১৯৮৬), 'মানুষের খাদ্য তালিকায়' (কবিতা ১৯৮৬), 'জ্যোৎস্নার চিত্রকলা' (কবিতা ১৯৯৫), 'দূর কোনো নক্ষত্রের দিকে' (কবিতা ২০০০), 'জলরঙে মৃত্যুদৃশ্য' (কবিতা ২০০৩), 'কপাটবিহীন ঘর' (গল্প ১৯৯৪), 'মৃত ইঁদুর ও মানুষের গল্প' (গল্প ২০০০), 'দূরের মানুষ কাছের মানুষ' (ব্যক্তিগত নিবন্ধ ২০০০), 'আশ্চর্যকুহক' (উপন্যাস ২০০২), 'শহীদ কাদরী কবি ও কবিতা' (সম্পাদনা ২০০৩), 'ছায়ামুখ' (উপন্যাস ২০০৪), 'প্রেমের কবিতা' (কবিতা সংকলন ২০০৪), 'কার্তিকের শেষ জ্যোৎস্নায়' (গল্প ২০০৪) ইত্যাদি।

কামরুন জিনিয়া : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। লুইজিয়ানা থেকে প্রকাশিত 'আকাশলীনা' সাহিত্য সংকলনের সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করেছেন ১৯৯৬ সালে। 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ - ৮৯' তে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম হয়ে আবৃত্তিতে স্বর্ণপদক পান। লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে লোক-প্রশাসনে মাস্টার্স করেন ২০০০ সালে। বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের Public Policy & Urban Affairs-এ Women & Sustainable Development Policy- তে পি.এইচ.ডি করছেন। উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভি কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত।

গুলশান আরা কাজী : কবিতা, ছোটগল্প ও নাটক লেখেন। সাহিত্যের প্রায় সবগুলো শাখাতেই দৃপ্ত পদচারণা তাঁর। লিখেছেন প্রায় শতাধিক কবিতা, ছোটগল্প ২০টি এবং ১০টিরও বেশী নাটক। বিগত ২৫ বছর ধরে প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা এবং প্রচার কাজ করে চলেছেন। এই উদ্দেশ্যে বস্টনে 'তরঙ্গ' নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। পেশাগতভাবে একজন বৈজ্ঞানিক। পদার্থ বিদ্যায় Ph.D. করার পর তিনি Laser Physics এবং CancerTherapy-তে গবেষণা করেছেন, এবং Harvard Medical School-এ Senior Scientist হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। এছাড়াও North America Nazrul Conference Committee, North America Poetry Conference Committee, Boston Soup Poets Association এবং Literary Circle of New England-এর একজন সক্রিয় সদস্য। মূলতঃ তিনি এবং তাঁর স্বামী কাজী বেলাল-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই ২০০৪ সালে California State University, North Ridge-এ তাঁরা Nazrul Studies Program চালু করতে সমর্থ হন, যা আমাদের গোটা জাতি তথা বাংলাদেশের জন্যে একটি গর্বের ব্যাপার। অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার আরও বেশ কিছু ইউনিভার্সিটিতে Nazrul Studies Program চালু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে ডক্টর গুলশান কানেকটিকা অঙ্গরাজ্যের R & D Division of Cancer Research in CuraGen Corporation-এর একজন বিজ্ঞানী ও Group Leader হিসেবে কাজ করছেন।

জসিম মল্লিক : প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিক। জন্ম ১৯৬২ সালে বরিশাল শহরে। ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। কলেজ জীবন থেকেই তাঁর লেখালেখির শুরু এবং দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক-এ নিয়মিত লিখেছেন। ১৯৮৪ সালে শাহদত চৌধুরী সম্পাদিত তৎকালীন 'সাপ্তাহিক বিচিত্রায়' যোগদান করেন। এরপর সাপ্তাহিক বিচিত্রার আকস্মিক বিলুপ্তির পর ১৯৯৮ সালে মিডিয়া ওয়ার্ল্ড পাবলিকেশন প্রকাশিত সাপ্তাহিক২০০০-এ যোগ দেন। দীর্ঘ তেইশ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে তাঁর অভিজ্ঞতা বিপুল ও বিশাল। এই বিশাল অভিজ্ঞতার উপদান নিয়েই তিনি নির্মাণ করেছেন অসংখ্য গল্প উপন্যাস এবং সমাজ সচেতন মূলক বিভিন্ন লেখা। তুলে এনেছেন জীবনের চরম সত্য আর বাস্তবতাকে। তাঁর সপ্রতিভ, ঋজু, সংহত, সংবেদী ভাষা আর বিষয় বৈচিত্রের স্বকীয়তা ও নিজস্বতা বরাবরই লক্ষ্যযোগ্য। ইতিমধ্যে তাঁর প্রকাশিত কয়েকটি ছোটগল্প ও উপন্যাস পাঠক মহলে আলোচিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে আলোর গভীরে, নীল জলে তরঙ্গ, নক্ষত্রের গান, ভালবাসার দিনগুলি, তোমার কাছে যাব, তোমার জন্য আমি, জীবন বারে বারে আসে, টানাপেড়েন, নক্ষত্রের আগুন ভরা রাতে, হাডসন থেকে টেমস, কোন কথা ছিল না, হৃদয় যতদূর, প্রভৃতি।

এর পাশাপাশি তিনি দেশের নামকরা শিল্প প্রতিষ্ঠান মুন্নু গ্রুপ অব ইন্ডষ্ট্রিজ এবং নামকরা বিজ্ঞাপনী সংস্থা ইউনিট্রেন্ড-এ প্রায় একযুগ কাজ করেছেন। ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য ও বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির শিক্ষা ও গবেষনা সম্পাদক। বর্তমানে কানাডার নাগরিক এবং জনপ্রিয় সাপ্তাহিক২০০০ ও আনন্দধারার বিশেষ প্রতিনিধি। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পত্রিকায় লিখে চলেছেন বিরামহীন। টরন্টো, কানাডা প্রবাসী।

জাহানারা খান বীনা : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। জন্ম ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৫ সালে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে' অনার্সসহ এম.এ. পাশ করেন। তাঁর একগুচ্ছ বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ 'Walking Together into Eternity' বেরিয়েছে ১৯৯৮ সালে, যা সুধীমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। স্থায়ীভাবে ফ্লোরিডাতে বসবাস করছেন এবং সেখানকার বিভি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

জায়েদ ফরিদ :

জিয়াউদ্দিন আহমেদ : মূলতঃ কবিতা লেখেন। পেশায় চিকিৎসক। বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন—নর্থ আমেরিকা চ্যাপ্টারের প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাও। দেশ-বিদেশের বিভি পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন। উত্তর আমেরিকার বিভি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

জিয়ারত হোসেন : কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। সম্পাদনার সঙ্গেও জড়িত। প্রবাসের বিভি পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে উত্তর আমেরিকার নিউ

মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব নিউ মেক্সিকো-তে অধ্যাপনা করছেন।

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : সাহিত্যে ষাটের দশক নিয়ে যে-কোনো বিবেচনার ক্ষেত্রেই অনিবার্যভাবে যাঁদের নাম উঠে আসবে, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত তাঁদের অন্যতম। জন্ম ১৯৩৯ সালে, কুষ্টিয়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে গণযোগাযোগ-এ এম.এস. ও সাংবাদিকতায় পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরু ঢাকায়, বাংলা একাডেমীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিধ্যাপনা ও গণসংযোগ/সম্পাদনার পেশায় কেটেছে দীর্ঘকাল। আটাশ বছর বিদেশ বাসের পর দেশে ফিরে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও 'প্রশিকা'-র তথ্য পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব ও তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগেও খন্ডকালীন প্রফেসর ছিলেন একই সঙ্গে। কখনো নিউইয়র্কে কখনো ঢাকায় বাস তাঁর এখন। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, 'দুর্বিনীত কাল', 'বহে না সুবাতাস', 'সিতাংশু তোর সমস্ত কথা', 'পুনরুদ্ধার', 'উড়িয়ে নিয়ে যা কালমেঘ', 'ফিরে যাও জ্যোৎস্নায়', 'প্লাবনভূমি', 'মুক্তিযোদ্ধারা', 'জলপরী তো নাচবেই', 'নির্বাচিত গল্প' ইত্যাদি।

দলিলুর রহমান : রসায়ন বিজ্ঞানী ডক্টর দলিলুর রহমান একজন সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞানের মতো শিল্পের বিভি শাখায় বিচরণ তাঁর। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, ছবি আঁকা - সবকিছুতেই দৃপ্ত পদচারণা তাঁর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে বিএসসি (অনার্স) ও মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন চার বছর। এরপর প্রথমে টোকিও ও পরে কানাডাতে রসায়নে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি নিউজার্সীতে Princeton University-তে প্রথমে Research Associate ও পরে Research Staff Member হিসেবে তিন বছর গবেষণা করেন। নিউজার্সী প্রবাসী ডঃ রহমান বর্তমানেও গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা লিখতেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'বিতর্ক কেবল সময়ের' এবং যৌথ প্রকাশনা - 'দশ-দিগন্ত' (কবিতা)।

দাউদ হায়দার : বাংলাদেশের খ্যাতিমান কবি। বর্তমানে জার্মান প্রবাসী।

দিলারা হাশেম : উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়ের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় লেখিকা। জন্ম চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে। যশোহর। ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৭২ থেকে ওয়াশিংটন প্রবাসী। এক সময় বিবিসি-তে এবং বর্তমানে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা ব্রড কাস্টার লেখক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ফেডারেল গভর্নমেন্টের স্থায়ী সিভিল সার্ভিস পদে চাকুরীরত। উপন্যাস, গল্পের পাশাপাশি কবিতা ও নাটক লেখেন। ত্রিশটিরও বেশী প্রকাশিত গ্রন্থের ভেতর ঘর মন জানালা, আমলকীর মৌ, একদা এবং অনন্ত, স্তব্ধতার কানে কানে, কাকতালীয়, হামেলা, গোধূলী বিলাপ, শেষ বিকেলের আলো, মানবীর সুখ-দুঃখ, শেষ রাতের সংলাপঃ টুইন টাওয়ার্স, সিংহ ও অজগর, রাহুগ্রাস, অনুক্ত পদাবলী পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। দেশে ও বিদেশে পেয়েছেন সম্মানজনক বহু পুরস্কার। দিলারা হাশেন কথা সাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭৬ সালে। ১৯৯৮-এ পেয়েছেন 'অনন্যা' সাহিত্য পুরস্কার। বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য অবদানের জন্যে নিউজার্সীতে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গ সম্মেলন - ২০০০' তাঁকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করেন। একই বছর কলকাতা থেকে পান সম্মানজনক 'চোখ সাহিত্য পুরস্কার'। এছাড়াও ১৯৯৪ সালে North American Literary Society থেকে পান শঙ্খচিল সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৯৫ সালে Cultural and Literary Inc., Chicago থেকেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিরলস অবদানের জন্যে পান সম্মানজনক পুরস্কার। স্বনামধন্যা দিলারা হাশেম রচিত বেশ কিছু নাটক/সিরিয়াল বিটিভি ও বাংলাদেশের অন্যান্য চ্যানেলগুলোতে প্রদর্শিত হয়েছে এবং ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে।

দেলোয়ার হোসেন মঞ্জু : দেলোয়ার হোসেন মঞ্জু অথবা মঞ্জু মিস্ত্রাল, জন্ম : ১৯৭০, সিলেট প্রকাশিত কবিতার বই : ইস্পাতের গোলাপ, ঈসাপাখি বেদনা ফোটে মরিয়মবনে, মৌলিক ময়ূর, নীল কাব্যের বয়াত প্রকাশিত উপন্যাস :জ্যোৎস্নার বেড়াল। লন্ডন প্রবাসী।

নাজনীন সীমন : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। বলার ঢঙ ও বুনন সৌকর্যে শুরু থেকেই তিনি আলাদা। কবিতা ও গল্প উভয় শাখায়ই স্বতন্ত্র, যদিও স্বল্পপ্রসূ। তাঁর উচ্চারণ পাঠককে ভাবায়, নতুন করে দেখতে অনুপ্রাণিত করে, নিয়ে যায় শিল্পের কাঙ্ক্ষিত বন্দরে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'আদিগন্ত বিস্তীর্ণতার ঢালে'।

নাসরীন খান রুমা : মূলতঃ কবিতা লেখেন। ছবি আঁকতে ভালোবাসেন। প্রবাসের বিভি পত্র-পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 'সুপ্রভাত' নামে কানাডার একটি মাল্টি-কালচারাল অরগানিজেশনের সক্রিয় কর্মী ও সদস্য। টরন্টো, কানাডা প্রবাসী।

নাহার মনিকা : লেখালেখির শুরু স্কুল জীবনে হলেও প্রথম কবিতা ছাপা সাপ্তাহিক বিচিত্রায়। জন্মসূত্রে উত্তরবঙ্গে কলেজ আর তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় সরব উপস্থিতির পর কিছুকাল পেশা-প্রবাস ইত্যাকার কারণে লেখালেখিতে নয়, ছাপাতে বিরতি। বর্তমানে মন্ট্রিয়ালে বসবাস, আর সাহিত্যের আবহ আবারো ছাপাতে উৎসাহ যোগাচ্ছে। কবিতা লিখতেই তার আনন্দ, কিছু গল্প ও অন্যান্য গদ্যও লিখেছেন, কিন্তু লেখার চেয়ে পড়ায় আরো আনন্দ, আর পড়ার চেয়ে কাব্য-ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকাটি সবচেয়ে পছন্দের। তার মতে, অসংখ্য কালোত্তীর্ণ কবিতা লেখার পরও অনেক ভালো কবিতা লেখা হবে। তিনি তা না লিখলেও অন্য কেউ লিখবেন। এই উচ্চাঙ্গের নান্দনিক ভাবনা প্রকাশের ফর্মটি মানুষের মন ও মননের খোরাক যোগাবে। কবিতা নাহার মনিকাকে স্বাধীনতা দেয় জীবনে বা জীবনের বাইরে যা কিছু ঘটে অথবা ঘটেনা তাকে নিজের মতো করে বলার; যে স্বাধীনতা প্রকৃতির মতই শক্তিশালী ।

পূরবী বসু : একাধারে বিজ্ঞানী, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। জন্ম মুন্সীগঞ্জে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ করেছেন ফার্মেসীতে অনার্সসহ স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেডিকেল কলেজ অব পেনসিলভ্যানিয়া ও ইউনিভার্সিটি অব মিসৌরী থেকে লাভ করেছেন

যথাক্রমে প্রাণ-রসায়নে এম.এস. ও পুষ্টিবিজ্ঞানে পিএইচডি। বিজ্ঞানচর্চা তাঁর পেশা। নিউইয়র্কের বিশ্ববিখ্যাত মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং ক্যান্সার সেন্টারে গবেষণা ও কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেছেন বেশ কিছুকাল। অজস্র গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সারা বিশ্বের নানা নামি জার্নালে। তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আজন্ম পরবাসী', 'সে নহি সে নহি', 'পূরবী বসুর গল্প', 'নিরুদ্ধ সমীরণ', 'গল্পসমগ্র', 'একদা এখানে কন্যাসন্তান জন্ম নিত' এবং 'অনিত্য অনিন্দ্য'। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ঔষধ প্রস্তুত প্রতিষ্ঠান ওয়ায়েথ ফার্মাসিউটিক্যাল্সে কর্মরত।

ফকির ইলিয়াস : কবি ও সাংবাদিক। জন্ম **১৯৬২**, সিলেটে। পড়াশোনা করেছেন বাংলা সাহিত্যে। বাংলাদেশের ও প্রবাসের বিভি পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধ ও কলাম লিখেন। দীর্ঘদিন থেকে নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'বাউলের আর্তনাদ', 'হৃদে গাঁথা মালা', 'বৃত্তের ব্যবচ্ছেদ', 'অবরুদ্ধ বসন্তের কোরাস' এবং গীতিকবিতা 'অনন্ত আত্মার গান' পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। যৌথ কাব্যগ্রন্থ - 'এ নীল নির্বাসনে'।

ফারহানা ইলিয়াস তুলি : নিউইয়র্কের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও পরিচিত কবিদের একজন। কবিতার পাশাপাশি ছোটগল্প লেখেন। সম্পাদনার সঙ্গেও জড়িত। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা কবিতাপত্র 'কালিক'-এর সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে - 'প্রজন্মের সেতুবন্ধন', 'হৃদয় ছুঁয়ে যাক ভালোবাসায়' এবং 'নেমে আসে সন্ধ্যার স্বর'।

ফেরদৌস নাহার : কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ **১০**টির মতো। 'সময় ভেঙেছে সংশয়', 'সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো'-সহ প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থ সুধীমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও কবিতা বিষয়ক তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'কবিতার নিজস্ব প্রহর' সাহিত্য অঙ্গনে নতুন একটি মাত্রা যোগ করে। তিনি 'সুপ্রভাত' নামে কানাডার একটি মাল্টি-কালচারাল অরগানিজেশনের সক্রিয় কর্মী ও সদস্য। টরন্টো, কানাডাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

বদিউজ্জামান নাসিম : জন্ম বরিশালের শিরযুগ গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে এম.এস.সি। বর্তমানে বস্টন প্রবাসী এবং সেখানকার একটি মানসিক হাসপাতালে কর্মরত। মুলতঃ কবিতা লেখেন। সম্পাদিত সংকলন - নীলিমার নীলক্ষেত, জেব্রা ক্রসিং, মাল্টিস্টোরীড দুঃখশোক ইত্যাদি। 'ভিন-গোলার্ধ' নামে প্রবাসে একটি বাংলা ভিত্তিক উদ্যোগের অন্যতম রূপকার।

মাসুদা ভাট্টি : নামকরা জার্নালিস্ট, কলামিস্ট, ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। লন্ডন প্রবাসী।

মীজান রহমান : উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়ের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় লেখক। শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী প্রমুখের সমসাময়িক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই লেখক পেশাগত জীবনে কানাডার অটোয়াস্থ কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। একটানা তেত্রিশ বছর শিক্ষকতা করে অবসর নেন **১৯৯৮** সালে। বর্তমানে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন Distinguished Research Professor হিসেবে কর্মরত আছেন। গণিত শাস্ত্রের প্রখ্যাত পন্ডিত জর্জ গ্যাসপারের সঙ্গে রচিত তাঁর গণিতবিষয়ক গ্রন্থ, আধুনিক গণিতের একটি উল্লেখযোগ্য ও অপরিহার্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। লেখক তাঁর সুদীর্ঘ প্রবাস জীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতাঋদ্ধ মনীষার আলোকে রচনা করে যাচ্ছেন অজস্র ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও আখ্যানমঞ্জরী। তাঁর প্রকাশিত রচনার সুনির্বাচিত সঙ্কলন 'তীর্থ আমার গ্রাম', 'লাল নদী', 'অ্যাল্পবাম' ও 'প্রসঙ্গঃ নারী' পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

মীনা আজিজ : প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট **২১** টি। মূলতঃ ভ্রমন কাহিনী। পেশায় গৃহিনী তবে ভ্রমন, লেখালেখি, বইপড়ার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা অন্যতম প্রধান কাজ। সাহিত্যে অবদান রাখার জন্য বিভি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য সংস্থা থেকে বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। বিভি সামাজিক, সাহিত্যিক ও সেবামূলক সংস্থার সঙ্গে জড়িত। কানাডা প্রবাসী।

মুজিব ইরম : মুজিব ইরম : জন্ম ১৯৬৯, নালিহুরী, মৌলভীবাজার। প্রকাশিত কবিতার বই : মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান ১৯৯৬, ইরমকথা ১৯৯৯, ইরমকথার পরের কথা ২০০১, উত্তরবিরহচরিত ২০০৩, সাং নালিহুরী ২০০৪, ইতা আমি লিখে রাখি ২০০৫। প্রকাশিত গদ্যের বই : এক যে ছিলো শীত ও অন্যান্য গপ ১৯৯৯। মুজিব ইরম ভনে শোনে কাব্যবান-এর জন্য 'বাংলা একাডেমী তরুণ লেখক প্রকল্প পুরস্কার' গ্রহণ ১৯৯৬। লন্ডন প্রবাসী।

মুহম্মদ জুবায়ের : জন্ম মে ২২, **১৯৫৪**। বেড়ে ওঠা বগুড়া শহরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা শেষ করেন। সত্তর দশকের প্রথমার্ধে লেখালেখির শুরু। **১৯৮৪-৮৫** থেকে **১৯৯৯** পর্যন্ত লেখালেখি থেকে দীর্ঘ স্বেচ্ছা-অবসর বা শীতঘুমে মগ্ন। গল্প-উপন্যাস এবং সংবাদপত্রের কলাম ও ব্যক্তিগত রচনাসহ বিবিধ গদ্য লেখেন। একদা কিছু অনুবাদকর্মও করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি – উপন্যাস 'অসম্পূর্ণ' (**১৯৮৬**) ও কিশোর উপন্যাস 'আমাদের অমল' (২০০৩)। পরবাসজীবন **১৯৮৬**-র মাঝামাঝি থেকে, এখন বাস করেন আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের ডালাস শহরে।

রবিউল হাসান : খ্যাতনামা গল্পকার, কবি ও অনুবাদক হিসেবে সুপরিচিত। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মালয়েশীয়ার চল্লিশটিরও বেশী পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিমা এসেই বলে, যাই' ও 'এই শহরে একটা কোনো বিকেল মানেই' সুধীমহলে সমাদৃত। 'প্রিয়ার সঙ্গে চার বেলা' তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। লেখক বর্তমানে লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের সাদার্ণ ইউনিভার্সিটি ইন ব্যাটন রুজ-এর ইংরেজীর প্রভাষক।

রানু ফেরদৌস : ছোটগল্প, কলাম ও প্রবন্ধ লেখেন। মাঝে মধ্যে কার্টুনও আঁকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এস.এস (অনার্স)। ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'পড়শী'-র নিউইয়র্ক প্রতিনিধি। নিউইয়র্কের 'উদীচী স্কুল অব পারফর্মিং আর্টস'-এর বাংলার শিক্ষক। এছাড়াও তিনি 'ইউনাইটেড নেশনস্ উইমেনস গিল্ড' কুইন্স শাখার প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর। স্বামী ও দুই সন্তানসহ

নিউইয়র্কে বসবাস করছেন।

রুকসানা রূপা : মূলতঃ কবিতা লেখেন। কবিতা ছাড়াও তিনি চমৎকার গদ্য এবং ছোটগল্প লেখেন। রূপা নব্বুই দশকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। উত্তরাধুনিক কবিতায় তিনি ২০০১ সালে 'শব্দগুচ্ছ' পুরস্কার পান। তাঁর একমাত্র কাব্যগ্রন্থের নাম - 'গরাদবিহীন জানালায় অপেক্ষার কিশোরী'। নিউইয়র্ক প্রবাসী।

রোকসানা লেইস : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। ছবি আঁকেন সময় পেলেই। প্রকৃতি-প্রেম তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু। 'সুপ্রভাত' নামে কানাডার একটি মাল্টি-কালচারাল অরগানিজেশনের সক্রিয় কর্মী ও সদস্য। প্রথম কাব্যগ্রন্থ - 'স্বপ্ন নগরীর খোঁজে'। টরন্টো, কানাডা প্রবাসী।

লুৎফর রহমান রিটন : বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান ছড়াকার। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা তাঁর বয়সের প্রায় দ্বিগুন। ছড়া ছাড়াও তিনি চমৎকার গদ্য লেখেন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রিটন বর্তমানে কানাডার অটোয়ায় স্ব-নির্বাসিত। তাঁর শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রবাসে রচিত পংক্তিমালা'।

শবনম আমীর : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। প্রবাসী পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ লিখছেন। ভ্রমন বিলাসী ও সুদূরপিয়াসী এই লেখিকা আফ্রিকা, ইউরোপ ও পৃথিবীর বিভি প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বিশেষ করে বাঙালিদের সুখ-দুঃখের যে চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন, তারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন তাঁর কবিতায় ও গল্পে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বিরহ বেহাগ' এবং গল্প-সমগ্র 'নিহত কৃষ্ণচূড়া' পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। স্বামী ও সন্তানসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে।

শামস-আল-মমীন : আমেরিকা থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ. এবং এম.এ. করেছেন। মূলতঃ কবিতা লেখেন। অনুবাদও করছেন। তাঁর অনূদিত বেশ কিছু কবিতা ইতোমধ্যেই সুধীমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দু'টি - 'মনোলগ' এবং 'চিতায় ঝুলন্ত জোছনা'। সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা 'আ-কার ই-কার'। ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত লিখে থাকেন। বর্তমানে নিউইয়র্কের বোর্ড অব এডুকেশনে Mentor হিসেবে কর্মরত আছেন। ১৯৮২ থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী।

শামসুল হুদা : কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন। নিউ অরলিন্স থেকে প্রকাশিত একুশে সংকলন 'অবিনাশী শব্দরাশি'-র সম্পাদক, প্রকাশ করছেন গত চৌদ্দ বছর যাবত। এক সময়ের বেতার সংবাদপাঠক, সাংবাদিক ও আবৃত্তিকার। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেন। বর্তমানে লুইজিয়ানার জেভিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান। স্ত্রী ও দু'সন্তান নিয়ে নিউ অরলিন্সে বাস করছেন।

শামীম আজাদ : শামীম আজাদের পৈত্রিক নিবাস সিলেটের মৌলভী বাজার এবং জন্ম ময়মনসিংহে। বিলেতে চলে আসেন ১৯৯০ সালে। অধুনা শামীম আজাদ বিলেতে পারফরমেন্স 'পোয়েট ও স্টোরি টেলার' হিসেবে পরিচিত। এবং বর্তমানে " এ্যাপল্স এ্যান্ড স্লেইক্স'- (বিলেতের সবচেয় বড় পোয়েট্রি অর্গেনাইজেশন) এর রেসিডেন্ট রাইটার হয়ে কাজ করছেন। ইংরাজি ও বাংলা দু'ভাষায় করেন লেখালেখি। এর আগে বিভিন্ন সময়ে সময়ে তিনি ডকল্যান্ড মিউজিয়াম, সান্ডারল্যান্ড সিটি লাইব্রেরী ও র্আট্স সেন্টার, পোয়েট্রি সোসাইটি, ম্যাজিক মি, ও এ্যাপল্স এ্যান্ড স্লেইক্স এ আবাসিক লেখক হিসেবে কাজ করেছেন এবং ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা করেছেন ১৯৮৯ পর্যন্ত। দুটো নাটক লিখেছেন হাফমুন থিয়েটারের জন্য, বিভিন্ন কবিতা সংকলনে তার কবিতা হয়েছে সংকলিত। বিলেতে উয়্যার পাবলিকেশন থেকে তার দ্বি ভাষিক 'দি ভয়েজেস ফ্রম বাংলাদেশী রাইটারস' এবং ম্যাজিক মি থেকে ছোটদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে 'দি লাইফ অব মিঃ আজিজ'। তিনটি কবিতা গ্রন্থ, দুটি উপন্যাস, দুটি রচনা সমগ্র, দুটি সম্পাদনা গ্রন্থ, দুটি ছোট গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে। পুরস্কারঃ লন্ডন আর্টস থেকে যৌথভাবে ভাবে ব্রিটিশ কবি টাঙ্গ'র সঙ্গে, কবিতার জন্য ইয়ার অব দা আর্টিস্ট ২০০০, টাওয়া হ্যামলেট্স বারা থেকে লন্ডন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের শিক্ষামূলক কাজের জন্য সিভিক এওয়ার্ড ২০০৪, সংযোজনের ২০০4 আব্দুর রব চৌধুরী পুরস্কার, বিচিত্রা এওয়ার্ড ফর ফ্যাশন জার্নালিজম ১৯95

শামীম তুষার : প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কলাম লেখেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস করেছেন ১৯৯৭ সালে। লুইজিয়ানা প্রবাসী এবং এ অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিন্সে অবস্থিত ট্যুলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.পি.এইচ করেছেন। বর্তমানে OPH, New Orleans-এ কর্মরত আছেন। একসময় বাংলাদেশের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন 'যায় যায় দিন'-এ নিয়মিত লিখতেন। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'অন্য স্বাদের কমপিউটার' পাঠক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

শারমিন আহমেদ : কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও নিবন্ধ লেখেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা। ১৯৮৪ থেকে আমেরিকা প্রবাসী। তিনি ১৯৯০ সালে ওয়াশিংটন ডি.সি.-র জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেলোশীপ ও উইমেন স্টাডিজ স্কলার্স এ্যাওয়ার্ডসহ উইমেন্স স্টাডিজে মাস্টার অব আর্টস ডিগ্রী লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি শিশু শিক্ষার ওপরেও মাস্টার্স কোর্স সম্প করেন। বিশ্বের পেশাজীবী নারীদের অন্যতম বৃহত্তম মানব উ য়ন সংগঠন দ্যা সরোপটিমিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অব দ্যা আমেরিকাস 'আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সমঝোতা রচনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের' জন্য তাঁকে 'উয়োম্যান অব ডিস্টিংশন' এ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) গ্রন্থ 'হৃদয়ে রঙধনু' (The Rainbow In A Heart) সুধীমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে ও ব্যাপক প্রশংসিত হয়। সম্প্রতি বইটি আমেরিকার ম্যারিল্যান্ড স্টেটের মন্টোগোমারি কাউন্টির পাবলিক স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কারিকুলামের জন্য মনোনীত করেছে। মানের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক স্কুলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হিসেবে পরিচিত মন্টোগোমারি কাউন্টি পাবলিক স্কুল 'হৃদয়ে রঙধনু'-র চূড়ান্ত অনুমোদনে এই গ্রন্থটিকে সমবিষয়ের যে

কোনো গ্রন্থের তুলনায় অদ্বিতীয় হিসেবে অভিহিত করেছে। সুন্দর চিত্রকর্ম, ভাষার নিপূণতা এবং গল্পের বর্ণনা সাবলীল বলেও প্রশংসা করা হয়েছে। এছাড়া শিশুর সঙ্গে বিভি সংস্কৃতির মায়েদের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিশুর উপযুক্ত অভিভাবক হওয়ার শিক্ষা, বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, আধ্যাত্মিক নীতিমালার সংযোগ, সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ এবং সব প্রাণের উৎসেই ভালো দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনাকে গল্পের শক্তিশালী দিক হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শাহানা চৌধুরী পপি : অভিনেত্রী ও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে পরিচিত হলেও কবিতার প্রতি আশৈশক ভালোবাসাই তাকে কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। সৌদি প্রবাসী কবি শাহানা চৌধুরীর জন্ম রংপুরে।

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল : একাধারে কবি, গল্পকার, নাট্যকার ও গবেষক। পেশা সাংবাদিকতা ও প্রকাশনা। প্রকাশিত গ্রন্থ ৩৫ টি, কবিতা ১৫ টি। এবারের বইমেলা-২০০৬ এ বেরুচ্ছে তাঁর কবিতা-সমগ্র। তিনি প্রবাসীদের নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছেন। বর্তমানে অটোয়াতে অবস্থান করছেন এবং ক্যানাডিয়ান আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের নিয়ে গবেষণা করছেন।

সাদ কামালী : কথাশিল্পী সাদ কামালী-র জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় ১৯৬২ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে সম্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষে দেশে বিদেশে চাকরি ও জীবনযাপনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সাদ কামালীর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অবশেষে নিঃশব্দ অস্তিমে' প্রকাশ হয় ১৯৯২ সালে। প্রথম গ্রন্থ থেকেই তাঁর রচনারীতি ও বিষয়বৈচিত্র্য আলোচিত। এখন পর্যন্ত তাঁর গল্পগ্রন্থ সংখ্যা ছয়। কলকাতা বইমেলা ২০০৬-এ কলকাতার নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে গল্পগ্রন্থ 'তেলাপোকার জার্নাল।' প্রথম উপন্যাস 'রাষ্ট্রের সংক্রাম' (২০০২) সহ প্রকাশিত হয়েছে চারটি উপন্যাস। ব্যক্তিগত গদ্য 'যাদুবাস্তবতার মায়া'র প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৪। টরন্টো, কানাডা প্রবাসী।

সালেহা চৌধুরী : '৭২ সাল থেকে লন্ডনে বাস করছেন। আসার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন পাঁচ বছর। এরপর লন্ডনে শিক্ষকতার পর অবসর গ্রহন করেছেন। দুটো বই 'যখন নিঃসঙ্গ' ও 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' প্রকাশ করেছিলেন আসার আগে। তারপর লন্ডনের নানা কাজে কুড়ি বছরের বিরতি। নব্বই সালে 'উষ্ণতর প্রপাত'-এর মাধ্যমে আবার লেখালেখি শুরু। এখন মোটামুটি নিয়মিত লিখছেন। গ্রন্থ সংখ্যা তেত্রিশ (৩৩) টি। ইংরেজী ও বাংলা কবিতার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া, নাটক, শিশুতোষ সাহিত্য—সবকিছুই লেখেন যখন যেমন মনে হয়। লেখা তার সঙ্গ এবং লেখা তার জীবনের বেঁচে থাকবার সত্যিকারের আনন্দ। একটি কন্যা এবং একটি পুত্রের মাতা।

সুরাইয়া খানম : একাধারে গবেষক, ঔপন্যাসিক এবং কবি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স গ্রাজুয়েশান ও ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনার টুসান বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকান সাহিত্যে এম.এ. ও ডক্টরেট করেন। একসময়ের করাচি বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক, বর্তমানে আরিজোনার একটি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছেন। বই প্রকাশের ক্ষেত্রে ততোটা আগ্রহী না হলেও সুরাইয়া খানম নিয়মিত লিখছেন আজও। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - 'নাচের শব্দ' পাঠকমহলে আলোড়ণ জাগায়।

সোহেলী সুলতানা : মূলতঃ কবিতা লেখেন। জন্ম বৃহত্তর মাদারীপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত শিরখাড়া মিয়া পরিবারে। লেখালেখির শুরু ছোটবেলা থেকেই। পরবর্তীতে স্কুল-কলেজে অধ্যয়নের সময় থেকেই দেশের বিভি পত্র-পত্রিকায় এবং সাময়িকীতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ - 'বিপরীত চলাচল'। দ্বিতীয় প্রকাশনাটি ছিলো ছোট্ট সোনামণিদের জন্য ছড়াছবির বই 'ছড়ায় ছন্দে'। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে স্বামী-সন্তানসহ ফ্লোরিডা প্রবাসী। লেখিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভি পত্র-পত্রিকায় এবং সাময়িকীতে লিখছেন নিয়মিত। এছাড়াও ফ্লোরিডার মায়ামীতে 'শিল্পাংগন' নামের একটি সাহিত্য-সংস্কৃতির আসর মাসিক ভিত্তিতে চালিয়ে আসছেন বিগত পাঁচ বছর ধরে।

হারুন চৌধুরী : মুক্তিযোদ্ধা হারুন চৌধুরী একজন স্বনামধন্য লেখক ও দীর্ঘদিন যাবত সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। ১৯৭৯ সালে ইউ এন ডিপির মাধ্যমে বৃত্তি নিয়ে তিনি বিলেতের শেফিল্ড ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং তখন থেকে ওয়াশিংটন প্রবাসী। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ওয়াশিংটন ডি.সি.-এর জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তিনি এ্যামন্যাস্টি ইন্টারন্যাশনালের (AMI) একজন সক্রিয় সদস্য। বর্তমানে কম্পিউটার Data Center Specialist হিসেবে কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ - 'এই নারী'।

হাসান-আল-আবদুল্লাহ : ছান্দসিক কবি হিসেবে খ্যাত। আশির দশকের মাঝামাঝিতে কবিতা দিয়ে লেখালেখির শুরু। তিনি একজন ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক এবং সম্পাদনার সঙ্গেও জড়িত। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক কবিতার কাগজ 'শব্দগুচ্ছ'-এর সম্পাদক। তাঁর সম্পাদিত 'মার্কিন দেশের বাংলা কবিতা' সুধীমহলে ব্যাপক প্রশংসা পায়। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ 'কবিতার ছন্দ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য বিভাগে পড়ানো হচ্ছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'একবিংশ শতাব্দীর আগে', 'গোলাপের নাম তুমি', 'শকুনেরা ভালো আছে', 'সনেটগুচ্ছ ও অন্যান্য কবিতা', 'আঁধারের সমান বয়স' এবং কিশোর উপন্যাস 'আহত মুকুল' প্রশংসার দাবীদার। তাঁর ৬টি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ সহ মোট গ্রন্থসংখ্যা ১৭টির মতো। ১৯৯০ থেকে নিউইয়র্ক প্রবাসী। বর্তমানে তিনি New York City Board of Education-এ Math (Calculus) and Computer Programming-এ শিক্ষকতা করছেন।

হাসান ফেরদৌস : বর্তমানে স্থায়ীভাবে নিউইয়র্কে বাস করছেন। লেখাপড়া করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজী সাহিত্যে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে পড়েছেন উক্রাইনের কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। ১৯৮২ সালে ঢাকার জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রে যোগ দেন। এরপর ১৯৮৯ থেকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর

দফতরে। ১৯৯৫-তে বেইজিং-এ বিশ্ব নারী সম্মেলনে জাতিসংঘের তথ্য সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকার দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ - অন্য সময় অন্য পৃথিবী, নান্দনিক নৈতিকতার সপক্ষে ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, নাগরিক সময় ও অন্যান্য বিবেচনা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গতবছর (২০০৫) তাঁর দু'টি অনুবাদ গ্রন্থ বেরিয়েছে, একটি - 'বৃষ্টিকে নিয়ে রূপকথা' এবং অন্যটি - 'নক্ষত্র পুত্র'।

হোমায়রা আহমেদ : গল্প, কবিতা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ও নারী বিষয়ক নিবন্ধ লিখে থাকেন। তিনি মুসলিম মহিলা লেখকদের (বেগম রোকেয়ার আগে ও পরে) ওপর গবেষণা কর্মে রত। পেশাগত জীবনে একজন স্থপতি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্থাপত্য ফার্মে কর্মরত। ইতোমধ্যেই তাঁর গল্পগ্রন্থ 'অন্যরকম মেয়ে', কাব্যগ্রন্থ 'আমি তো আমি না' এবং নারী ও সমাজ বিষয়ক গ্রন্থ 'জীবন যেমন দেখেছি' প্রকাশিত হয়েছে। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া-তে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।